ডেভিড কপারফিল্ড

স্কটল্যাণ্ডে সাফোকের অন্তর্গত ব্লান্ডারস্টোন-এ কোন এক শুক্রবার রাত্রি বারোটার সময় আমার জন্ম হয়। আমার নার্স এবং পাড়ার মেয়েরা বলাবলি করত, আমার ভাগ্যে নাকি অনেক দুঃখ আছে। কারণ, আমার জন্মের লিখন অখণ্ডনীয়। শুক্রবার মাঝরাতের পর যে সব ছেলেমেয়ের জন্ম হয়, তাদের জীবনে অনেক দুঃখ পেতে হয় এবং তারা অনেক ভূতপ্রেত দেখে।

আমার জন্মের ছয়মাস আগেই আমার বাবার মৃত্যু হয়। যখন আমি ভাবতাম আমার বাবা আমাকে দেখতে পাননি, আমিও বাবাকে আগে দেখিনি, এক সকরুণ বিস্ময়বোধ জাগত আমার শিশুমনে এবং এই বিস্ময়টা আজও মাঝে মাঝে শিউরে ওঠে আমার মধ্যে। সুদূর শৈশবের ছায়াবৃত স্মৃতির মধ্যে থেকে যে কথাটা আজও স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে আমার মনে, সেটা হচ্ছে এই যে, সমাধিপ্রাঙ্গনে আমার বাবার শ্বেতবর্ণের সমাধিপ্রস্তরের সঙ্গে আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কিভাবে তা জানি না। বিশেষ করে আমরা যখন সন্ধ্যাকালে রুদ্ধদ্বার ঘরের মধ্যে আগুনের ধারে আরামে বসে গল্প করতাম, তখন যেন আমার বাবা অন্ধকারে কবর থেকে উঠে এসে এক অব্যক্ত নিবিড় বেদনায় আমাদের ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকত। তখন আমার প্রাণটা কেঁদে উঠত। আমি কাউকে সেকথা বোঝাতে পারতাম না।

আমাদের পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক চরিত্র ছিলেন মিস ট্রটউড বা মিস বেটসি। তিনি ছিলেন আমার বাবার পিসিমা। সুতরাং সম্পর্কে আমার ঠাকুরমা। এই ভয়াবহ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের মহিলাটির ভয়ে মা আমার তটস্থ হয়ে থাকতেন।

শোনা যায়, মিস বেটসি তাঁর থেকে বয়সে ছোট এক সুদর্শন পুরুষকে বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর স্বামী তাঁকে মারধর করত। বর্তমানে তাঁদের দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হওয়ায় তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। শোনা যায়, একবার নাকি তাঁর স্বামী ঝগড়ার সময় তাঁকে সিঁড়ির উপর থেকে ফেলে দেয়। তখন মিস বেটসি স্বামীকে কিছু টাকা দিয়ে তার সম্মতিক্রমে পাকাপাকিভাবে বিচ্ছেদের ব্যবস্থা করেন। এই টাকা পেয়ে তাঁর স্বামী নাকি সোজা পাড়ি দেন ভারতবর্ষের দিকে, আর মিস বেটসি বিচ্ছেদের পর স্বামীর উপাধি ত্যাগ করে কুমারী জীবনের নাম পুনরায় গ্রহণ করেন এবং সমুদ্রতীরে ক্ষুদ্র পল্লীতে একটা কুটির নির্মান করে সেখানে একা একা বাস করতে থাকেন। বাড়িতে ঝি-চাকর ছাড়া তাঁর কোন আত্মীয় ছিল না।

আমার বাবা ছিলেন তাঁর প্রিয় পাত্র। কিন্তু যখন তিনি আমার মাকে বিয়ে করলেন, তখন মিস্ বেটসি তাঁর ওপর খুব রেগে গেলেন। তিনি বললেন যে, আমার মা হলেন একটি মোমের পুতুল। তাঁর সঙ্গে আমার বাবার ঝগড়া হল।

মার চেহারাটা ছিল রোগা-রোগা। বয়সটাও ছিল কম অর্থাৎ উনিশ-কুড়ি, আমার বাবার বয়সের প্রায় অর্ধেক। আমার বাবার বিয়ের পর থেকে তাঁর পিসী মিস বেটসির সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হয়নি তাঁর। পিসি তাঁর বাড়িতে আর আসেননি, তিনিও যাননি পিসীর কাছে।

এই ঘটনার এক বছর পরেই আমার বাবার মৃত্যু হয় আর বাবার মৃত্যুর ছয়মাস পর আমার জন্ম হয়। মিস বেটসি আমার মাকে তার আগে কখনো দেখেননি।

আমার জন্মের কয়েকদিন পরের কথা। সেদিন ছিল মার্চমাসের মাঝামাঝি কোন এক বিকেল। আমার মা জ্বলন্ত চুল্লীর কাছে বসে বুকের মাঝে এক নিবিড় হতাশা আর চোখে জল নিয়ে বিষন্ন মুখে ভাবছিলেন। তিনি ভাবছিলেন তাঁর গর্ভস্থ পিতৃহীন শিশুটিকে কি করে মানুষ করে তুলবেন? বিশেষ করে কুপ্রথাক্রান্ত এই শিশুটির সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলতো।

সহসা সেই খোলা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাতেই দেখলেন, এক অদ্ভুতদর্শন মহিলা বাগানের মধ্যে ঢুকে বাড়ির দিকে আসছেন। বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে কড়া না নেড়ে জানালার কাচের মধ্যে দিয়ে ঘরের ভিতরটা তিনি দেখতে লাগলেন। আমার বাবা মাকে বলেছিলেন, মিস বেটসি তাঁর আচরণে খ্রীষ্টানসুলভ আদব কায়দা কিছু মেনে চলেন না।

জানালার কাচটা খুলে যেতেই আমার মা এগিয়ে গেলেন আগন্তুক ভদ্রমহিলার কাছে।

ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা ও চোখেমুখে কঠোরতার ভাব দেখে মা চিনতে পারলেন তিনিই মিস বেটসি ট্রটউড। আমার বাবার কাছে তাঁর কথা সব শুনেছিলেন।

মিস বেটসি মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মিসেস কপারফিল্ড না?

মা বিনীত ভাবে উত্তর করলেন, তিনিই মিসেস কপারফিল্ড এবং তাঁকে ভিতরে আসতে বললেন।

মিস বেটসি গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকলে মা তাঁকে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরে বাবার মৃত্যুর পর থেকে আর থাকা হয় নি। দুজনে মুখোমুখি বসলেন। আমার মা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। হয়ত তাঁর অসহায় অবস্থার কথা বললেন। মিস বেটসি বললেন, কেঁদো না, চুপ কর। তিনি কঠোর প্রকৃতির মানুষ, কোন অবস্থাতেই কান্না তাঁর ধাতে সয় না। তিনি আমার মাকে তাঁর মাথার টুপীটা খুলে ফেলতে বললেন, যাতে তিনি তাঁর মুখটা ভাল করে দেখতে পারেন। সে মুখ নিরীক্ষণ করে বেটসি বললেন, তুমি দেখছি একেবারে শিশু, যাকে বলে বালিকা বধূ, বালিকা বিধবা।

আমার মা দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। বয়স অনুপাতে তাঁর বয়স আরো কম দেখাত। সাংসারিক বিষয়ে দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার পর মিস বেটসি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কপারফিল্ড তোমার সংসারের জন্য কি ব্যবস্থা করে গেছে?

মা উত্তর করলেন, তিনি আমার জন্য এক বাৎসরিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে গেছেন। যেটা হচ্ছে বছরে একশো পাঁচ পাউণ্ড। বাড়ির বাগানের বড় বড় এল্‌ম গাছগুলি বিকালে বেশ শান্ত ছিল। মিস বেটসি যখন বাইরে থেকে এসে বাড়ির বাগানে প্রবেশ করছিলেন, তখন পশ্চিমে ঢলে পড়া সূর্যের লাল রশ্মিগুলিকে গাছগুলোর ফাঁক দিয়ে তাঁর মুখের উপর পড়তে দেখেছিলেন আমার মা। কিন্তু সন্ধ্যার আগে ঝড়ো হাওয়া বইতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে যে সব এল্‌ম গাছগুলো পরস্পরের দিকে ঘুরে যেন ফিস ফিস করে কথা বলছিল, সেই গাছগুলোই যেন ঝড়ো হাওয়ায় মত্ত হয়ে হাত নেড়ে নেড়ে ঝগড়া করছে পরস্পরের সঙ্গে।

মিস বেটসি এর পর মাকে বললেন, তোমাদের মিলনটা সমান সমান হয়নি।

আর মা বললেন, আমি একটি বাড়িতে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করতাম। মি. কপারফিল্ড সেখানে প্রায়ই যেতেন। আমাকে তাঁর ভাল লাগে। তারপর একদিন তিনি বিয়ের প্রস্তাব করলেন এবং এরপরে আমাদের বিয়েটা হয়ে যায়।

এরপর মিস বেটসি আমাদের বাড়ির ঝি পেগটি, যে সব সময় আমাদের বাড়িতে থেকে কাজকর্ম সব করত, তাকে ডেকে প্রভুত্বের সুরে বললেন, শোন পেগটি, তোমার গিন্নীমা এখন কিছুটা অসুস্থ। তাছাড়া সে বুদ্ধিতেও কাঁচা। তুমি এখন ভাল করে কাজকর্ম করবে।

পেগটি নীরবে তাঁর আদেশ মেনে নিল।

মিস বেটসি মাকে বললেন, তুমি সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর থেকেই আমি অনুমান করে আসছিলাম, মেয়ে হবে। এটা শুধু অনুমান নয়। দৃঢ় বিশ্বাস।

আমার মা ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে বললেন, মেয়ে নয়, ছেলে বলুন।

কিন্তু আমার মার সেকথা শুনতে না পেয়ে বা গ্রাহ্য না করে তিনি বলে যেতে লাগলেন, আমি এটাও ঠিক করে রেখেছিলাম, আমি মেয়ের নাম রাখব বেটসি ট্রটউড কপারফিল্ড।

এমন সময় ডাক্তার চিলীপ উপরতলার ঘর থেকে আমাকে নিয়ে নেমে এলেন। আমাকে তখন শুইয়ে রাখা হয়েছিল।

মিস.বেটসি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়ে কেমন আছে?

তখনো পর্যন্ত মিস বেটসির ধারণা ছিল আমার মার কন্যা সন্তান হয়েছে। তিনি হয়ত ভেবেছিলেন, মেয়ে হলে একটু বড় হলে তাকে নিয়ে গিয়ে নিজের কাছে রেখে দেবেন।

ডাক্তার চিলীপ কথাটা শুনে অবাক হলেন। তিনি বললেন, মেয়ে নয়, ছেলে। কন্যা নয়, পুত্রসন্তান হয়েছে।

বেটাছেলে হয়েছে শুনেই ভয়ঙ্করভাবে গম্ভীর হয়ে উঠলেন মিস বেটসি। আর কাউকে কোন কথা না বলে চেয়ার থেকে উঠে মুহূর্তমধ্যে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সেই যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন, জীবনে আর কখনো সে বাড়িতে পা দেননি।

২

আমার সেই সুদূর শৈশবে যখন থেকে বুদ্ধির উন্মেষ হয় আমার জীবনে, সেই সময়ের যেটা স্পষ্ট করে মনে পড়ে আমার, তা হচ্ছে আমার মার সুন্দর চেহারাটা আর ঠিক পাশাপাশি পেগটির চেহারাটাও। পেগটির চেহারার মধ্যে কোন সৌন্দর্য ছিল না, তা-ই নয়, তার দেহের গঠন প্রকৃতির মধ্যেও কোন সামঞ্জস্য ছিল না। শৈশব থেকেই আমার পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা এবং স্মৃতিশক্তি দুটোই তীক্ষ্ণ এবং সাধারণের থেকে একটু বেশী বলা চলে। । শৈশবের অনেক কথাই আমার মনে পড়ে। সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে আমার মা ও পেগটির কথা। আমাদের ছোটো বাড়িটার ছবিও স্পষ্ট মনে আছে আমার। বাড়ির উঠোনের একদিকে রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর, পায়রার ঘর, কুকুরের ঘর। কিন্তু কোন পায়রা বা কুকুর ছিল না ওসব ঘরে। আমাদের দোতলা বাড়িটার নীচের তলায় বসার ঘর ছিল দুটো। একটাতে সন্ধ্যার সময় আমার মা, পেগটি আর আমি এই তিনজনে

বসতাম। আর একটা বসার ঘরে আমরা শুধু রবিবার বসতাম। কিন্তু সে বসার মধ্যে যতটা জাঁকজমক ছিল, ততটা স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। কিন্তু সাধারণ বসার ঘরটিতে সন্ধ্যার সময় বসে সবচেয়ে আরাম পেতাম আমরা। সারা সন্ধ্যেটা জুড়ে মা আমাকে ও পেগটিকে বই পড়ে শোনাতেন। চারদিকের অন্ধকারের মধ্যে একটি রুদ্ধদ্বার আলোকিত ঘরের মধ্যে আমাদের আরামঘন মুহূর্তগুলো কোনদিক দিয়ে কিভাবে যে কেটে যেত তা বুঝতেই পারতাম না। একদিন মা শোনালেন যীশুর প্রিয় শিষ্য ল্যাজারাসের কাহিনী। মৃত্যুর তিনদিন পর যীশু তাঁর নাম ধরে ডাকার সঙ্গে সঙ্গে কবর থেকে উঠে আসেন মৃত ল্যাজারাস। তা শুনে ভয় পেয়ে যাই আমি। আমার ধারণা হয় এমনি করে মৃত মানুষেরা উঠে আসতে পারে কবর থেকে। আমাকে তখন একদিন উপরতলা থেকে সমাধি প্রাঙ্গণে কবরগুলোকে দেখানো হয়। বলা হয়, ঐ দেখ, এক একটি কবরের মধ্যে মৃতেরা কিভাবে শান্তভাবে শুয়ে আছে। সুতরাং কোন ভয় নেই। যীশুর মত অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন পুরুষ আর কে আছে, যাঁর ডাকে মৃত ব্যক্তি কবর থেকে উঠে আসবে?

একদিন সন্ধ্যাবেলায় পেগটি আর আমি আমাদের বসার ঘরে বসেছিলাম। মা প্রতিবেশী কোন এক বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমি তখন কুমীর সম্বন্ধে একটা কাহিনী পড়ে শোনাচ্ছিলাম। পড়তে পড়তে ক্রমে আমার ঘুম পেলেও আমি মাকে ছেড়ে বিছানায় ঘুমোতে যেতে পারছিলাম না। অথচ ঘুমে আমার চোখগুলো ঢুলু ঢুলু করছিল আর তার জন্য পেগটি যখন ছুঁচসুতো দিয়ে তার মোজা বুনছিল তখন তার চেহারাটাকে বিরাটাকার দেখাচ্ছিল। একসময় আমি পেগটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, তোমার বিয়ে হয়েছিল?

পেগটি বলল, বিয়ের কথাটা কে তোমার মাথায় ঢোকাল? আমার কখনো বিয়ে হয়নি এবং হবেও না।

আমি তখন বললাম, একের বেশী স্বামী কারোর গ্রহণ করা কি উচিত? পেগটি বলল, একসঙ্গে একের বেশী স্বামী কেউ গ্রহণ করে না, কিন্তু স্বামী মরে গেলে যে কোন নারী অপর কাউকে স্বামীরূপে গ্রহণ করতে পারে।

এমন সময় সদর দরজায় ঘন্টা বেজে উঠতেই মা এসে গেছে জানতে পেরে আমি ছুটে গেলাম। দেখলাম মা একা নেই, কালো চুল আর গালপাট্টাওয়ালা এক ভদ্রলোক মাকে সঙ্গে করে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছেন। মা আমাকে কোলে নিয়ে আদর করতেই ভদ্রলোক বললেন, এ যে দেখছি রাজার আদর।

এই বলে ভদ্রলোক করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলে আমি বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। মা অনেক চেষ্টা করলেও আমি কিছুতেই ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলাম না। মা আমাকে বললেন, কারো সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করতে নেই। ভদ্রলোক হাসতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করছিলাম, কোন অছিলায় কখনো কখনো তাঁর হাতটা আমার মার গায়ে ঠেকছিল। আমি এটা চাইছিলাম না।

অবশেষে বাগানের বেড়ার কাছে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক আমাদের দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে বিদায় নিলেন। তাঁর দৃষ্টিটা কেমন যেন কুটিল ও কুলক্ষণাক্রান্ত বলে মনে হলো আমার!

পেগটির হাবভাব দেখে আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম রোজ সন্ধ্যায় মার বাইরে যাওয়া এবং একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে মেলামেশা করাটা পেগটি পছন্দ করছিল না। এই কয়দিন সন্ধ্যার সময় তার মুখটা গম্ভীর হয়ে থাকত।

সেদিন ভদ্রলোককে বিদায় দিয়ে আমাকে নিয়ে মা ঘরে ঢুকতেই পেগটি মাকে বলল, সন্ধ্যেটা তাহলে বেশ আনন্দেই কাটালে।

মা খুশী মনেই বললেন, হ্যাঁ পেগটি, এজন্য আমি তোমার কাছে বাধিত।

পেগটি বলল, একজন অপরিচিত লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় বেশ একটা পরিবর্তন নিয়ে আসে আমাদের জীবনে।

মা বললেন, হ্যাঁ, পরিবর্তনটা বেশ আনন্দদায়কই বলতে হবে।

পেগটি এবার ঘরের মাঝখানে গম্ভীরমুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। আমার মা গুনগুন করে গান গাইছিলেন। আমার ঘুম এসেছিল বলে শুয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর হঠাৎ আমার ঘুমটা ভেঙ্গে যেতে চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, মা এবং পেগটির মধ্যে অস্বস্তিকরভাবে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। দুজনের চোখেই জল।

পেগটি এক সময় বলল, মিঃ কপারফিল্ড থাকলে এসব কখনই পছন্দ করতেন না। একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি।

কথাটা শুনে মা খুবই ব্যথা পেলেন বলে মনে হলো। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন, হায় ভগবান! পেগটি তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি। তুমি কি মনে ভাবছ আমি কচি খুকিটি আছি, আমার বিয়ে হয়নি, আমার বয়স হয়নি?

পেগটি বলল, ঈশ্বরই জানেন তোমার বয়স হয়েছে কিনা, না তুমি বালিকা।

মা বললেন, তাহলে একথা কোন সাহসে বললে? তুমি কি বলতে চাও, এই বাড়ি ছেড়ে আমি এক মুহূর্তের জন্যে কোন বন্ধুর কাছে যেতে পারব না? আমার কি কোন বন্ধু থাকতে পারে না?

পেগটিও রুক্ষস্বরে বলল, তোমার ভালর জন্যই একথা বলেছি ম্যাডাম।

মা আগের থেকে আরো বেশী চোখের জল নিয়ে বললেন, তুমি এমন ভাব দেখাচ্ছ যাতে আমাদের সম্পর্কটা পাকাপাকি হয়ে গেছে, বিয়ের ব্যাপারটা স্থির হয়ে গেছে। কিন্তু আমি তো তোমাকেও বারবার বলেছি, আমাদের মেলামেশাটা এক সাধারণ ভদ্রতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে, তার বাইরে কিছু নয়। লোকে যদি আমাদের এই মেলামেশা নিয়ে বাড়াবাড়ি করে বা আজেবাজে কথা বলে তাতে তার জন্যে কি আমি দোষী? তুমি কি চাও তা স্পষ্ট করে বল পেগটি, তুমি কি চাও আমি মাথা ন্যাড়া করে মুখে কালি মাখিয়ে বেড়াব অথবা আগুনে মুখটা পোড়াব? তুমি হয়ত তা পারবে পেগটি। তোমার দয়া মায়া বলে কিছু নেই। একথা আমি বলতে পারি।

এরপর পেগটি আর কিছু বলল না। সে মার কথায় মনে আঘাত পেয়েছিল। মা আর কোন কথা না বলে আমার বিছানার ধারে চেয়ারটা এনে তাতে বসে আমাকে আদর করতে করতে বললেন, আমার ছোট্ট ডেভি, আমার বাছাধন। আমি আমার এই ছোট্ট ছেলেটাকে কি ভালবাসি না? তার প্রতি কি ঠিকমত নজর দিই না? এই নিয়ে কি কটাক্ষ করা ঠিক হচ্ছে আমার প্রতি?

পেগটি বলল, কেউ সেকথা তোমায় বলেনি। তুমি নিজেই বলছ একথা।

মা তখন আমার গালে তাঁর গাল রেখে বললেন, বল বাছা, আমি কি তোমার দুষ্টু মা? বল বাছা, আমি কি তোমাকে ভালবাসি না? পেগটিই যত ভালবাসে তোমাকে? বল, বল।

আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মার আদরে। মাকে কাঁদতে দেখে আমারও কান্না পেল। ঘরের মধ্যে আমরা তিনজনেই কাঁদতে লাগলাম। তার মধ্যে আমার কান্নার শব্দটাই ছিল সবচেয়ে বেশী।

পরে পেগটি অবশ্য মার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নিল। আমরা আবার সবাই শুয়ে পড়লাম। আমি মার কোলের মধ্যে ভালভাবেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

৩

পরের রবিবার না কি আরও পরে তা আমার স্পষ্ট মনে নেই, চার্চে আবার আমাদের দেখা হলো সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। চার্চ থেকে তিনি আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে এলেন। আমাদের বৈঠকখানা ঘরের জানালার পাশে জেরানিয়াম ফুল ফুটেছিল। ভদ্রলোকের অনুরোধে মা একটি ফুল তুলে তাঁর হাতে দিলেন। ভদ্রলোক আবেগের সঙ্গে বললেন, এ ফুলটি চিরদিন আমার কাছে রেখে দেব। কোনদিন কাছ ছাড়া করব না।

কথাটা শুনে আমার মনে হলো লোকটা কি নির্বোধ! ফুল তো কিছুক্ষণ পরেই শুকিয়ে যাবে। ক্রমে ক্রমে জানতে পারলাম ভদ্রলোকের নাম মার্ডস্টোন। এইভাবে আমি মার্ডস্টোনকে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম, কিছুটা সহনশীলও হলাম। তবে প্রথম দেখার দিন তাঁর প্রতি আমার যে বিতৃষ্ণার ভাব ছিল, সে ভাবটা কাটল না। আমার মার সঙ্গে তাঁর মেলামেশার ব্যাপারে একটা অস্বস্তিকর ঈর্ষায় আচ্ছন্ন করে রেখেছিল আমার মনটাকে। সে ঈর্ষাটাকে কিছুতেই দূর করতে পারলাম না মন থেকে।

কোন এক শরতের সকালে হঠাৎ মার্ডস্টোন ঘোড়ায় চড়ে এসে হাজির হলেন আমাদের বাড়িতে। মা তখন বাড়ির বাগানের সামনের দিকে ছিলেন। ঘোড়া থেকে নেমে মার কাছে গিয়ে বললেন, তিনি নোয়েমটক্‌টে তাঁর কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন। তিনি আমাকেও তাঁর ঘোড়াতে তাঁর সামনে বসিয়ে নিয়ে যেতে চান সেখানে, অবশ্য আমি যদি ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসি, তবেই।

কথাটা শুনেই আমি রাজী হয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। মাও অনুমতি দিলেন। আমি আমার ঘরে পেগটির কাছে গিয়ে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। মার্ডস্টোন বাগানের বেড়ার ধার ঘেঁষে মার সঙ্গে বেড়াতে লাগলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হলাম আমরা। ঘোড়ায় চেপে দুধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে যেতে আমার ভালই লাগছিল। মার্ডস্টোন শক্ত হাতে লাগাম ধরে ছিলেন। আমি মাঝে মাঝে পিছন ফিরে তাঁর মুখপানে তাকাচ্ছিলাম। তাঁর কালো চুল আর গালপাট্টাটাকে আরও কালো মনে হচ্ছিল কাছ থেকে। তাঁর মুখের দাড়িটাও বেশ কালো এবং সেটা তিনি রোজই ছাঁটেন। তাঁর গায়ের রংটা সাদা, বাদামী ও কালোয় মেশানো। আমার মনে হলো, আমার শত বিতৃষ্ণা সত্ত্বেও লোকটা

দেখতে ভাল এবং আমার মাও হয়ত তাই মনে করেন। তবে তাঁর চোখগুলো কালো হলেও কেমন ছোট এবং এর মধ্যে কোন গভীরতা নেই।

মার্ডস্টোন তাঁর গন্তব্যস্থলে পৌঁছে একটা হোটেলে নিয়ে গিয়ে ওঠালেন আমাকে। সেখানে একটি ঘরে দুজন ভদ্রলোক চুরুট খাচ্ছিল। তাদের একজনের নাম মিঃ কুইনিয়ন। কুইনিয়ন আমার পরিচয় জানতে চাইলে মার্ডস্টোন বললেন, এর নাম ডেভিড কপারফিল্ড। তখন তারা দুজনেই হাসতে হাসতে বলে উঠল, ওঃ, সেই মনোহারিণী মোহিনী সুন্দরী বিধবার ছেলে?

ওরা তিনজন শেরী মদ পান করল। আমাকে একটুখানি মদ আর বিস্কুট দিল। খাওয়ার পর একটা ছোটখাটো পাহাড়ের ঘাসে ঢাকা ঢালু উপত্যকায় গিয়ে আমরা বসলাম। দূরের জিনিস দেখার জন্য বাইনাকুলার ছিল। আমার হাতে একবার তা দিল ওরা। বেশ ভালই লাগছিল। দুপুরে হোটেলে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারা হলো।

সন্ধ্যার কিছু আগেই আমরা ফিরে এলাম। মা আমাকে চা খেতে ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। মিঃ মার্ডস্টোন মার সঙ্গে আমাদের বাগানে বেড়াবার পর চলে যেতেই মা আমার কাছে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন দিনটা আমি কেমন কাটিয়েছি, ওরা কি কি বলেছে। যা যা আমার মনে ছিল তার সবটা বললাম আমি। বললাম, ঘোড়ায় চেপে যাওয়া-আসা আর সব মিলিয়ে দিনটা আমার ভালই কেটেছে। মিঃ মার্ডস্টোনের দুজন বন্ধু তোমার সম্বন্ধে বলছিল, সুন্দরী মোহিনী বিধবা।

কথাটা শুনে মার বিশ্বাস হচ্ছিল না। তিনি বার বার হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন, এটা বলল ওরা! নাঃ, আমি মোটেই সুন্দরী নই। তবে হ্যাঁ, লোকটিকে যেন একথা বলো না। তাহলে ও ভদ্রলোক জোর রেগে যাবে।

আমি মাকে সে বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলে মা আমাকে চুম্বন করে চলেগেলেন আর আমিও ক্লান্তির জন্য তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

মাস দুই পরের কথা। কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল যেন তার পরদিন। সেদিন সন্ধ্যায় আমি ও পেগটি নীচের তলায় বসার ঘরে বসে গল্প করছিলাম। আমার হাতে ছিল সেই কুমীরের কথা নিয়ে লেখা বইটি। আমার মা আগের মতই আশেপাশের কোন বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। আমি লক্ষ্য করলাম পেগটি কি একটা কথা বলার জন্য ইতস্ততঃ করছে। তার কথাটার প্রতিক্রিয়া কি হবে আমার মনে এবং কিভাবে নেব কথাটাকে, তা ভেবেই সে বলতে পারছিল না। অবশেষে একসময় ও বলে ফেলল কথাটা।

পেগটি বলল, আচ্ছা মাস্টার ডেভি, তুমি কি আমার সঙ্গে দিন পনের আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবে? কেমন, ব্যাপারটা বেশ মজার হবে না? আমার ভাইয়ের বাড়ি হলো ইয়ারমাউথএ।

আমি বললাম, তোমার ভাই বেশ ভাল মানুষ তো? আমার কথাটার মধ্যে যেন একটা শর্তের সুর ছিল। পেগটি বলল, ভাল মানে? খুব ভাল মানুষ। তার ওপর সেখানে সমুদ্র আছে, আছে কত নৌকো আর জাহাজ, সমুদ্রের বালুকণার বেলাভূমি আর আছে তোমার খেলার সাথী।

আমি বুঝতে পারলাম পেগটি বলতে চাইছে তার ভাইয়ের ছেলে হ্যাম-এর কথা।

আমি আরো বললাম, ব্যাপারটা বেশ আনন্দেরই হবে। কিন্তু মা কি বলবে?

পেগটি বলল, আমি তোমার মাকে বলে ওঁর মত করিয়ে নেব।

আমি তখন বললাম, কিন্তু আমাদের দুজনকে ছেড়ে মা কি করে বাড়িতে একা থাকবে?

পেগটি বলল, কেন, তোমার মাও তো এক পক্ষকালের জন্য মিসেস গ্রেপারদের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছে তাদের বাড়িতে। আরও কয়েকজনই যাবে।

সে রাতে বাড়ি ফিরতেই কথাটা শুনে রাজী হয়ে গেলেন মা। তিনি আমার পনের দিনের থাকা খাওয়ার সব খরচ পেগটিকে দিয়ে দিলেন। আমার যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেল।

পরদিন সকালেই আমাদের রওনা হবার কথা। আমি পেগটির সঙ্গে যাব তাদের বাড়ি ইয়ার মাউথ এ। আমার এখনো মনে আছে, সেদিন সকালবেলায় ঘোড়ারগাড়িটা এসে আমাদের সদর দরজায় দাঁড়াল। নতুন জায়গা ভ্রমণের আনন্দে বাড়ি ছেড়ে যেতে কোন ব্যথাই অনুভব করিনি বা সেদিন ঘুনাক্ষরেও ভাবতে পারিনি, যে বাড়িতে জন্মের পর থেকে এতদিন কত সুখে মানুষ হয়েছি, সেই সুখের বাড়িটা চিরদিনের মত ছেড়ে যাচ্ছি আমি। পনের দিন পর সে বাড়িতে আমি ফিরে এলেও সে বাড়ির প্রাণস্বরূপ যে সুখ আমি এতদিন ভোগ করেছি, সে সুখ আর আমি পাব না। মা আমাকে চুম্বন করে বিদায় দিলেন। আমাদের গাড়িটা ছেড়ে দিলে তিনি গেট থেকে রাস্তায় ছুটে এসে যতদূর পারা যায় তাকিয়ে রইলেন আমাদের দিকে। আমার চোখেও জল এসেছিল। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, মা যখন রাস্তায় আমাদের গাড়িটার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তখন মার্ডস্টোন এসে তাঁর কাছে দাঁড়াল। তারপর আমার জন্য এতখানি বিচলিত হয়ে পড়ার জন্য মাকে বকতে লাগল।

৪

পেগটির হাতে একটা ঝুড়িতে খাবার ছিল। মাঝে মাঝে তা খেয়ে আর ঘুমিয়ে সারা পথটা গাড়িতে ভালই কাটালাম। অবশেষে দূরে সমুদ্রঘেরা ইয়ারমাউথ শহরটা দেখতে পেলাম। পেগটি বলল, এটা সবাই জানে যে, সারা জগতের মধ্যে ইয়ারমাউথ একটা অতি সুন্দর স্থান।

অবশেষে রাস্তার উপর সরাইখানায় আমাদের গাড়িটা যেখানে থামল, সেখানে পেগটির ভাইপো হ্যাম আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল আমাদের জন্য। হ্যামকে আগে কখনো আমি দেখিনি। আমার জন্মের সময় ছাড়া ও আর কখনো আমাদের বাড়িতে যায়নি। সে বেশ বলিষ্ঠ চেহারার এক যুবক, প্রায় ছয় ফুট লম্বা। তার গায়ে ছিল ক্যানভাসের একটা জ্যাকেট আর পরনে ছিল শক্ত কাপড়ের পায়জামা।

হ্যাম আমাকে তার পিঠে চাপিয়ে একটা হাতে আমাদের ছোট বাক্সটা নিল আর পেগটির হাতে রইল আর একটা ছোট বাক্স।

আমি চারদিকে যতদূর পারলাম দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলাম, শুধু নদী আর সমুদ্র, কিন্তু কোথাও কোন বাড়ি-ঘর নেই। পরে বোঝা যায়, এখানকার লোকগুলো সব জেলে, মাছ ধরাই ওদের কাজ। ওরা সমুদ্রের ধারে বড় বড় নৌকোগুলোকে ঘরের মত করে তাতেই বাস করে।

হ্যামদের বাড়ি দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। বাড়ি বলতে জাহাজের মত বড় একটা অচল নৌকোকে ওরা দরজা জানালাসহ ঘরের মত করে বাস করছে তার মধ্যে। হ্যাম বলল, রাজাদের প্রাসাদ পেলেও এ ঘর ছেড়ে আমি বাস করতে যাব না। এত মজা, এত আরাম আমি আর কোথাও পাব না।

আসলে এটা একটা নৌকো ছিল একদিন। কতদিন ধরে জলে ভেসে বেড়িয়েছে। আজ এটা একটা চমৎকার অচল ঘর। ভিতরটা সত্যিই বেশ আরামদায়ক। তার মধ্যে চেয়ার, টেবিল, ড্রয়ার, দেওয়াল ঘড়ি প্রভৃতি সাধারণ আসবাবপত্র সবই আছে। ঘরের ভিতরটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে সাধারণ রঙের ধর্ম বিষয়ক ছবি।

কিছুক্ষণ পরে পেগটি পাশের একটা ঘর খুলে আমাকে বলল, এটা তোমার শোবার ঘর। ঘরটাকে আমার খুবই ভাল লাগল।

আমি যখন হ্যামের পিঠে চেপে বাড়ি ঢুকি তখন সাদা শায়াপরা এক ভদ্রমহিলা আমাকে অভ্যর্থনা করে। সে অনেক আগে থেকেই দরজায় অপেক্ষা করছিল। তার কাছে একটি খুব সুন্দরী ছোট্ট মেয়েও ছিল। মেয়েটি একবার তাকে চুম্বন করতে দিয়েই ছুটে পালিয়ে গিয়ে লুকিয়ে পড়ল।

খাবার সময় পেগটির ভাই এল। লোকটিকে বেশ ভাল বলে মনে হলো। তার মুখের উপর ছিল একটা সরলতার ভাব। সে পেগটিকে 'বালিকা' বলে সম্বোধন করে তার গালে আলতোভাবে একটা চুম্বন করল। পেগটি আমার সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল যে তার নাম মিস্টার পেগটি, বাড়ির মালিক।

মিঃ পেগটি আমাকে বলল, তোমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলাম স্যার। তুমি দেখবে আমরা গরীব হতে পারি, যত্ন ও আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটি হবে না তোমার।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে বললাম, এ বাড়ির এই আনন্দময় পরিবেশে আশা করি আমি বেশ সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই থাকব।

আমার মার কুশল জিজ্ঞাসা করার পর মিঃ পেগটি আমাকে বলল, যদি তুমি আমাদের এখানে এক পক্ষকাল থাক, তাহলে হ্যাম, এমিলি এবং আমরা সবাই তোমার সঙ্গ পেয়ে গর্ববোধ করব।

এইভাবে একজন গৃহস্বামী হিসাবে আমার প্রতি আদর-আতিথেয়তা জানাল মিঃ পেগটি।

আমি দেখলাম সব মিলিয়ে বাড়িটাতে আনন্দের উপকরণ প্রচুর রয়েছে। শুধু সারা বাড়িটাতে মাছের গন্ধ। এক জায়গায় দেখলাম অনেক মাছ স্তূপাকার করা রয়েছে। প্রথম প্রথম আমি মাঝে মাঝে নাকে রুমাল চাপা দিলেও পরে সে গন্ধটা সয়ে গেল আমার। মোটের উপর পেগটিদের বাড়িটাকে আমার পক্ষে বেশ আনন্দদায়ক বলেই মনে হলো।

আমি ভেবেছিলাম মিসেস গামিজ মিঃ পেগটির স্ত্রী এবং হ্যাম আর এমিলি তাদের ছেলে মেয়ে। কিন্তু পরে জানলাম, হ্যাম আর এমিলি হলো মিঃ পেগটির ভাইপো ভাইঝি। মিঃ পেগটির ভাই মাছ ধরতে গিয়ে সমুদ্রে ডুবে মারা গেছে। তার ভাইয়ের স্ত্রীও মারা গেছে। এমিলিও এক পিতৃমাতৃহীন অনাথ সন্তান। অনাথ ভাইপো ভাইঝি হিসাবে তাদের ছোট থেকে মানুষ করছে পেগটি। আরো জানলাম, মিসেস গামিজ পেগটির স্ত্রী নয়। সে হচ্ছে মিঃ পেগটির এক মৃত

বন্ধুর স্ত্রী। গরীব বন্ধুর মৃত্যুর পর তার সহায়সম্বলহীনা বিধবা স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে মর্যাদার সঙ্গে আশ্রয় দিয়েছে মিঃ পেগটি। সাদা শায়াপরা সেই মহিলাটিই হলো মিসেস গামিজ।

সেদিন রাত্রিতে আমার ছোট্ট ঘরটাতে বিছানায় শুয়ে যখন দুচোখে গভীর ঘুম জড়িয়ে আসছিল তখন একটা বড় অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছিল আমার। সমুদ্র থেকে ঝড়ের গর্জন ভেসে আসছিল আর আমার মনে হচ্ছিল, যে অচল বড় নৌকোটাকে ঘর বানানো হয়েছে যার মধ্যে আমি শুয়ে আছি, সেই অচল নৌকোটা হঠাৎ সচল হয়ে উঠেছে এবং চারদিকের সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার মাঝখানে ভাসছে আর দুলছে।

পরদিন থেকে ছোট্ট এমিলিই হয়ে উঠল আমার খেলার সাথী। আগের দিন সন্ধ্যাতেই আমার প্রতি লজ্জার ভাবটাকে কাটিয়ে আমার কাছে এসে বসেছিল এমিলি। এমিলির সঙ্গে আমি সমুদ্রের বেলাভূমিতে নুড়ি পাথর কুড়োতে লাগলাম। খেলার ফাঁকে ফাঁকে কথায় কথায় বুঝলাম, এমিলি তার এই শৈশবেই ব্যবহারিক জীবন সম্বন্ধে কত জ্ঞান লাভ করেছে! সে একসময় আমাকে বলল, তোমার বাবা নেই, কিন্তু তোমার বাবা ছিলেন একজন ভদ্রলোক, সমাজের উঁচু তলার মানুষ, তোমার মা একজন ভদ্রমহিলা। কিন্তু আমার বাবা ছিল একজন গরীব জেলে। আমার মা ছিল জেলের স্ত্রী।

আমি এই অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটাকে পাল্টে এমিলিকে বললাম, তুমি তো একজন নাবিকের মেয়ে। সমুদ্রকে তুমি নিশ্চয় ভয় পাও, না?

এমিলি তার মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ, আমি সমুদ্রকে ভয় পাই। আমি দেখেছি সমুদ্র আমাদের কোন কোন লোকের প্রতি বড় নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। একটা বাড়ির মত বড় বড় নৌকোকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে দেয়। আমার বাবা একদিন এই সমুদ্রেই ডুবে যায়। তার নৌকোটাকে উল্টে দিয়ে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায় সমুদ্র। সে নৌকোটাকে আর আমি দেখিনি। আমার বাবাকে আর আমার মনে পড়ে না।

আমি বললাম, আমি আমার বাবাকে কখনোই দেখিনি। বাড়িতে আমি আর আমার মা দুজনে সুখেই আছি। আমি আমার বাবার কবরটাকে আমার বাড়ির কাছে সমাধিপ্রাঙ্গনে একটা গাছের তলায় দেখতে পাই। সেই গাছে রোজ সকালে পাখিরা গান করে।

এমিলি বলল, কিন্তু আমার বাবার কবর আমি কখনো দেখতে পাইনা। সমুদ্রের অতল গভীরে কোথায় আমার বাবা সমাধিস্থ হয়েছে তা কে জানে! মাকে আমি বাবার মৃত্যুর আগেই হারিয়েছি।

এইভাবে ছোট্টমেয়ে এমিলি আমাদের দুজনের অনাথ শৈশবাবস্থার মধ্যে কত সহজে একটা সীমারেখা টেনে দেয়।

ওর কাকা মিঃ পেগটিকে ও আঙ্কল ভ্যান বলে ডাকত। সে বলল, আমি যদি জীবনে ধনী ভদ্রমহিলা হতে পারি তাহলে আঙ্কল ভ্যানকে একটা আকাশনীল কোট করিয়ে দেব, তাতে থাকবে হীরের বোতাম। তাকে দেব লাল মখমলের একটা ওয়েস্টকোট, একটা ভাল পায়জামা, একটা মোরগটুপী, একটা বড় সোনার হাত ঘড়ি, রূপোর প্যাদুকা আর এক বাক্স টাকা। আমার কাকা একজন গরীব জেলে।

আমি বুঝলাম, এমিলি পারলে যে এই সবই দিত তাতে কোন সন্দেহ নেই। সে তার কাকাকে

সত্যিই ভালবাসে।

এমিলি তখন তার কথা থামিয়ে আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকাল। বুঝলাম যে জিনিস-গুলোর সে ফিরিস্থি দিয়েছে একটু আগে, সেগুলো তার জীবনের এক গৌরবময় স্বপ্ন।

এরপর আমরা আবার পাথর কুড়োতে লাগলাম।

একসময় আমি এমিলিকে বললাম, তুমি কি ভদ্রমহিলা হতে চাও?

এমিলি হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, হ্যাঁ আমরা সবাই একসঙ্গে ভদ্রলোক হয়ে উঠতে চাই। ভদ্রসমাজের লোক হতে চাই। আমি, আমার কাকা, হ্যাম, মিসেস গামিজ—সবাই। তখন ঝড়ো বা দুর্যোগঘন আবহাওয়া দেখলে আমরা আর ভয় পাব না। তখন কোন জেলে কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমরা তাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারব।

ফেরার সময় লক্ষ্য করলাম এমিলি সমুদ্রকে ভয় করে বললেও তার অনেক সাহস আছে। সে কাঠের জেটির উপর সমুদ্রের অনেক কাছে চলে যায়। সমুদ্রের বড় ঢেউ দেখেও ভয় পায় না। অথচ আমি একটা ঢেউকে বেলাভূমির দিকে ছুটে আসতে দেখলেই ছুটে পালিয়ে যাবার কথা ভাবি।

অবশেষে খেলা সাঙ্গ করে আমরা পেগটিদের বাসায় ফিরে আসি। মিঃ পেগটি আমাদের দেখে খুশি হয়ে বলে, দেখ দেখ, যেন দুটি বাচ্ছা থ্রাশ পাখি, কেমন মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াচ্ছে!

আমরা সত্যিই খুব মনের আনন্দে ছিলাম দুজনে। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে পেগটিদের কাঠের ফ্ল্যাটটাতে ঘুরে বেড়াতাম, কখনো দুজনে একসঙ্গে বসে গল্প করতাম, বাইরে খেলা করতাম। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে আমি এমিলিকে ভালবাসতাম। আমাদের সে ভালবাসা ছিল বিশুদ্ধ ও স্বার্থলেশহীন ভালবাসা। বয়স্ক নরনারীদের যেকোন উত্তম ভালবাসার থেকে উচ্চ এবং সৎ। এমিলির দুটি ডানা না থাকলেও তার শুধু নীল চোখ দেখেই তাকে দেবদূত বলে মনে হত আমার। তার সঙ্গে যখন থাকতাম তখন সময়টাকেও শিশু ভাবতাম। ভাবতাম সময়টার কোন বয়স বাড়েনি, সে আমাদের মতই ছোট আছে। সময়টা কোন দিক দিয়েযে কেটে যেত তা বুঝতে পারতাম না। আমি একসময় এমিলিকে প্রশ্ন করলাম সে আমাকে ভালবাসে কি না? বললাম সে যদি আমাকে ভাল না বাসে তবে আমি একটা তরবারি দিয়ে নিজেকে হত্যা করব। এমিলি বলল সে আমাকে ভালবাসে এবং সে যে আমাকে ভালবাসে সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই।

কেন জানি না, আমার প্রায়ই মনে হত, এমিলি আর আমি দুজনেই একদিক দিয়ে অসহায়, কারণ আমাদের দুজনেরই কোন ভবিষ্যৎ নেই।

মিঃ পেগটির সংসারে মোটের উপর শান্তি বিরাজ করলেও মিসেস গামিজ তাঁর স্বামীকে ফিরে না পাওয়ার জন্য সব সময় বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকত। আগুনের ধারে বসে বিষণ্নমুখে প্রায়ই বলতে থাকে, আমি এক নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত জীব। সব ঘটনা—সব কিছুই আমার প্রতিকূলে যায়।

সব সময়েই বিষাদে গম্ভীর হয়ে থাকে মিসেস গামিজ।

মিঃ পেগটি সরল প্রকৃতির প্রাণখোলা লোক। সে মিসেস গামিজকে বুঝিয়ে সহজ করে

তোলার চেষ্টা করে। কিন্তু মিসেস গামিজ কারো কথা শোনে না। সে বুঝতে চায় না, যে দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা গেছে সে দুর্ঘটনাতে অনেকেই মারা যায়। এই পরিবারেই তো পেগটির বাবাও মারা গেছে।

মিসেস গামিজের এই মানসিক অবস্থাটাকে কেউ সহজ করে তুলতে না পারলেও মিঃ পেগটি সেটাকে সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। সে এই অবস্থাটার ব্যাখ্যা দিয়ে সবাইকে বলে, অনেক দিন আগে স্বামীর মৃত্যু হলেও সেই লোকটাকে আজো ভুলতে পারেনি মিসেস গামিজ। অকারণে সেই কথা ভেবে ভেবে অযথা কষ্ট পাচ্ছে।

অথচ দেখা যায় পেগটিদের সংসারে বেশ মর্যাদার সঙ্গে আছে মিসেস গামিজ। কেউ তাকে অশ্রদ্ধা করে না। কেউ তাকে আশ্রিতা হিসাবে দেখে না। খাবার টেবিলে তাকে বরাবর সম্মানিত অতিথির মর্যাদা দেওয়া হয়।

এদিকে দেখতে দেখতে এক পক্ষকাল কেটে গেল। আমার বাড়ি যাবার সময় হলো।

মিঃ পেগটি, হ্যাম, মিসেস গামিজ—সকলের কাছেই বিদায় নিলাম অতি সহজে, কিন্তু এমিলির কাছে বিদায় নিতে গিয়ে এক অব্যক্ত অন্তর্বেদনায় ভারী হয়ে উঠল আমার মন।

যাই হোক, আমাদের মিস পেগটির সঙ্গে ঘোড়ার গাড়িতে উঠে আমি বাড়ি রওনা হলাম।

৫

পথে আমার কেবলি মনে হচ্ছিল, আমি এতদিন আমাদের বাড়ির প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়ে পড়েছিলাম। এমিলিকে খেলার সাথী হিসাবে পেয়ে আনন্দে মত্ত হয়ে বাড়ির কথা ভুলে গিয়েছিলাম প্রায়।

আবার আমি বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, আমার মার কাছে ফিরে যাচ্ছি একথা ভাবতেই এক মধুর উত্তেজনায় কেমন হয়ে উঠল আমার মনটা।

অবশেষে ব্লাণ্ডারস্টোন এসে গেল। আমাদের বাড়ির সদর দরজার সামনে থামল গাড়ীটা। কিন্তু একজন নতুন লোক দরজা খুলে দিল। আমি বুঝতে পারলাম না মা কেন আসেন নি। পেগটি গাড়ি থেকে নেমে আমার হাত ধরে সোজা আমায় রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। বললাম, কি ব্যাপার পেগটি? মা কেন গেটের কাছে আসেনি?

পেগটি আমার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে বলল, মা কেন আসেনি? আমি সব বলব বাছা। সব বলব। কথাটা আমি বলতে গিয়েও ঠিকমত বলতে পারিনি।

আমি আরো ভয় পেয়ে গেলাম। রুদ্ধশ্বাসে বললাম, বল, বল পেগটি।

পেগটি একটা ঢোক গিলে অনেক কষ্টে বলল, তুমি বাবা পেয়েছ।

কেমন করে তা সম্ভব আমি তা বুঝতে পারলাম না। আমার বাবা তো সমাধি প্রাঙ্গনে সমাধির মধ্যে সমাহিত হয়ে আছেন। তবে কি তিনি সমাধির ভিতর থেকে উঠে এসেছেন?

আমার বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে পেগটি বলল, তুমি এক নতুন বাবা পেয়েছ।

এক নতুন বাবা! আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

পেগটি বলল, হ্যাঁ, তাকে দেখবে চল।

আমি বললাম, আমি তাকে দেখতে চাই না।

পেগটি প্রশ্ন করল, আর তোমার মাকে?

তখন আমি না গিয়ে পারলাম না। আর কোন আপত্তি করতে পারলাম না। পেগটি আমাকে আমাদের ভাল বসার ঘরটাতে নিয়ে গিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে এল। আমি দেখলাম, আগুনের একধারে আমার মা কি এক বোনার কাজ করছিলেন, আর একধারে মার্ডস্টোন বসেছিল। মা আমাকে দেখে হাতের কাজ ফেলে তাড়াতাড়ি আমার কাছে চলে এলেন। তবে আমার মনে হল তিনি ভয়ে ভয়ে আসছেন।

মার্ডস্টোন তখন বলল, ক্ল্যারা, প্রিয়তমা আমার, মনে রেখো, নিজেকে সংযত করতে হবে তোমায়। নিজেকে সংযত কর। বাছা ডেভি, কেমন আছ?

আমি নীরবে আমার হাতটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তারপর আমি আমার মাকে চুম্বন করলাম। তিনিও আমাকে চুম্বন করে আমার ঘাড়ে হাত চাপড়ে আবার কাজে গিয়ে বসলেন। আমি আর মার দিকে অথবা মার্ডস্টোনের দিকে তাকালাম না। মার্ডস্টোন কিন্তু আমাদের দুজনের দিকেই তাকাতে লাগল। আমি বাগানের ধারে গিয়ে বাইরে উঠোনের একধারে কাঁটাগাছগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। গাছগুলো ঠাণ্ডায় তাদের মাথাগুলো গুটিয়ে নিয়েছে।

আমি কোনরকমে সে ঘর থেকে বেরিয়ে দোতলায় আমার শোবার ঘরে চলে গেলাম। কিন্তু সেটা আর আমার শোবার ঘর নেই। আমার শোবার ঘরটা অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়েছে। আমি তখন সেখান থেকে কুকুরের ঘরের পাশ দিয়ে অন্য এক ঘরে চলে গেলাম। কুকুরের যে ঘরটা আগে চাবি দেয়া ছিল আজ সেখানে রয়েছে কালো লোমওয়ালা একটা বড় কুকুর । কুকুরটা আমাকে দেখে ঘেউ ঘেউ করতে করতে রাগে লাফাতে লাগল আমাকে ধরার জন্য।

যে ঘরে আমার বিছানা রাখা হয়েছিল, সে ঘরটার যদি চেতনা থাকত, তাহলে তা বুঝতে পারত কী দারুণ বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে আমি তার কাছে এসেছি। ঘরটা যেন শূন্য সকরুণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। ঘরটা একেবারেই শ্রীহীন, কোনমতেই পছন্দ হবার মতো নয়। ঘরের সিলিং এর কাচগুলো ফেটে গেছে। জানালার কাচগুলোও ঠিক নেই। ঘরের দেওয়ালের তাকে অনেক কাগজপত্র। রঙচটা দেওয়ালগুলোতে অনেক দাগ আর চুণবালি খসা। ঘরের একধারে মুখ ধোবার আধভাঙ্গা বেসিনের তিনটে পায়া শীর্ন হয়ে পড়েছে। চোখ থেকে গাল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল আমার। তীব্র এক বিষাদ ছাড়াও আমার কান্নার অন্য একটা কারণ ছিল, কিন্তু আমি সেটা ভেবে ঠিক করতে পারছিলাম না। ঘরের অবস্থাটা আমার মিসেস গামিজের কথা মনে করিয়ে দিল। আমার নিজের এই নিঃসঙ্গ পরিত্যক্ত অবস্থায় আমার মনে হলো আমি এমিলিকে কী ভীষণভাবে ভালবাসি! কে যেন আমায় তার কাছ থেকে জোর করে এমন এক জায়গায় ছিনিয়ে এনেছে, যেখানে আমাকে কেউ চায় না, যেখানে তার মত আমায় যত্ন করার কেউ নেই।

আমি কাঁদতে কাঁদতে বিছানার এক কোণে গড়াতে গড়াতে কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

হঠাৎ একজনের কথায় ঘুমটা আমার ভেঙ্গে গেল। দেখলাম আমার মা আর পেগটি আমার

খোঁজে এসে আমাকে দেখে বলে উঠল, এই যে এখানে রয়েছে ও।

আমার মা বললেন, ডেভি, কি হয়েছে তোমার?

মা আমাকে এ প্রশ্ন করায় আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমার ঠোঁটদুটো এক দুর্জয় অন্ধ চাপা অভিমানে কাঁপছিল এবং সেই কম্পিত ঠোঁটদুটোই মার কথাটার সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারত। কিন্তু আমি সে ঠোঁটদুটো লুকোবার জন্যই মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বললাম, কিছু না।

মা আবার বললেন, ডেভি, বাছা আমার।

অন্য কথায় আমার কিছু হত না। কিন্তু 'বাছা আমার' কথাটা বলতেই আমার দুঃখ আরো বেড়ে গেল। আমি বিছানার চাদরে আমার জলভরা চোখদুটোকে ঢাকলাম। মা আমাকে তুলতে গেলে আমি তাঁকে আমার হাত দিয়ে সরিয়ে দিলাম জোর করে। আমার মা তখন বললেন, পেগটি, এ হচ্ছে তোমার কাজ। আমার প্রিয়জনের বিরুদ্ধে আমার ছেলের মনটাকে এভাবে বিষিয়ে দিতে তোমার বিবেকে একটুও বাধল না? তোমার বিষয়ে আমার কোন সন্দেহই নেই।

পেগটি গম্ভীর মুখে শুধু বলল, ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করুন মিসেস কপারফিল্ড। তুমি এইমাত্র যা বললে, পরে যেন তার জন্য কোথাও দুঃখ পেতে না হয়।

মা বললেন, ডেভি, তুমি বড় দুষ্টু। পেগটি, তুমি একটি বন্য জীব। আমার মধুচন্দ্রিমাটাই নষ্ট করে দিলে।

এমন সময় মার্ডস্টোন এসে আমার মার হাতের উপর হাত রেখে বললেন, প্রিয়তমা ক্ল্যারা, এখানে কি হচ্ছে? তুমি কি আমার কথা ভুলে গেছ? কঠোর হতে হবে।

আমার মা বললেন, আমি দুঃখিত এডওয়ার্ড। আমি সবই বুঝি। কিন্তু সেভাবে কঠোর হওয়াটা সত্যিই বড় কঠিন।

মার্ডস্টোন তখন আমার মাকে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে মার কানে কানে ফিসফিস করে কি বলে তাঁকে চুম্বন করলেন আর মার মাথাটা তাঁর কাঁধের উপর ঢলে পড়ল আর তাঁর একটা হাত তার গলাটাকে স্পর্শ করল। আমি তখন বুঝতে পারলাম, একতাল কাদামাটির মত আমার দুর্বল প্রকৃতিটাকে মার্ডস্টোন ইচ্ছামত যে কোন ভাবে গড়ে তুলতে পারত। যে কোন দিকে বাঁকাতে পারত। সে ধারণাটা এখনো আমার মনে আছে।

মার্ডস্টোন এবার মাকে বলল, তুমি এখন নীচে যাও প্রিয়তমা। ডেভিড আর আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।

মা চলে যেতে মার্ডস্টোন পেগটিকে বলল, তোমার মালিক পত্নীর নাম জান?

পেগটি বলল, তিনি অনেক দিন ধরেই আমার মালিক আছেন এবং তাঁর নাম আমার জানা উচিত।

মার্ডস্টোন বললেন, আমি উপরে আসার সময় শুনলাম তুমি তাঁকে আগেকার নাম ধরে ডাকছ, যেটা তাঁর আসল নাম নয়। তুমি জান, এখন তিনি আমাকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছেন। সেকথাটা মনে রাখবে কি?

পেগটি কোন উত্তর না দিয়ে আমার পানে একবার তাকিয়েই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মার্ডস্টোন তখন ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে একটা চেয়ার টেনে এনে আমার বিছানার

বসে বললেন, ডেভিড, তোমার মুখের উপর কিসের দাগ?

তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছিল। আমি বললাম, না না স্যার। কিন্তু তিনি জানতেন এসব চোখের জলের দাগ। তিনি তাঁর ঠোঁটদুটোকে চেপে বললেন, আচ্ছা ডেভিড, আমার যদি একটা দুরন্ত ঘোড়া অথবা কুকুর থাকত, তাহলে তাকে পোষ মানানোর জন্য কি করতাম জান?

আমি বললাম, আমি জানি না স্যার।

মার্ডস্টোন বললেন, আমি তাকে পোষ মানানোর জন্য প্রহার করতাম। তাতে তার শরীরের শত রক্তপাত হলেও আমি তা করতাম।

এরপর তিনি বললেন, বয়স অনুপাতে তোমার বুদ্ধিটা বেশী। তুমি আমাকে ভালভাবেই জান, ভালভাবেই বুঝতে পেরেছ আশা করি। এখন মুখটা ধুয়ে নাও। তারপর আমার সঙ্গে নীচে চল।

আমি তাঁর কথামত মুখ ধুয়ে নীচে বসার ঘরে গেলাম তাঁর সঙ্গে। তাঁর একটা হাত আমার কাঁধের উপর তখনো ছিল। তিনি আমার মাকে বললেন, ক্ল্যারা, আর তোমাকে কোন অস্বস্তি ভোগ করতে হবে না আশা করি। আমরা এর ছেলেমানুষীটাকে ধীরে ধীরে শুধরে দেব। আমার পক্ষে সত্যিই সেটা সম্ভব হবে।

ঘটনাটা সামগ্রিকভাবে আমার জীবনধারাটা একেবারে বদলে দিল। যদি তিনি সেই সন্ধ্যায় আমার সঙ্গে একটা ভালবাসার কথা বলতেন, ব্যবহারিক বিষয়ে আমার শিশুসুলভ যন্ত্রণাটা কোথায় তা যদি তিনি বুঝতে পারতেন! যদি ঘরের পরিবেশটা আগের মত সহজ ও স্বাভাবিক করে তুলতেন আমার পক্ষে! তা যদি তিনি পারতেন, তাহলে আমি বাইরে তাঁকে ভণ্ডামীর সঙ্গে কৃত্রিম আনুগত্য না দেখিয়ে সত্যি সত্যিই কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠতাম তাঁর প্রতি, তাঁকে ঘৃণা না করে সম্মান করতে পারতাম।

ঘরের মধ্যে আমার হাঁটা চলা দেখে মা কিছুটা দুঃখ পেলেন। কারণ আমার হাঁটাচলার মধ্যে আগের সেই স্বাধীনতা ও সহজ ভাবটা ছিল না।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে খেলাম। খাওয়ার সময় আমি লক্ষ্য করলাম, মার্ডস্টোন আমার মার প্রতি খুব বেশী অনুরাগ দেখাচ্ছেন এবং আমার মাও তাঁর প্রতি খুব বেশী অনুরক্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁদের মধ্যে যে সব কথাবার্তা হচ্ছিল তার থেকে একটা জিনিস জানতে পারলাম, মার্ডস্টোনের এক দিদি এ বাড়িতে থাকার জন্য আজ সন্ধ্যায় আসছে।

খাওয়ার পর আমরা আগুনের ধারে বসেছিলাম। আমি পেগটির কাছে যাওয়ার সুযোগ খুঁজছিলাম। এমন সময় সদরদরজার সামনে একটা ঘোড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। মার্ডস্টোন ব্যস্ত হয়ে অতিথিকে স্বাগত জানাতে গেলেন। মাও তাঁর পিছু পিছু গেলেন এবং আমিও মার পিছু পিছু এগিয়ে গেলাম। এক সময় হঠাৎ পিছন ফিরে মা আমাকে আসতে দেখে আমাদের বসার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, আমি যেন আমার নতুন বাবাকে ভালবাসি এবং তাঁর কথা শুনি।

এই কথা বলেই মা তাড়াতাড়ি চলে গেলেন।

মিস মার্ডস্টোনকে আমাদের বসার ঘরে এনে বসানো হলো। মুখখানা তাঁর অনেকটা ভাইয়ের মত। গায়ের রংটা লাল কালোয় মেশানো। মুখটা সব সময় ভার ভার। তাঁর হাবভাব ও কথা শুনে মনে হলো তাঁর মনটা পাথরের মত শক্ত।

আমাকে দেখে মিস মার্ডস্টোন মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কি তোমার ছেলে, বউ?

আমার মা বললেন, হ্যাঁ।

এরপর মিস মার্ডস্টোন বললেন, আমি আবার ছেলে-টেলে পছন্দ করি না। যাই হোক, কেমন আছ বাছা?

আমি যথারীতি বললাম যে খুব ভাল আছি এবং আশা করি তিনিও ভাল আছেন। কিন্তু কথাটা আমি এমন নীরসভাবে বললাম যে তাতে খুশি হতে পারলেন না মিস মার্ডস্টোন। তিনি শুধু বললেন, ওকে সদাচরণ শিখতে হবে।

এরপর মিস মার্ডস্টোন যে ঘরে থাকবেন সেই ঘরটি তাঁকে দেখিয়ে দেওয়া হলো। পরে আমি বুঝলাম তিনি এ বাড়িতে চিরদিনের মত থাকতে এসেছেন। আর কখনই যাবেন না এখান থেকে। পরদিন সকালে মা চা করতে গেলেন। মিস মার্ডস্টোন মার গালে একটা টোকা দিয়ে বললেন, ক্ল্যারা, বোন আমার, আমি এ বাড়িতে এসেছি তোমাকে সব কাজে সাহায্য করার জন্য। সুতরাং তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি যদি ভাঁড়ার ঘরের চাবিটা আমাকে দাও তো, সব কাজকর্ম আমিই দেখাশোনা করব। তোমাকে সংসারের কোন কিছু ভাবতে হবে না।

সেইদিন থেকে ভাঁড়ারের ঘরের চাবিটা সব সময় তিনি নিজের কাছে রেখে দিতেন এবং রাত্রিকালে তাঁর বিছানায় বালিশের তলায় রেখে ঘুমোতেন।

পরদিন সন্ধ্যার সময় মিস মার্ডস্টোন তাঁর ভাইয়ের কাছে সংসারের কাজকর্মের পরিচালনার ব্যাপারে পুরনো ব্যবস্থা পাল্টে কিভাবে তার উন্নতি করা যায়, সেই বিষয়ে তাঁর পরিকল্পনার কথা বলছিলেন। মার্ডস্টোন তাতে তাঁর সম্মতি জানালেন। আমার মা কাছেই বসেছিলেন। তিনি তা শুনতে পেয়ে রেগে গিয়ে তার প্রতিবাদ করলেন। তিনি বললেন, তাঁর সঙ্গে একবার এ ব্যাপারে আলোচনা করা উচিত ছিল।

মিঃ মার্ডস্টোন তখন মাকে দৃঢ় হবার উপদেশ দিলেন। আমার মা তখন বললেন, তুমি সব সময় দৃঢ় হবার উপদেশ দাও। কিন্তু তুমি নিজেই তা মেনে চল না। এটা সহ্য করা খুবই কঠিন যে, আমার বাড়িতে আমার সংসারের বিষয়ে আমার সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হবে না।

মার কথা শেষ না হতেই মার্ডস্টোন গর্জন করে উঠলেন, আমার নিজের বাড়িতে!

আমার মা তখন কথাটার সংশোধন করে বললেন, ঠিক আছে, তোমার বাড়িতে সাংসারিক কোন বিষয়ে আমার কিছু বলার থাকবে না, এ কেমন কথা এডওয়ার্ড?

মিস মার্ডস্টোন তখন তাঁর ভাইকে বললেন, এ ব্যাপারটার এখানেই শেষ হোক। আমি কাল চলে যাব।

মিঃ মার্ডস্টোন তাঁর বোনকে ধমক দিয়ে বললেন, জেন মার্ডস্টোন চুপ কর। তোমার কথা শুনে মনে হয় তুমি আমার চরিত্র জান না।

আমার মা এক অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়ে বললেন, আমি তো কাউকে চলে যেতে বলছি

না। আমি সেটা চাইও না। আমি শুধু বলছি, আমার সঙ্গে সব বিষয়ে আলোচনা করা উচিত। এটা একটা নিয়ম মাফিক ব্যাপারমাত্র।

মিস মার্ডস্টোন রুমালে চোখ চাপা দিয়ে আবার কিছু বলতে চাইলে মিঃ মার্ডস্টোন গর্জন করে উঠলেন, জেন মার্ডস্টোন, তুমি চুপ করবে কি না?

এরপর তিনি আমার মার দিকে চেয়ে বললেন, ক্ল্যারা, তোমার ব্যবহারে আজ আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি জেনেশুনেই তোমার মত এক অনভিজ্ঞা বালিকাকে বিয়ে করেছিলাম। আশা করেছিলাম, সময় বিশেষে কিভাবে দৃঢ়তার পরিচয় দিতে হয় তা শিখিয়ে দেব, তোমার চরিত্রকে শক্ত করে গড়ে তুলব। আমার বোন যখন দয়া করে সাংসারিক কাজকর্ম পরিচালনার সব দায়িত্বভার নিজের উপর তুলে নিতে চাইল তখন তার প্রতিদানে কেন এই হীন অপমান?

আমার মা অনুনয়ের সুরে বললেন, একথা বলো না এডওয়ার্ড। আমি সকলের প্রতিই স্নেহশীলা। পেগটিকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

মিঃ মার্ডস্টোন বললেন, তোমার দুর্বলতার অন্ত নেই।

এর পর তিনি তাঁর বোনকে বললেন, শোন জেন মার্ডস্টোন, আমি কখনই কাউকে কড়া কথা বলি না। আজ সন্ধ্যায় এই ধরণের যে এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটল এতে আমার কোন দোষ নেই। এতে তোমারও কোন দোষ নেই। শুধু অপরের এক দোষে আমরা জড়িয়ে পড়লাম এই ঘটনায়।

মাঝখানে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, এইসব কথা এক বালকের পক্ষে শোনা উচিত নয়। ডেভিড, শুতে যাও।

সব কিছু দেখে শুনে চোখের জলে সব কিছু ঝাপসা দেখছিলাম আমি তখন। দরজা খুঁজে পাচ্ছিলাম না বাইরে যাবার জন্য। যাইহোক, পেগটির কাছে বাতি নেবার সুযোগ না পেয়ে অন্ধকারে শুতে চলে গেলাম। ঘন্টাখানেক পর পেগটি এসে আমাকে জাগিয়ে বলল, আমার মা শুতে চলে গেছেন, মার্ডস্টোনরা দুই ভাইবোনে বসে আছে সেইখানে।

পরদিন সকালে আমি দেখলাম মা মিস মার্ডস্টোনের কাছে গতকালের ঘটনার জন্য ক্ষমাভিক্ষা করছেন। মিস মার্ডস্টোন সে ক্ষমা দান করলেন। তারপর থেকে আমার মা মিস মার্ডস্টোনকে জিজ্ঞাসা না করে বা তাঁর অনুমতি না নিয়ে কোন কাজ করতেন না।

আমি দেখলাম যে কঠোরতা, যে দৃঢ়তাকে ভিত্তি করে মিস্টার ও মিস মার্ডস্টোনের চরিত্রদুটো দাঁড়িয়েছিল, সে কঠোরতা, সে দৃঢ়তা অত্যাচারের সামিল। সেটা হচ্ছে শয়তানি এবং আসলে তাঁরা দুজনেই ছিলেন শয়তান। আসলে ওদের ভাইবোনের দুজনের গায়ের রং কালো ছিল। তাই ওদের জীবন ও জগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি, এমন কি ধর্মবোধও ছিল কৃষ্ণকুটিল।

ওঁরা প্রতি রবিবার আমাদের সঙ্গে চার্চে যেতো, কিন্তু ধর্মের প্রতি কোন শ্রদ্ধা ছিল না ওঁদের। যেতেন শুধু সামাজিক কর্তব্যের খাতিরে। প্রতি রবিবার আমি, আমার মা আর ওরা দুই ভাইবোন চার্চে যেতাম। পেগটি আগের মত আর আমাদের সঙ্গে যেত না। মিস মার্ডস্টোনের হাতে থাকত একটা প্রার্থনার বই। সেই বইটা নিয়ে যখন তখন খোঁচা দিতেন আমায়।

আমাকে বোর্ডিং হাউসে পাঠাবার কথা হচ্ছিল। মিঃ মার্ডস্টোন আর তাঁর বোন দুজনে উঠে

www.banglainternet.com

পড়ে লেগেছিলেন এজন্য। আমার মা বাধ্য হয়ে তাঁদের মতে সায় দিয়েছিলেন। তাঁর কিছু করার ছিল না। তবু যে কোন কারণেই হোক আমাকে পাঠানো হয়নি। তবে আমার পড়াশুনো মোটেই ভাল হচ্ছিল না সেটা আমি খুব ভালই বুঝতে পারছিলাম। মার্ডস্টোনরা আসার আগে আমি মার কাছেই পড়তাম। তাঁর কাছে বর্ণমালা শিখি। ছোটদের বই, ইতিহাস, ভূগোল, অঙ্ক—সবই কিছু কিছু করে বেশ শিখছিলাম।

কিন্তু মার্ডস্টোনরা আসার পর থেকে আমার পড়ার ব্যাপারটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। রোজ সকালে প্রাতরাশের পর আমি মার কাছেই পড়তে বসতাম। মাই আমাকে পড়াতেন। কিন্তু সে ব্যাপারে মার কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তাতে আসল আধিপত্য ছিল মার্ডস্টোন এবং তাঁর বোনের। যখন মা আমাকে পড়াতে বসত তখন ওঁরা দুজনে ঘুমিয়ে উঠে ওৎপেতে বসে থাকতেন, যেন দুটো ভয়ঙ্কর বিষধর সাপ একটা অসহায় পাখির ছানাকে গ্রাস করার জন্য ফনা উঁচিয়ে আছে। ওঁরা দুজনে মার কাছে বসে মাকে দৃঢ়তার শিক্ষা দিতেন। আমার ভুল ধরার জন্য সতত সজাগ হয়ে থাকতেন। আমি পড়াতে ভুল করে বসলেই ওঁদের মধ্যে কেউ না কেউ মাকে দৃঢ় হতে, আরো কড়া হতে বলতেন।

মার্ডস্টোনদের এই হৃদয়হীন উপস্থিতি আমার সেই শিশুমনে এমন এক অশুভ প্রভাব বিস্তার করেছিল যাতে তাঁদের উপস্থিতিতে আমি কোন পড়াই মনে রাখতে পারতাম না। কোন পড়াই আমার মাথায় ঢুকত না।

এইভাবে ছটা মাস কেটে গেল। মিঃ মার্ডস্টোন দিনের পর দিন এটা লক্ষ্য করে যাচ্ছিলেন যে মার কাছে পড়ার সময় আমি রোজই পড়া ভুলে যাচ্ছি। অথচ তাঁদের উপস্থিতিই যে আমার সব ভুলের একমাত্র কারণ সেটা তাঁরা বুঝলেন না। আমার মারও সেকথা তাঁদেরকে বলার ক্ষমতা ছিল না। তাঁরা শুধু আমাকে শেষ করে দিতে লাগলেন।

একদিন সকালে আমি বই খাতা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই দেখি মার পরিবর্তে মিঃ মার্ডস্টোন একটা বেত হাতে দাঁড়িয়ে আছেন।

মাঝে মাঝে আমার সামনে বেতটাকে শূন্যে সঞ্চালিত করে দেখাচ্ছেন। সহসা মার্ডস্টোন আমার একটা হাত ধরে আমাকে আমার উপরতলায় শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমার মা পিছন পিছন ছুটে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিস মার্ডস্টোন মাকে বাধা দিয়ে আটকে রাখলেন।

মিঃ মার্ডস্টোনের অগ্নিমূর্তি দেখে আমি দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমি কাতরকণ্ঠে অনুনয়-বিনয় করে বলতে লাগলাম, আমাকে মারবেন না স্যার। আমি পড়া মনে রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু আপনি ও মিস মার্ডস্টোন উপস্থিত থাকার জন্য সব ভুলে যাই।

ভুলে যাই, মজা দেখাচ্ছি। এই বলে তিনি আমার মাথাটা একহাতে ধরে অন্য হাতে বেতটা তুললেন। মনে হলো আমাকে যেন মেরেফেলবেন। আমি তাই মরীয়া হয়ে যে হাতে আমার মাথাটা ধরেছিলেন সেই হাতটা ধরে সজোরে কামড়ে দিলাম। আর তারপরই শুরু হলো বেত্রাঘাত। অসহ্য বেতের ঘায়ে ক্ষত বিক্ষত হয়ে উঠল আমার দেহটা। আমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে গেলাম। আমি যতদূর সম্ভব গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলাম। বুঝলাম, ঘরের বাইরে মা ও পেগটি ছোটাছুটি করছে। কিন্তু আমার সাহায্যে কেউ এগিয়ে আসতে পারল না কারণ

মার্ডস্টোন ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

অবশেষে মারতে মারতে যেন ক্লান্ত হয়েই আমাকে ছেড়ে দিয়ে ঘর থেকে চলে গেলেন তিনি। আমার দরজায় তালা দিয়ে গেলেন বাইরে থেকে।

আমি ঘরের মেঝের উপর অনেকক্ষণ পড়ে রইলাম। পরে আমি আয়নায় দেখলাম, আমার মুখটা লাল হয়ে ফুলে উঠেছে। আর সারা গায়ে বেতের দাগগুলো কালসিটে পড়ে গেছে। সারা দেহ ক্ষতবিক্ষত। আমি বাইরের কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার রাগ পড়লে বুঝতে পারলাম আমি মার্ডস্টোনকে কামড়ে দিয়ে খুব অন্যায় কাজ করে ফেলেছি। তার শাস্তি স্বরূপ আমাকে এই অন্ধকার কারাগারে আটকে রাখা হয়েছে। আমি জানি না আমাকে নিয়ে কি করা হবে! আমার ভয় হচ্ছিল আমাকে পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া হতে পারে এবং এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে হয়ত আমার ফাঁসি হতে পারে।

ঘরখানা অন্ধকার হলেও জানালা খোলা ছিল। দিন কেটে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসতে আমি জানালাটা বন্ধ করে দিলাম। সন্ধ্যার পর ঘরের চাবি খুলে মিস মার্ডস্টোন এসে আমাকে কিছু রুটি, মাংস আর দুধ দিয়ে গেলেন। কোন কথা বললেন না। নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিলেন। আমি খাওয়ার পর বিছানায় শুতে চলে গেলাম।

পরদিন সকালে আমি বিছানা থেকে ওঠার আগেই মিস মার্ডস্টোন ঘরে এসে আমাকে বললেন, আমি আধঘন্টা বাগানে বেড়াতে পারি, তার বেশী নয়। আমি তাঁর কথামত বাগানে গিয়ে আধঘন্টা বেড়ালাম। কিন্তু একমাত্র মিস মার্ডস্টোন ছাড়া আর কাউকে দেখতে পেলাম না।

এইভাবে পাঁচদিন আমি আমারই ঘরের কারাগারে আবদ্ধ ছিলাম। শুধু সকালে একবার বাগানে বেড়াতাম আর সন্ধ্যায় প্রার্থনার সময় মিস মার্ডস্টোন আমাকে সঙ্গে করে বসার ঘরে নিয়ে যেতেন। সেখানে কারো সঙ্গে আমি কথা বলতে পারতাম না। আমার মা সব সময় মুখ ঘুরিয়ে থাকতেন।

যেদিন পাঁচদিন গত হয়, সেদিন রাত্রিতে পেগটি আমার অন্ধকার ঘরের দরজার ফুটো দিয়ে আমাকে অনুচ্চ স্বরে ডেকে আমাকে জানাল আমাকে কালই লণ্ডনের কাছে এক স্কুলবোর্ডিং এ পাঠানো হবে। আমার সেই চরম দুঃসময়ে পেগটির দয়া ও সহানুভূতির কথা কখনো ভুলব না। সে বলল, আমি তোমাকে কোনদিন ভুলব না ডেভি। আমি তোমার মার প্রতি যত্ন নেব।

আমি পেগটিকে বললাম, তোমার বাড়িতে একটা চিঠি দিয়ে তাদের সবাইকে বিশেষ করে এমিলিকে আমার ভালবাসা জানাবে। তারা যেন আমাকে ভুল না বোঝে।

পরদিন সকালে মিস মার্ডস্টোন এসে আমার ড্রয়ার থেকে আমার যত পোশাক আশাক নিয়ে গেলেন। আমাকে প্রাতরাশের জন্য বসার ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে আমি মাকে দেখতে পেলাম। দেখলাম তার মুখখানা বিবর্ণ, চোখদুটো লাল। আমি তাঁর কোলের কাছে ছুটে গিয়ে ক্ষমা চাইলাম। তিনি বললেন, ওঃ ডেভি, আমার কোন লোককে এমনভাবে আঘাত করতে পার আমি তা ভাবতে পারিনি। যাই হোক, ভাল হওয়ার চেষ্টা করবে। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে। আমি খুবই দুঃখিত ডেভি। তোমার মনে এত হিংসা আছে জানতাম না।

বুঝলাম, আমি বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার জন্য যত না, তাঁর থেকে বেশী দুঃখিত তিনি আমার

www.banglainternet.com

অপরাধের জন্য। কারণ আমার শেষের অপরাধটাই তাকে বড় করে বোঝানো হয়েছে।

গেটের সামনে গাড়ি এসে গেলে মিস মার্ডস্টোন এসে বললেন, এই তোমার বাক্স।

আমার মা আমাকে বিদায় দিয়ে বললেন, তোমার ভালর জন্যই তোমাকে স্কুলে পাঠানো হচ্ছে। ছুটির সময় তুমি বাড়ি আসতে পারবে। বিদায় ডেভি।

আমার মা যতবার আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন ততবারই মিস মার্ডস্টোন 'ক্ল্যারা' বলে হাঁক দিয়ে তাঁকে সতর্ক করে দিচ্ছিলেন যাতে তিনি আমার প্রতি কোন দুর্বলতা প্রকাশ না করে ফেলেন। মিঃ মার্ডস্টোনকে যাবার সময় দেখতে পেলাম। মা বসার ঘরের দরজা থেকেই বিদায় জানালেন। মিস মার্ডস্টোনই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে বললেন, আমি যেন আমার কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করি।

৬

গাড়িটা আধ মাইল যেতে না যেতেই চোখের জলে আমার গোটা রুমালটা ভিজে গেল। হঠাৎ গাড়িটা থেমে গেল এবং পথের ধারের একটা ঝোপ থেকে আমাদের পেগটি বেরিয়ে এল। পেগটি গাড়িতে উঠেই আমাকে খুব জোরে বুকের উপর চেপে ধরল। তার চোখে ছিল জল। পেগটি কোন কথা বলল না। শুধু নীরবে এক নিবিড় আলিঙ্গনের মধ্যে তার সব স্নেহ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে সে আমার হাতে সাতটি শিলিঙের একটা থলে দিল। আর একটি কাগজে মোড়া দুটি সোনার মুদ্রাও দিল। কাগজটার উপরে লেখা, 'ভালবাসার সঙ্গে তোমার মা।'

এটা পেয়ে আমি খুবই আনন্দ পেলাম। পেগটি গাড়ি থেকে নেমে গেলে আমার রাগটা আবার বেড়ে গেল।

ইয়ারমাউথে গাড়ি পাল্টে গন্তব্যের পথে রওনা হলাম।

অবশেষে দূর থেকে লণ্ডন শহরটা দেখে সেদিন আমি সত্যিই আশ্চর্য বোধ করেছিলাম। সেই লণ্ডন শহরেরই একটা অঞ্চলের মধ্যে ছিল আমার স্কুলটা।

গাড়িটা যেখানে থামল, সেখানে আমাকে আমার গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবার জন্য কেউ এল না। আমি সাফোকের ব্লান্ডারস্টোন থেকে আসা এক বালক হিসাবে নিজের পরিচয় দিয়ে হাঁক দিলাম। কিন্তু কেউ এগিয়ে এল না আমার কাছে। অবশেষে মিঃ মেল নামে একজন ভদ্রলোক এসে আমাকে স্কুলে নিয়ে গেলেন। তিনি ঐ স্কুলেরই একজন মাস্টার।

স্কুলটার নাম স্যালেম হাউস। সামনেই এই নাম লেখা একটা বোর্ড লাগানো আছে। স্কুল ঘরের চারদিকে ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা একটা লম্বা ঘর। বাড়িটা পুরনো। ঘরের মেঝেটা ধুলোয় ভর্তি। ঘরের মধ্যে ডেস্কের তিনটে করে সারি, ছয়টা ভাগ আছে। স্কুলে তখন কোন ছেলে ছিল না। সেকথা জিজ্ঞাসা করতে মিঃ মেল বললেন, এখন ছুটি চলছে। তোমাকে শাস্তি দেবার জন্যই ছুটির সময় স্কুল বোর্ডিংএ পাঠানো হয়েছে।

পরে আমাকে স্কুলের হেডমাস্টার মিঃ ক্রিকল্ এর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো। একজন গোমরামুখো মোটাসোটা চেহারার একটা কাঠের পাওয়ালা লোক দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল।

লোকটার ঘাড়টা ষাঁড়ের মত আর তার মাথার চুলগুলো খুব ছোট করে ছাঁটা। মিঃ ক্রিকল্ তখন তাঁর ঘরে ছিলেন।

এদিকে মিঃ মেল একটা প্ল্যাকার্ড আমার পিঠে গলার সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে দিলেন। তাতে লেখা ছিল, কুকুর হতে সাবধান, সে কামড়ায়। মিঃ মেল বললেন, এই প্ল্যাকার্ডটা তোমাকে সব সময় বয়ে বেড়াতে হবে। আমি আর কি করব? এইমত নির্দেশ আছে এবং সে নির্দেশ মেনে চলতে হবে আমাকে।

আমি বুঝলাম আমি মার্ডস্টোনের হাত কামড়ে দিয়েছিলাম। তাই তার নির্দেশেই আমার জন্য এই জঘন্য শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এইভাবে তিনি আমার উপর প্রতিশোধ নিচ্ছেন।

স্কুল চলতে থাকলে ছেলেরা এর জন্য নিদারুণ ভাবে উপহাস করত। তাদের মধ্যে দুজনের আচরণ ছিল বেশী ভয়াবহ। তাদের মধ্যে একজন হলো স্টীয়ারফোর্থ—আমাকে দেখলেই কুকুর বলে জোরে চিৎকার করত এবং প্ল্যাকার্ডের লেখাটা জোর গলায় পড়ে শোনাত। আমার মাথার চুল ধরে টানত। আর একজনের নাম টমি ট্র্যাড্‌লস্। সেও আমাকে নিয়ে মজা করত। সে আমার কাছে এলেই কামড়ানোর কৃত্রিম ভয়ে শিউরে উঠে বলত, ওরে বাপ্‌রে কুকুর কামড়াবে।

এইসব দুর্ভোগ থাকুক আর যাই হোক, আমার পড়াশুনোর কাজে গলদ হচ্ছিল না। মিঃ মেল আমাকে পড়াতেন। তাঁর সব পড়া আমি তৈরি করে ফেলতাম। তাঁর দেওয়া সব কাজও আমি করে ফেলতাম। কারণ আমি যখন তাঁর কাছে পড়তাম তখন সেখানে মিঃ মার্ডস্টোন ও তাঁর বোন থাকতেন না। তাছাড়া মিঃ মেল শিক্ষক হিসাবে বেশ সহানুভূতিশীলই ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে বাঁশি বাজাতেন। তিনি ভাল করে বাজাতে পারতেন না অবশ্য। তবু আমি এটা বুঝতে পারতাম যে, সেই সুরের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন বেদনার ভাব ছিল।

৭

একমাস ধরে আমার জীবনযাপন ঠিক এইভাবেই চলল। একদিন মিঃ মেল আমাকে জানালেন যে সেদিন সন্ধ্যায় মিঃ ক্রীকল্ আসছেন। সন্ধ্যায় চা পানের সময়ে আমি শুনলাম তিনি এসে গেছেন। বিছানায় শুতে যাবার আগে সেই কাঠের পাওয়ালা গোমরামুখো মোটা লোকটা এসে আমায় তাঁর সামনে নিয়ে গেল।

স্কুলবাড়ির যে অংশটাতে মিঃ ক্রীকল্ সপরিবারে থাকতেন সে অংশটা অনেক ভাল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও আরামদায়ক। তাঁর বাসার সামনে ছিল একটুকরো বাগান। মিঃ ক্রীকলের চেহারাটা বেশ মোটাসোটা। তিনি তাঁর বসার ঘরে একটা আর্মচেয়ারে বসে ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল চেনওয়ালা একটা ঘড়ি। পাশে ছিল একটা বোতল আর একটা গামলা। সেই ঘরে তখন তাঁর স্ত্রী মিসেস ক্রীকল্ ও মেয়ে মিস ক্রীকল্ ছিলেন। যখন আমি তাঁর সামনে গেলাম তখন আমি এত লজ্জা পাচ্ছিলাম যে আমি তাঁর স্ত্রী বা মেয়ের দিকে না তাকিয়ে শুধু মিঃ ক্রীকল্‌কেই দেখছিলাম। আমি লজ্জায় কাঁপতে লাগলাম।

মিঃ ক্রীকল্ প্রথমে আমাকে ঘুরে দাঁড়াতে বলে আমার পিঠের প্ল্যাকার্ডটা দেখলেন। তারপর

বললেন, এই সেই ছেলেটি—যার দাঁতগুলো ভোঁতা করে দিতে হবে।

মিঃ ক্রীকল্-এর মুখখানা লাল, চোখগুলো ছোট ছোট। মাথার উপর একটুখানি টাক্। বাকি চুলগুলো পাতলা আর ভিজে ভিজে। সেগুলো দুদিকে ভাগ করে আঁচড়ানো ছিল। মাঝখানে সিঁথি। তাঁর মুখখানা দেখে সব সময় রাগী বলে মনে হত। তার উপর যখন কথা বলতেন তাঁর গলাটা খুব ক্ষীণ এবং জোরে বলতে না পারার জন্য তাঁর মুখখানা আরো লাল হয়ে উঠত এবং আরো রাগী দেখাত। তাঁর নাকটা ছিল ছোট আর চিবুকটা বড়। তাঁর গলার স্বরটা এত ক্ষীণ ছিল যে বোঝাই যেত না। তাই তাঁর প্রতিটি কথার পুনরাবৃত্তি করে শোনাত কাঠের পাওয়ালা সেই লোকটা—যার গলার স্বরটা ছিল বেশ জোরালই।

মিঃ ক্রীকল্ এবার আমার কানটা ধরে বললেন, তোমার সৎ পিতাকে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তিনি যোগ্য লোক, দৃঢ় চরিত্রের মানুষ। তিনি আমাকে জানেন এবং আমিও তাঁকে জানি। তুমি কি আমাকে চেন?

আমি বললাম, না স্যার।

মিঃ ক্রীকল্ আমার কানটায় মোচড় দিয়ে বললেন, খুব শীগ্‌গিরই চিনবে।

কাঠের পাওয়ালা লোকটা তাঁর সব কথা আর একবার করে জোর গলায় বলে দোভাষীর কাজ করছিল।

কানটায় আমি ব্যথা অনুভব করছিলাম এবং আমার চোখে জল এসেছিল। মিঃ ক্রীকল্ আমায় বললেন, আমি কে তা তোমায় চিনিয়ে দেব। আমি হচ্ছি দৃঢ় সংকল্পের লোক। যখন বলি আমি কোন কিছু করব, তখন জানবে আমি সেটা করবই।

তারপর তাঁর আরদালিকে হুকুম দিলেন, ওকে নিয়ে যাও এখান থেকে। ও আমাকে ঠিক চিনবে।

এই বলে তিনি তাঁর স্ত্রী ও মেয়ের দিকে তাকালেন। মিসেস ক্রীকল্ ও মিস ক্রীকল্ হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন বলে মনে হলো। তাঁদের দুজনেরই চেহারাগুলো ছিল রোগা রোগা। তাঁদের মধ্যে দয়ামায়া ছিল এবং আমার উপর এই অযথা পীড়নটাকে তাঁরা ভাল চোখে দেখছিলেন না।

চলে যাবার আদেশ পেয়ে আমি স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লাম। কিন্তু কি মনে হতে আমি যেতে গিয়ে হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে কাতর নিবেদন জানিয়ে বললাম, স্কুলে ছেলেরা ফিরে আসার আগে যদি দয়া করে এই প্ল্যাকার্ডটা উপর থেকে সরিয়ে নেবার আদেশ দেন স্যার—

আমার কথাটা শেষ হতে না হতেই আবার রাগে ফেটে পড়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন মিঃ ক্রীকল্। আমি ভয়ে আর না দাঁড়িয়ে সেই কাঠের পাওয়ালা আরদালি লোকটার সাহায্য ছাড়াই ছুটে সোজা আমার ঘরে চলে গেলাম। পিছন ফিরে একবার দেখলাম কেউ আমাকে ধরতে আসছে কি না। দেখলাম কেউ আসেনি। তখন আমি বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। তখনো আমি ভয়ে কাঁপছিলাম। কয়েক ঘন্টা ধরে সে কাঁপুনি আমার গেল না। আমার ঘুম হল না।

পরদিন সকালে মিঃ শার্প নামে একজন শিক্ষক ফিরে এলেন।

ছুটি শেষ হতে কয়েকদিন স্কুল চলতে থাকার পর একদিন প্রথম যে ছেলেটি স্কুলে এল, সে হলো টমি ট্র্যাড্‌লস্। সে প্রথম আসায় আমার পক্ষে ভালই হলো। ট্রাড্‌লস্ প্রথমে আমার

ও আমার পরিবারের সব জানতে চাইল। আমার সব কথা শুনে সে নরম হলো, সদয় হলো আমার প্রতি। সে আমার পিঠে প্ল্যাকার্ড দেখে তা নিয়ে আর কোন হৈচৈ বা বিদ্রূপ করল না। তারপর অন্যান্য সব ছেলেরা একে একে এলে ট্র্যাড্‌লস্ আমাকে নিয়ে তাদের কাছে গিয়ে বলল, দেখ, এটা হচ্ছে এক মজার খেলা। তখন সব ছেলেরা আমাকে নিয়ে খুব বেশী বাড়াবাড়ি করল না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে শুধু বলল, টাউজার, এখানে শুয়ে পড় স্যার। শান্ত হয়ে থাক।

যাই হোক আমি যা ভেবে দারুণ ভয়ে ভয়ে ছিলাম তা হলো না। ট্র্যাড্‌লস্ আমাকে একটা বড় রকমের বিষাদ থেকে বাঁচাল। আমি ভেবেছিলাম, ছেলেরা আমার প্ল্যাকার্ড দেখে প্রতিদিন আমাকে কুকুর বলে ভয়ঙ্করভাবে বিদ্রূপ করে লজ্জায় ফেলবে এবং দুঃখে ও যন্ত্রণায় আমার প্রাণান্তকর অবস্থা হবে। কিন্তু সে সব আর কিছু হলো না।

এর পর এল আমার থেকে বয়সে অনেক বড় জে. স্টীয়ারফোর্থ নামে একটি ছেলে। ছেলেটি দেখতে খুবই ভাল ছিল এবং মেধাবী ছাত্র হিসাবে তার খ্যাতিও ছিল। তাকে স্কুলের সব ছেলেরা খুব মানত। অন্যদিনকার মতো সেদিনও স্টীয়ারফোর্থ স্কুলে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ছেলেরা আমাকে ধরে নিয়ে গেল। বিচারকর্তার কাছে যেমন আসামী বা অপরাধীকে ধরে নিয়ে যায় ! সে জায়গাটা ছিল খেলার মাঠের একধারে।

আমি আমার সব কথা তাকে বলতে চাইলে স্টীয়ারফোর্থ আমাকে এই শাস্তি দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করল। সব কিছু শুনে সে বলল, এটা একটা মজার ব্যাপার।

এমনি করে স্টীয়ারফোর্থও ব্যাপারটাকে সহজভাবে নিল। এজন্য আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ।

একদিন স্টীয়ারফোর্থ আমাকে বলল, তোমার কাছে কত টাকা আছে কপারফিল্ড ?

আমি বললাম, সাত শিলিং।

সে বলল, যদি তুমি চাও তো ওটা আমাকে দিতে পার।

তাকে আমার অদেয় কিছু ছিল না। সত্যিই স্টীয়ারফোর্থ আমার মন জয় করে নিয়েছিল একদিনের মধ্যে। পেগটি যে টাকার থলেটা আমার হাতে দিয়েছিল সেটা খুলে আমি সাত শিলিং বার করে দিলাম। শুধু মার হাতের লেখা কাগজটা যত্ন করে রেখে দিলাম।

আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে বাইরে থেকে কিছু খাবার নিয়ে এল স্টীয়ারফোর্থ। সেটা আমরা কয়েকজনে মিলে আমাদের ঘরে বসে খেলাম। স্টীয়ারফোর্থ আমার ঘরেই থাকত।

খাওয়ার পর নীচু গলায় ফিস্ ফিস্ করে গল্প করতে লাগলাম আমরা। ঘরখানা ছিল অন্ধকার। জানালা দিয়ে চাঁদের আলো এসে পড়েছিল ঘরের মধ্যে। আমি স্টীয়ারফোর্থের কথাগুলো বিশেষ মনোযোগ ও ভালোলাগার সঙ্গে শুনতে লাগলাম। স্টীয়ারফোর্থ ও উপস্থিত ছেলেদের মুখে স্কুল ও স্কুলের মাস্টারদের সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারলাম, ঘরের অন্ধকার, ফিস্ ফিস্ করে কথা বলা, কথাবার্তার গোপনীয়তা—সব মিলিয়ে একটা রহস্যময় অনুভূতি আচ্ছন্ন করে ফেলল আমার মনটাকে। এক সময় ট্র্যাড্‌লস্ ঘরের কোণে ভূত দেখার ভান করলে আমি হাসবার চেষ্টা করলাম।

আমি জানতে পারলাম মিঃ ক্রীকলের নিজেকে তার্তার বলার কারণ আছে। তিনি বেত মারা

আর শাসন ছাড়া আর কিছুই জানেন না। আমি শুনলাম মিঃ ক্রীকল্ পড়াশুনার কিছুই জানেন না, স্কুলের সবচেয়ে নীচু ক্লাসের ছেলের যে জ্ঞান আছে, তাও তাঁর নেই। আসলে আগে তিনি ব্যবসা করতেন, সাথী গোবরামুখা ওই মোটা লোকটা ছিল তাঁর সহকারী। সেই কারবার করতে গিয়ে স্ত্রীর টাকা নয়ছয় করে এখন ব্যবসা গুটিয়ে স্কুলের ব্যবসা করছেন। পড়াশুনোর উন্নতিটা এখানে কোন কথা নয়। স্কুলটা তাঁর একটা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, টাকা রোজগারই তাঁর ধান্দা।

মিঃ ক্রীকল্-এর একটা ছেলে ছিল। সে বড় হয়ে তার বাবার স্কুলের কাজকর্ম দেখাশোনা করত। কিন্তু টাঙ্গের সঙ্গে তার মিল হত না। সে টাঙ্গের কাজকর্মের প্রতিবাদ করায় মিঃ ক্রীকল্ তাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। আর সে ফিরে আসেনি। সেই থেকে মিসেস ক্রীকল্ ও মিস ক্রীকল্ অর্থাৎ তার মা ও বোন সব সময় মনমরা ও বিষাদগ্রস্ত হয়ে থাকেন।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে, মিঃ ক্রীকল্ স্টীয়ারফোর্থ-এর উপর কখনো হাত তুলতে সাহস পান না। একটা প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, তার গায়ে হাত দিলে সে একটা ঘুঁষিতে তাঁকে ফেলে দেবে। দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বেলে সে এই কথাটা বলল।

আরও জানলাম, মিঃ মেল মানুষ হিসাবে খারাপ নন। তবে বড় গরীব। পকেট-এ তাঁর দুটো পেনিও নেই। বাড়িতে বুড়ী মা ছাড়া আর কেউ নেই তাঁর।

এইভাবে কথাবার্তা বলার পর ছেলেরা সব যে যার ঘরে চলে গেল। স্টীয়ারফোর্থ এবং আমিও শুয়ে পড়লাম।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, শুভরাত্রি, ছোট্ট কপারফিল্ড। কোন চিন্তা নেই। আমি তোমার দেখাশোনা করব যত্নসহকারে। কেউ তোমার কিছু করতে পারবে না।

আমি বললাম, তোমার খুব দয়া। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

তারপর সে বলল, আচ্ছা, তোমার কোন বোন নেই?

আমি বললাম, না।

সে বলল, থাকলে খুব ভাল হত। সে হত সুন্দর একটা ছোট্ট মেয়ে, চোখগুলো বেশ উজ্জ্বল। আমি তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হতাম।

এর পর আমি তাকে 'শুভরাত্রি' জানিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

৮

পরদিন থেকে স্কুল ভালভাবে শুরু হলো। মিঃ ক্রীকল্ বেত হাতে ঘরের দরজার কাছে দাঁড়াতেই ছাত্রদের যত গুঞ্জন স্তব্ধ হয়ে গেল মুহূর্তে। তিনি সবাইকে ভাল করে পড়াশুনো করার নির্দেশ দিয়ে এবং শাস্তির কথা মনে করিয়ে দিয়ে আমার কাছে চলে এলেন। তাঁর কোন কথা শুনতে পাওয়া যাচ্ছিল না। শুধু তাঁর মুখটাকে নড়তে দেখা গেল। টাঙ্গে তাঁর সব কথা জোর গলায় পুনরাবৃত্তি করে শোনাল।

মিঃ ক্রীকল্ বেত হাতে আমার কাছে এসে বললেন যে আমার যেমন কামড়ানোর ব্যাধি আছে, তেমনি তাঁরও কামড়ানোর খ্যাতি আছে। আমার যেমন দাঁত আছে, তেমনি তাঁরও দাঁত

আছে। তিনি তাঁর বেতটা দেখিয়ে বললেন, এই বেতটাই তাঁর দাঁত।

এরপর তিনি বললেন, এটা কেমন দাঁত বাছা? এ দাঁতটা কেমন কামড়ায় বাছা? এ দাঁত শরীরে বসে গিয়ে কেমন ক্ষত করে বাছা?

প্রতি প্রশ্নের সঙ্গে এক ঘা করে বেত মেরে মেরে আমার শরীরে ক্ষত করে দিলেন ক্রীকল্। প্রতিটি বেতের ঘায়ে আর তার যন্ত্রণায় শরীরটা মুচড়ে উঠতে লাগল। আমার চোখে জল এল।

স্যালেম হাউসের এই ভয়ঙ্কর কারাবাস থেকে কবে মুক্তি পাব,আমি সেই কথাই ভাবতে লাগলাম।

ছেলেদের মধ্যে ট্রাড্‌লস্ মার খেত সবচেয়ে বেশী। কারণ সে ছিল একটু বেশী দুরন্ত। পড়াশুনোয় তার মন ছিল না। সে শুধু তার ডেস্কে বসে তার স্লেটের উপর কঙ্কাল আঁকত। তা দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যেতাম। কঙ্কাল এঁকে যে কি আনন্দ সে পেত তা কে জানে! কঙ্কালের ছবি এঁকে মাঝে মাঝে আমার মত হেসে উঠত সে। মৃত্যু আর মরণশীলতার প্রতীক কঙ্কাল এঁকে হয়ত এই ভেবে একটা সূক্ষ্ম আনন্দ পেত সে—মৃত্যুই যেমন জীবনের শেষ, যেমন সব কিছুরই শেষ আছে, তেমনি তো আমারও এই কষ্টের শেষ হবে একদিন।

আমরা যখন যেতাম, মাঠে থাকতাম, তখনও আমাদের চোখ থাকত মিঃ ক্রীকল্-এর দিকে।

আমরা যখন চার্চে যেতাম, তখন স্টীয়ারফোর্থ সাদা পায়জামা পরে মিস ক্রীকল্-এর হাত ধরে আমাদের আগে আগে যেত। এই দৃশ্যটা দেখতে আমার খুব ভাল লাগত। মিস ক্রীকল্ দেখতে এমিলির মত অতটা সুন্দর ছিল না। কিন্তু সে ছিল বয়সে আরও বড় আর তার চেহারার মধ্যে একটা গাম্ভীর্য ও মর্যাদাবোধ ছিল। মিস ক্রীকল্ স্টিয়ারফোর্থকে ভালবাসত এবং সে ভালবাসার মধ্যে একটা শ্রদ্ধার ভাবও ছিল।

স্টীয়ারফোর্থ তার কথা রেখেছিল। সে সব সময় অন্য সব ছেলেদের বেয়াদপির হাত থেকে আমাকে রক্ষা করত কিন্তু একমাত্র ক্রীকল্ ছাড়া। আমার উপর ক্রীকল্-এর রাগটা ছিল সবচেয়ে বেশী। আমার প্রতি তাঁর ব্যবহারের ধারাটা ছিল খুবই নির্দয়। কিন্তু এ বিষয়ে স্টীয়ারফোর্থের কিছু করার ছিল না। আমি বেশ বুঝতে পারতাম, ক্রীকল্ মার্ডস্টোনের বন্ধু ছিল বলে মার্ডস্টোনের নির্দেশেই ক্রীকল্ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে আমার উপর।

একদিনের একটা আকস্মিক ঘটনা আরো দৃঢ় করে তোলে স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে আমার সম্পর্কটাকে। একদিন খেলার মাঠে স্টীয়ারফোর্থ আমার সঙ্গে কথা বলছিল। সকলের সামনে আমার সঙ্গে সে ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলায় আমি বেশ গর্ববোধ করছিলাম। স্টীয়ারফোর্থ আমাকে বলছিল একটা বইয়ের কথা। বইটার নাম বেবিগ্রীন পিকন্। আমি বললাম, পড়েছি, কিন্তু আমার মনে নেই।

রাত্রিতে শুয়ে স্টীয়ারফোর্থ অন্যান্য বইয়ের কথা বলতে আমি তাকে বললাম, আমি আরও কিছু বই পড়েছি।

স্টীয়ারফোর্থ তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করল, সেই সব বইয়ের কথা তোমার মনে আছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ আছে। আমার স্মৃতিশক্তি ভাল।

ও বলল, রাত্রিতে আমার ঘুম আসতে দেরি হয়। আবার আমি খুব সকালেই উঠি। তুমি

রোজ রাত্রিতে একটা করে বইয়ের গল্প বলবে। আমি শুনব। ঐ সব বইয়ের গল্প শুনতে আমার ভাল লাগে।

সেদিন থেকে রাত্রিতে শোবার আগে অন্ধকার ঘরে এক একটা বই থেকে গল্প বলতাম আমি, আর স্টীয়ারফোর্থ তা মন দিয়ে শুনত। কত আশ্চর্যজনক ঘটনা, কত কাহিনী, কত দস্যুদের কথা—আমি আমার স্মৃতি থেকে যতদূর সম্ভব গুছিয়ে বলতাম। বর্ননা হয়ত ঠিক হত না সব সময়। তা হোক, তবু স্টীয়ারফোর্থের তা ভাল লাগত।

একদিন সকালের দিকে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। দিনটা ছিল শনিবার। অর্ধেক স্কুল হওয়ার দিন। সেদিন অসুস্থতার জন্য মিঃ ক্রীকল্ স্কুলে আসেননি, বাসাতেই আছেন।

সুযোগ বুঝে স্কুলের সব ছেলেরা দারুণ হৈ চৈ ও গোলমাল করতে থাকে। ক্লাসের মধ্যে ছেলেদের কেউ কেউ নাচছিল, কেউ গান করছিল, কেউ কথা বলছিল, কেউ কেউ অকারণে চেঁচামিচি করছিল। সেদিন মিঃ শার্প স্কুলে আসেন নি। তিনি প্রতি শনিবার তাঁর পরচুল ঠিক করতে যেতেন। মিঃ মেল-এর উপর ছিল স্কুল দেখাশোনার সব ভার।

টাঙ্গে দু তিনবার এসে ছেলেদের চুপ করতে বলে গেছে। কয়েকজন ছেলের নাম টুকে নিয়ে গেছে শাস্তির ভয় দেখিয়ে। তবু কোন ফল হয়নি। গোলমাল থামাতে নারাজ ছেলেরা। ক্লাশের মধ্যে মিঃ মেল একটা ডেস্কের উপর দুটি হাতের উপর মাথাটা রেখে বিষণ্ন মুখে বসেছিলেন। ছেলেদের মধ্যে স্টীয়ারফোর্থ, ট্র্যাড্‌লস্ সবাই ছিল।

মিঃ মেল ছেলেদের চুপ করতে বলছিলেন বারবার। কেন জানি না স্টীয়ারফোর্থ মিঃ মেলকে দেখত পারত না। সুযোগ পেলেই যখন তখন তাঁকে অপমান করত।

সেদিন মিঃ মেল স্টীয়ারফোর্থকে চুপ করে বসতে বলতেই স্টীয়ারফোর্থ ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল, আপনি চুপ করুন।

মিঃ মেল সাধারণতঃ খুবই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ—কারো সঙ্গে কোন ঝগড়া-বিবাদ করেন না। কিন্তু সেদিন কি হলো, উনি স্টীয়ারফোর্থের উপর রেগে গেলেন। বললেন, তুমি একটা পাজী ছেলে, হীন ও নীচ প্রকৃতির।

স্টীয়ারফোর্থও বলল, আপনি তো একটা ভিখারি!

দুজনেই সামনা সামনি দাঁড়িয়ে। এইভাবে দুজনের মধ্যে যখন জোর বাদ-প্রতিবাদ চলছিল, তখন হঠাৎ মিঃ ক্রীকল্‌কে দরজার কাছে দেখে সব ছেলে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। সব গোলমাল গেল থেমে।

মিঃ মেল বেঞ্চের উপর বসে পড়লেন। মিঃ ক্রীকল্ মেলকে জিজ্ঞাসা করলেন কি হয়েছে তাঁর স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে। কিন্তু স্বাভাবিক ভীরুতাবশতঃ মিঃ মেল যেন তা বলতে পারছিলেন না। স্টীয়ারফোর্থ তখন সাহসের সঙ্গে বলল, আসল ব্যাপারটা আমি বলছি। উনি আমাকে হীন ও নীচ প্রকৃতির বলেছেন আর আমি ওঁকে ভিখারি বলেছি, যেটা আমার বলা উচিত না এবং আমি রেগে না গেলে হয়ত বলতামও না।

স্টীয়ারফোর্থের এই নৈতিক সাহস ও দৃপ্তভাব দেখে ক্রীকল্ তাকে বললেন, এই স্যালেম হাউসের একজন শিক্ষক ও আমার বেতনভোগী কর্মচারিকে তোমার একথা বলা উচিত হয়নি

স্টীয়ারফোর্থ।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, আসলে উনি ভিখারি নন, ওঁর মা লোকের দয়ার দানে বেঁচে আছেন একথা উনি অস্বীকার করতে পারেন?

মিঃ মেল তা অস্বীকার করলেন না, বরং আমতা আমতা করে ব্যাপারটা স্বীকার করে নিলেন। মিঃ ক্রীকল্ তখন মিঃ মেলকে বললেন, আপনার এ রকম অবস্থা, আপনি আমাকে বলেননি কেন? এটা আমাদের স্কুল স্যালেম হাউসের কলঙ্ক আর এই কলঙ্কের হাত থেকে আজ স্টীয়ারফোর্থ বাঁচাল স্যালেম হাউসকে।

মিঃ মেল-এর কাছে আমি দাঁড়িয়েছিলাম। আমার পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, ঠিক আছে মিঃ ক্রীকল্, আমি থাকাতে যদি আপনাদের স্কুলের সুনাম নষ্ট হয় তবে আমি চলে যাচ্ছি। আমি এই মুহূর্তে আপনার কাছে ও অন্য সকলের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি।

এই বলে মিঃ মেল তাঁর বাঁশিটি আর তাঁর কয়েকটি বই দেরাজ খুলে বার করে নিয়ে চাবিটি রেখে যাবার জন্য পা বাড়ালেন। তারপর স্টীয়ারফোর্থকে সম্বোধন করে বললেন, জেমস্ স্টীয়ারফোর্থ, আজ আমি তোমার প্রতি এই শুভেচ্ছা রেখে গেলাম যে তুমি আজ যা করেছ তার জন্য অবশ্যই একদিন লজ্জাবোধ করবে।

এই বলে চলে গেলেন মিঃ মেল।

আমার চোখে জল এসেছিল। কিন্তু সে জল আমি লুকিয়ে ফেললাম, স্টীয়ারফোর্থ আর ক্রীকল্-এর ভয়ে। আমার মত ট্র্যাড্‌লস্ এর চোখেও জল এসেছিল আর মিঃ ক্রীকল্ তা দেখতে পেয়ে একঘা বেত মারলেন তাকে। কারণ তাঁর মতে এই ঘটনায় চোখের জল না ফেলে তার হাসা উচিত ছিল!

সেদিন রাতে অন্ধকার ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে শুয়ে স্টীয়ারফোর্থকে যখন গল্প শোনাচ্ছিলাম, তখন আমি যেন মিঃ মেল-এর সেই বাঁশির সুর শুনতে পাচ্ছিলাম—যে সুর আমি এখানে প্রথম আসার দিন শুনেছিলাম। যেদিন গৃহপরিত্যক্ত অবস্থায় প্রথম এখানে এসেছিলাম. সেদিন আমার সেই অন্তহীন বিষাদ আর হতাশার অন্ধকারে এই সুরই আলোর ফুল হয়ে ফুটে উঠেছিল। সেদিন তাঁর কণ্ঠেই আমার প্রতি প্রথম সহানুভূতি ধ্বনিত হয়েছিল। সেদিন কেন জানি না ,এই শান্ত নিরীহ অনাসক্ত মানুষটিকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। তারপর আজ তাঁর নীরব নিঃশব্দ বিদায়ের এক অব্যক্ত বেদনায় আমার মনটা যেন টনটন করে উঠল। এ ব্যথা,এ বেদনা হয়ত কোনদিন ভুলতে পারব না আমি।

এর পর একদিন বিকালে টাঙ্গে এসে ঘোষণা করল, কপারফিল্ডের অতিথি এসেছে দেখা করার জন্য।

এই ঘোষণা শুনে মনটা আমার আনন্দে দুলে উঠল। আমি ভাবলাম হয়ত মা অথবা মিস্টার বা মিস মার্ডস্টোন। আমি আবেগের উচ্ছ্বাসে ছুটে গেলাম অতিথির সঙ্গে দেখা করার জন্য। দেখলাম মিঃ পেগটি আর হ্যাম ইয়ারমাউথ থেকে দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে!

তাদের দেখে সত্যিই আমি আনন্দ পেলাম। এমিলি ও মিসেস গামিজের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। পেগটি বলল, ভাল।

তারপর আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি আমার মার খবর জান? আমার মা, আমাদের পেগটি কেমন আছে?

মিঃ পেগটি বলল, খুব ভাল।

এর কিছুদিন আগে পেগটি আমায় একটি চিঠি পাঠিয়েছিল আর সেই চিঠির সঙ্গে ছিল কিছু কমলালেবু, কেক আর এক বোতল ভাল মদ। আমি সেগুলো স্টীয়ারফোর্থের হাতে দিয়ে বলেছিলাম, এগুলো সবাইকে ভাগ করে দাও।

স্টীয়ারফোর্থ বলেছিল, মদের বোতলটা তুমি রেখে দাও। রাত্রিতে গল্প বলতে বলতে যখন তোমার গলাটা শুকিয়ে যাবে, তখন এই মদ দিয়ে গলাটা একটু ভিজিয়ে নেবে।

মিঃ পেগটি ও হ্যামের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা বললাম। তারপর ওরা বিদায় নিয়ে চলে গেল। স্টীয়ারফোর্থ আমাদের কথাবার্তার সময় কাছেই ছিল।

পেগটি আমার জন্য কিছু মাছ এনেছিল। স্টীয়ারফোর্থ সেগুলো রান্না করার ব্যবস্থা করল। তা দিয়ে সে রাতে আমাদের নৈশভোজটা ভালই হলো। তবে দুঃখের বিষয় ট্র্যাড্‌লস্‌ সেদিন অসুস্থ থাকায় সে খেতে পেল না।

এইভাবে বছরের প্রথমার্ধের দিনগুলো কেটে যেতে লাগল। এর মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। রুটিন মাফিক চলেছে আমার দৈনন্দিন জীবন। আমি দীর্ঘ ছুটির অপেক্ষায় দিন গুনতে লাগলাম। ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার আশা করতে লাগলাম প্রতিনিয়ত। আসার সময় মা আমাকে এই কথাই বলেছিলেন। কিন্তু আবার আমার ভয় হতে লাগল যদি আমাকে বাড়ি পাঠানো না হয়, মার্ডস্টোন আবার যদি ক্রীকল্‌কে বলে আমার বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দেয়?

কিন্তু পরে দেখলাম আমার এই ভয়টা অমূলক। স্টীয়ারফোর্থ আমাকে একদিন জানাল, আমাকে বাড়ি পাঠানো হবে।

অবশেষে সেই বহু আকাঙ্খিত, বহু প্রতীক্ষিত দিনটি এসে গেল। আমি স্যালেম হাউস থেকে ইয়ারমাউথ হয়ে বাড়ির পথে রওনা হলাম ঘোড়ার গাড়িতে করে।

৯

কিন্তু যতই বাড়ির পথে এগিয়ে যেতে লাগল আমার গাড়ি, ততই এক অস্বস্তিকর অনুভূতি পেয়ে বসল আমায়। আমি এমনই এক বাড়িতে যাচ্ছি যে বাড়ি আর সেই সুখের বাড়ি নেই! অথচ একদিন এ বাড়িতে আমাদের কত সুখ ছিল। তখন আমরা থাকতাম সে বাড়িতে শুধু তিনজন—আমি, আমার মা আর পেগটি। সেদিন আমাদের মধ্যে আর কেউ ছিল না। কিন্তু আজ আর সে বাড়ি নেই।

সেই বাড়ির গেটের সামনে গাড়িটা পৌঁছে দিল আমায়। গাড়ির কোচোয়ান বার্কিস আমার বাক্সটা গেটের কাছে নামিয়ে দিয়ে আমাকে রেখে চলে গেল। তখন বিকেল হয়ে গেছে। আমি বাড়ির বাগানের দিকে একবার তাকালাম। দেখলাম শীতের বিকেলের হিমেল হাওয়ায় পুরনো এল্‌ম গাছগুলো এক শৈত্যনিবিড় যন্ত্রণায় দুলতে দুলতে তাদের হাতগুলো যেন মোচড়াচ্ছিল

আর তাতে পাখিদের বাসাগুলো তছনচ হয়ে যাচ্ছিল।

আমি নিঃশব্দে পুরনো বসার ঘরটার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম। আমি ভয়ে ভয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলাম। কিন্তু মিঃ বা মিস মার্ডনস্টোনকে দেখতে পেলাম না।

আমি ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেলাম, আমার মা অনুচ্চস্বরে গান গাইছেন। আমি নিঃশব্দে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখলাম, তিনি আগুনের ধারে বসে আছেন। তাঁর কোলে ছিল একটি শিশু, তার মুখপানে চেয়ে গান করছিলেন তিনি স্পষ্ট স্বরে। আমাকে দেখতে পেয়েই ঘরের মাঝখানে ছুটে এলেন তিনি। বারবার বলতে লাগলেন, আমার ডেভি, ডেভি আমার! এই বলে নতজানু হয়ে বসে বারবার চুম্বন করতে লাগলেন আমায়। কোলের শিশুটিকে দেখিয়ে বললেন, এটি তোমার ভাই।

মা শিশুটিকে দোতলায় শুইয়ে রাখলেন। এমন সময় পেগটি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল আনন্দের আবেগে। বলল, আমার গাড়ি অনেকক্ষণ এসে গেছে। এত তাড়াতাড়ি এসে পড়বে তা ভাবতে পারেনি।

কথায় কথায় জানলাম সেদিন বিকালে মার্ডস্টোনরা ভাই-বোন দুজনে একজন প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে গেছেন। রাত করে বাড়ি ফিরবেন।

অনেকদিন পর আবার আমরা সন্ধ্যার সময় তিনজনে একসঙ্গে খেলাম। অতীত দিনের সেই আরাম কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পেলাম। খাওয়ার পর আমরা তিনজনে অর্থাৎ আমি, আমার মা আর পেগটি আগুনের ধারে বসে গল্প করতে লাগলাম। খাওয়ার সময় দেখলাম, মার সেই সৌন্দর্যটা আগের মত থাকলেও তাঁর দেহটা আগের থেকে রোগা হয়ে গেছে। তাঁর মুখ ও হাতগুলো ফ্যাকাশে ও খুব সাদা সাদা দেখাচ্ছে।

আমি আমার স্কুলের কড়া হেডমাস্টার ক্রীকল্-এর শাসনের কথা বললাম, বললাম স্টীয়ারফোর্থের ভালবাসার কথাও।

আমি একসময় পেগটিকে বললাম, তোমাকে কোচোয়ান বার্কিস বিয়ে করতে চায়। আমাকে সে একথা পথে বলেছে। আগের বারে সে একথা তোমাকে চিঠি লিখে জানাতে বলেছিল।

কথাটা শুনে মুখে গাউনের আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে লাগল পেগটি। আমার মা কথাটা শুনে বললেন, এখন না পার তো, পরে তাকে বিয়ে করতে পার পেগটি।

পেগটি হাসতে হাসতে বলল, আমি কখনই বিয়ে করব না। বার্কিস বা অন্য কাউকেই না।

এই কথার পর মা পেগটির একটা হাত ধরে বললেন, পেগটি, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। আমার কাছে তুমি চিরদিন থাকবে বলো? তবে খুব বেশী দিন হয়ত থাকতে হবে না। কিন্তু যে কদিন বাঁচি তোমাকে ছাড়া আমি কি করব?

পেগটি আশ্চর্য হয়ে বলল, আমি তোমাকে ছেড়ে চলে যাব? একথা কি করে বললে তুমি?

আমার মা শান্ত কণ্ঠে পেগটিকে আরও বোঝাতে লাগলেন। তিনি বললেন, জানি, মার্ডস্টোনদের নিয়ে তোমার কিছুটা অসুবিধা হয়। কিন্তু ভেবে দেখ। মিস মার্ডস্টোন ভাঁড়ারের চাবিটা তার কাছে রেখে দিয়েছে ঠিক, কিন্তু একদিক দিয়ে সে ভালই করেছে, আমাকে কোন কিছু করতে দেয় না। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ও অনেক কাজই করে, সংসারের সব কিছু দেখে।

আমাকে কিছু ভাবতে হয় না। আর মিঃ মার্ডস্টোনের কথাটাই ধর। এটাও ঠিক আমার মধ্যে কিছু ছেলেমানুষি আছে, আমি স্বভাবতই কিছুটা দুর্বল প্রকৃতির। সে জায়গায় মিঃ মার্ডস্টোনের মত দৃঢ় চরিত্রের ও গম্ভীর প্রকৃতির শক্তসমর্থ এক পুরুষের দরকার ছিল বাড়িতে। তাছাড়া তিনি আমার শরীর ও সুখসুবিধার দিকে নজর রাখেন। তবে এটাও ঠিক যে, তুমি হচ্ছ আমার একমাত্র এবং আসল বন্ধু। যেদিন মিঃ কপারফিল্ড প্রথম আমাকে এ বাড়িতে এনে তোলেন, সেদিন তুমিই আমাকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলে।

এই সব কথাবার্তার পর আমি আগুনের ধারে বসলাম। পেগটি সেই কুমীরের বইটা তার পকেট থেকে আমার হাতে দিল। বইটা হয়ত সে আমারই জন্য যত্ন করে রেখেছিল। অনেকদিন পরে আবার আমি সেই বইটা পড়ে পেগটিকে শোনাতে লাগলাম। অনেকদিন পর ফিরে পাওয়া অতীতের সেই আরামঘন সন্ধ্যায় কয়েকটি আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত উপভোগ করলাম। অনেকক্ষণ পর মার্ডস্টোনের ফিরতে দেরি হওয়ায় মা আমাকে শুতে পাঠিয়ে দিলেন।

পরদিন সকালেই আমি বসার ঘরে গিয়ে দেখা করলাম মিঃ মার্ডস্টোনের সঙ্গে।

আমাকে দেখে যেন চিনতেই পারলেন না মার্ডস্টোন। আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললাম, আমি যা করেছি তার জন্য দুঃখিত স্যার, আমাকে ক্ষমা করবেন দয়া করে।

মার্ডস্টোন বললেন, তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য দুঃখিত জেনে খুশি হলাম।

এই বলে তিনি আমি তাঁর যে হাতটা কামড়ে দিয়েছিলাম সেই হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে।

এর পর আমি মিস মার্ডস্টোনের কাছে গিয়ে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, ছুটি ক' দিনের?

আমি বললাম, একমাসের।

উনি ক্যালেণ্ডার দেখে বললেন, যাক, তাহলে অন্ততঃ একদিন গত হলো।

আমি দু' একদিনের মধ্যেই বুঝতে পারলাম মিঃ ও মিস মার্ডস্টোন আগের মতই অকারণে বিরূপ আমার প্রতি। কেন জানি না, তাঁদের দুজনের কেউই সহ্য করতে পারছিলেন না আমাকে। আমাকে দেখলেই ওঁরা অস্বস্তিবোধ করছিলেন আর তাঁদের সেই ভাব দেখে আমিও অস্বস্তিবোধ করছিলাম!

সেদিন সকালে বসার ঘরে প্রাতরাশের পর আমি যখন আমার ঘরে চলে যচ্ছিলাম, তখন সহসা মার্ডস্টোন আমাকে ডেকে বললেন, আমি তোমার মধ্যে একটা রাগ রাগ ভাব লক্ষ্য করছি। এটা মোটেই ভাল চরিত্রের লক্ষণ নয়।

আমি শান্ত কণ্ঠে বললাম, না স্যার, ছুটিতে বাড়ি আসার পর থেকে আমার মধ্যে কোন রাগতাপ নেই।

কিন্তু মার্ডস্টোন তা মানতে চাইলেন না। তিনি বললেন, রাগভাব তোমার মুখ দেখলেই বোঝা যায়।

আমার মা আমার সমর্থনে কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু মিস মার্ডস্টোন তাঁকে থামিয়ে দিলেন জোর করে। তিনি বললেন, লোকচরিত্রের গভীরে প্রবেশ করার মত আমার ভাইয়ের যে অর্ন্তদৃষ্টি

আছে তা বুঝতে চেষ্টা কর।

মার্ডস্টোন আমাকে বসতে বলে বললেন, আমি দেখি তুমি সব সময় বাড়ি চাকর বাকরদের সঙ্গে থাক। তাদের সঙ্গে বেশ কথাবার্তা বল, মেলামেশা কর। এবার থেকে ওসব করবে না— যদি আমার কথা অমান্য কর, তবে তার পরিণাম খুব খারাপ হবে বলে দিলাম।

সেই দিন থেকে আমি তাঁর কথামতই চলতে লাগলাম। আমার মা আমার সপক্ষে কিছু বলতে গিয়েছিলেন, কিন্তু মার্ডস্টোন তাঁকে থামিয়ে দেন। তাঁর ঠোঁটদুটো তখন কাঁপতে থাকে না বলা কথার আবেগে।

আমি সকাল থেকে সারাদিন বসার ঘরে আমার পড়ার বই নিয়ে কাটাতে লাগলাম। কোন গল্পের বই পড়তে পারতাম না। কোথাও যেতাম না। পেগটির সঙ্গে কোন কথা বলতাম না। বাড়ি হয়ে উঠল আমার কারাবাস। তখন কেবলি মনে হতে লাগল ছুটিতে বাড়ি না এলেই বোধহয় ভাল হত। মিস মার্ডস্টোনের ভয়ে মাও আমার সঙ্গে হৃদ্যতার সঙ্গে কোন কথা বলতেন না, আদর করতে পারতেন না। আমি বুঝতে পারলাম মিঃ মার্ডস্টোন ও মিস মার্ডস্টোনের কাছে আমি একেবারে অবাঞ্ছিত। তাঁরা কোনক্রমেই আমাকে সহ্য করতে পারছেন না।

অবশেষে ছুটির দিন ফুরিয়ে এল। অবশেষে মিস মার্ডস্টোন একদিন সকালে আমাকে এক কাপ চা দিয়ে বললেন, আজ তোমার ছুটির শেষ দিন।

আমার কিন্তু বাড়ি থেকে স্কুলবোর্ডিংএ যেতে কোন দুঃখই হচ্ছিল না। সেখানে স্টীয়ারফোর্থের সহানুভূতি ও ভালবাসা ছিল, তেমনি মিঃ ক্রীকল্-এর ভয়ও ছিল।

পরদিন সকালেই বার্কিস গাড়ি নিয়ে এসে হাজির হলো বাড়ির গেটের সামনে। মা যাতে আবেগে বিচলিত না হন তার জন্য মিস মার্ডস্টোন তাঁকে যথারীতি স্বভাবসুলভ কঠোরতার সঙ্গে সাবধান করে দিলেন। তবু মা নত হয়ে আমাকে চুম্বন করলেন। আমি মাকে ও আমার শিশু ভাইকে চুম্বন করলাম।

আমি গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়ি ছেড়ে দিলে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, মা একা গেটের কাছে কোলে শিশুটিকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আমার দিকে তাকিয়ে।

পরে স্কুলবোডিংএ ঘুমের মাঝে প্রায়ই স্বপ্ন দেখতাম, মা আমার বিছানার পাশে আমার দিকে তাকিয়ে চেয়ে রয়েছেন। বর্তমানে তাঁর শিশুপুত্রের মুখপানে যে আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকেন, সেই একই আগ্রহের নিবিড়তা ছিল তাঁর চোখে।

১০

বাড়িতে ছুটি কাটিয়ে স্কুলে আসার পর দুমাস কেটে গেল। মার্চে আমার জন্মদিন। এর মধ্যে বিশেষ কোন ঘটনা ঘটেনি। একদিন এক কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে খেলার মাঠে আমরা যখন খেলছিলাম তখন হঠাৎ মিঃ শার্প এসে আমায় ডাকলেন। বললেন, ডেভিড কপারফিল্ড, তুমি বৈঠকখানা ঘরে যাও।

আমি ভাবলাম মিঃ পেগটি হয়ত দেখা করতে এসেছে আমার সঙ্গে। তাই ব্যস্ত হয়ে ছুটে

যাচ্ছিলাম। কিন্তু শার্প বললেন, সময় আছে, অত তাড়াতাড়ি করে যাবার কিছু নেই।

আমি বসার ঘরে গিয়ে দেখলাম, মিঃ ক্রীকল্ প্রাতরাশ খাচ্ছেন, পাশে বসে আছেন মিসেস ক্রীকল্। ক্রীকল্-এর সামনের টেবিলে তাঁর বেতটা রাখা আছে।

মিসেস ক্রীকল্ আমাকে একটা সোফায় বসতে বলে বললেন, ডেভিড কপারফিল্ড, তোমাকে একটা বিশেষ কথা বলার আছে।

মিঃ ক্রীকল্ একটা মাখনমাখা টোস্ট খেতে খেতে ঘাড় নাড়লেন। আমি মিসেস ক্রীকল্-এর দিকে আগ্রহের সঙ্গে তাকিয়ে রইলাম।

মিসেস ক্রীকল্ আমায় বললেন, তুমি যখন ছুটির পর বাড়ি থেকে এখানে আস, তখন বাড়ির সব লোক বিশেষ করে তোমার মা কি ভাল ছিলেন?

কেন জানি না, আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। আমি কোন উত্তর না দিয়ে তাঁর দিকে জিজ্ঞাসার দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম।

মিসেস ক্রীকল্ তখন বললেন, আজ সকালে খবর পেলাম তোমার মা খুবই অসুস্থ।

একটা কুয়াশা যেন মিসেস ক্রীকল্ এর মুখটা ঢেকে ফেলল। আমি যেন সব কিছু জেনে ফেললাম। তিনি আরও বললেন, তাঁর অবস্থা গুরুতর।

একটু পরে বললেন, তিনি মারা গেছেন।

একথা বলার আর প্রয়োজন ছিল না। আমি এক বুকফাটা কান্নায় আগেই ভেঙ্গে পড়েছিলাম। আমার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছিল তপ্ত অশ্রুর ধারা। এই বিশাল জগতে আমি পিতৃমাতৃহীন এক অনাথ বালক আর আমার কেউ নেই জগতে।

সেদিন মিসেস ক্রীকল্ আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেন। তিনি সারাদিন আমাকে তাঁর কাছই রেখে দিলেন। আমি সারাক্ষণ কাঁদতে লাগলাম। কাঁদতে কাঁদতে এক একবার ঘুমিয়ে পড়লাম। জেগে উঠে আবার কাঁদতে লাগলাম। বিকেলের দিকে খেলার মাঠে কিছুটা বেড়ালাম। স্কুল ছুটির পর ছেলেরা আমার মার মৃত্যুর কথা জেনে বিশেষ আগ্রহে আমার দিকে তাকাতে লাগল। ঠিক হলো পরদিন বিকেলে আমি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে বাড়ি যাব।

সেদিন রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে বাড়ির কথা ভাবতে লাগলাম। বাড়িটা কি বন্ধ হয়ে যাবে? আমার বাবার কবরের পাশেই হয়ত একটা কবরে আমার মাকে শায়িত করা হবে। তাঁর শিশুসন্তানটির কি হবে? মিসেস ক্রীকল্ বলছিলেন সেও শীঘ্রই মারা যাবে।

পরদিন বিকালে আমি চাষীদের ব্যবহার করা সাধারণ কোচে করে রওনা হলাম। সারাদিন গাড়ি চড়ার পর পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় ইয়ারমাউথে পৌঁছলাম। একটা বেঁটে খাটো লোক এসে বলল, মাস্টার কপারফিল্ড আমি তোমাকে তোমার বাড়িতে নিয়ে যাব।

এই বলে সে আমাকে একটা দর্জির দোকানে নিয়ে গিয়ে শোকসূচক পোশাক বানাবার জন্য আমার মাপ নিল। আমাকে চা আর মাখন রুটি খেতে দিল। লোকটির নাম ছিল মিঃ ওমার। দুটি মেয়ে কাপড় কেটে সেলাই করতে লাগল। তাড়াতাড়ি সেলাই করে পোশাকটা গুছিয়ে প্যাকেটে ভরে দিল।

অবশেষে আমার গাড়ি ছেড়ে দিল।

গাড়িটা আমাদের বাড়ির গেটে পৌঁছতেই পেগটি ছুটে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। সে আমাকে ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেল। মিঃ মার্ডস্টোন বসার ঘরে আগুনের ধারে বসে নীরবে কাঁদছিলেন। তিনি আমাকে দেখে কোন কথা বললেন না। মিস মার্ডস্টোন টেবিলের ধারে বসে গুটিকয়েক চিঠি লিখছিলেন—তিনি শুধু আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার শোকসূচক পোশাকটা সঙ্গে এনেছতো?

আমি বললাম, হ্যাঁ ম্যাডাম।

সারাটা দিন আমি অতিকষ্টে কাটালাম। সমস্ত বাড়িটা মৃত্যুর মত স্তব্ধ। কোন সাড়াশব্দ নেই। শুধু মিঃ মার্ডস্টোন বসার ঘরে নীরব নিরুচ্চার চঞ্চলতায় পায়চারি করে বেড়াতে লাগলেন। এক এক সময় তিনি চেয়ারে বসে একখানা বই হাতে নিয়ে পড়ার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পড়তে পারলেন না। আবার উঠে পড়লেন। পেগটি এ ঘরে আসত না। সে উপরতলায় ঘোরাফেরা করতে লাগল। যে রুদ্ধদ্বার ঘরটিতে মার ও তাঁর শিশুসন্তানটির মৃতদেহ কাপড়চাপা অবস্থায় শায়িত ছিল মাঝে মাঝে সেই ঘরটিতে যেত। একসময় আমি সেই দিকে গেলে পেগটি মার উপর থেকে কাপড়টা সরিয়ে ঘুমন্ত মুখখানা আমাকে দেখাবার চেষ্টা করল। কিন্তু আমি কাতরকণ্ঠে বলে উঠলাম, না পেগটি, তুমি ও মুখ খুলো না। আমি তা দেখতে পারব না।

পরদিন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হলো। প্রতিবেশীরা প্রায় সকলেই অন্ত্যেষ্টিতে যোগদান করল। মা এ বাড়িতে প্রথম আসার পর থেকে যারা মাকে দেখে আসছিল এতদিন, তারা সবাই শেষবারের মত মাকে দেখল। আমরা শোকসূচক পোশাক পরে সমাধিস্থানে দাঁড়ালাম। বাবার সমাধির পাশে গাছের তলায় একটি কবর খুঁড়ে মাকে তাঁর শিশু সন্তানসহ সমাহিত করা হলো।

শোকদুঃখ কাকে বলে তা আমি সেদিন জীবনে প্রথম নিবিড়ভাবে অনুভব করলাম। আমার দুঃখবেদনার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। মার মৃত্যুর থেকেও আমার কাছে অনেক ভয়ঙ্কর দুঃখের কারণ ছিল আমার প্রতি মিঃ ও মিস মার্ডস্টোনের নিদারুণ অবহেলা আর পেগটিকে আমার সঙ্গে মিশতে না দেওয়া। আমার সঙ্গে তারা কেউ কথা বলতেন না। আমাকে কখনো কাছে ডাকতেন না। আমি সব সময় একা একা নীরব নিঃসঙ্গ বেদনায় গুমরে মরতাম।

১১

মার মৃত্যুর পর মার্ডস্টোনরা প্রথম যে কটি কাজ করলেন তা হলো পেগটিকে চাকরি থেকে ছাড়াবার জন্য এক মাসের নোটিশ দেওয়া। কিন্তু আমার সম্বন্ধে কিছু বললেন না। আমি ভাবলাম, ওরা আমাকেও কি বাড়ি থেকে চলে যেত বলবে? আমি কি করব, কোথায় যাব তার কিছুই বলল না ওরা।

একদিন আমি মিস মার্ডস্টোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কি স্কুলে যাব?

মিস মার্ডস্টোন বললেন, না, তুমি আর স্কুলে যাবে না।

তাঁর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস পেলাম না আমি।

www.banglainternet.com

পেগটিকে একসময় এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, সে কিছু শোনেনি এ ব্যাপারে

একদিন আমি যখন রান্নাঘরে আগুনের ধারে বসে আমার হাতদুটো গরম করে নিচ্ছিলাম তখন আমি পেগটিকে কাছে পেয়ে বললাম, জান পেগটি, মিঃ মার্ডস্টোন আমাকে এখন একেবারেই দেখতে পারে না। আগের থেকে আরও বিরূপ আমার প্রতি। আমার দিকে একবার তাকায় না পর্যন্ত।

পেগটি বলল, এখন হয়ত দুঃখে অভিভূত, তাই।

আমি বললাম, এটা দুঃখ নয়, রাগ। মনে কর, বসার ঘরে উনি যখন মিস মার্ডস্টোনের সঙ্গে আগুনের ধারে বসে থাকেন, তখন আমি ঘরে ঢুকলেই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। মুখখানা কালো আর কুটিল হয়ে ওঠে ওঁর। শুধু দুঃখ হলে এমনটা হত না।

একথা সেকথার পর আমি একসময় পেগটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখান থেকে চলে গিয়ে তুমি কি করবে পেগটি?

পেগটি বলল, দিন পনের ইয়ারমাউথে গিয়ে আমার ভাইয়ের কাছে থাকব। তারপর কাজ খুঁজে নেব। ব্লাণ্ডারস্টোনে অনেক খুঁজলাম, কিন্তু কোন কাজ পেলাম না।

এরপর পেগটি একসময় বলল, ওরা তোমাকে এখানে চায় না। তুমি এখানে ওদের অবাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হিসাবে আছ। তুমিও এখন আমার সঙ্গে ইয়ারমাউথে চল। থাকবে কিছুদিন। তারপর যা হয় হবে।

কথাটা শুনে আনন্দ হলো আমার—একে একে ইয়ারমাউথে আগে কাটানো পুরনো দিনের অনেক স্মৃতি মনে ফুটে উঠল। কিন্তু মার্ডস্টোনদের অনুমতি মিলবে কি না, সেই আশঙ্কায় মুষড়ে পড়লাম আমি।

কিন্তু আমাকে এ ব্যাপারে ভাবতে হলো না। সাহস করে পেগটিই একদিন মিস মার্ডস্টোনকে আমার যাবার কথা বলল। এ বিষয়ে অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, ও ওখানে গেলে কুঁড়ে হয়ে যাবে। কুঁড়েমিই যত অনর্থের মূল। তবে এখন এসব নিয়ে আমার ভাইকে বিরক্ত করা উচিত হবে না। তাই বলছি, ও যেতে পারে।

মিস মার্ডস্টোনের কাছ থেকে অনুমতি পেয়ে আমি ও পেগটি দুজনেই খুশি হলাম। আমাদের ইয়ারমাউথ যাওয়ার সব ঠিক হয়ে গেল।

পরদিন সকালেই বার্কিস আমাদের বাড়িতে এসে আমাদের বাক্স নিয়ে গিয়ে গেটের কাছে রাখা গাড়িতে চাপাল। পেগটি সমাধিপ্রাঙ্গনে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছিল। সে হয়ত আমার মৃত বাবা মার কবরের কাছ থেকে শেষবারের মত বিদায় নিচ্ছিল। তার চোখদুটো জলে ভিজে গিয়েছিল। সে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে গাড়িতে উঠে বসল। যে বাড়িতে দীর্ঘকাল কাটিয়েছে, যে বাড়িতে থেকে আমার মার প্রতি এক প্রবল আসক্তির অচ্ছেদ্য বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছিল এবং যে বাড়িটাকে সে একদিন নিজেদের বাড়ি বলেই ভাবত, সে বাড়িটাকে চিরদিনের মত ছেড়ে যেতে এক অপরিসীম দুঃখ ও বেদনায় ভারাক্রান্ত হওয়া খুবই স্বাভাবিক তার পক্ষে।

১২

ইয়ারমাউথে পেগটিদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে আগের মত সব ঠিকই আছে। মিসেস গামিজ আগের বারের মতই দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। মিঃ পেগটি আগের মত তেমনি হাসিখুশিতে ভরা—তেমনি মজার আর আনন্দচঞ্চলও। হ্যাম তেমনি অনুগত ও কর্মতৎপর। শুধু এমিলি তখন বাড়িতে ছিল না। সে স্কুলে গিয়েছিল। মিঃ পেগটি আগের মতই আমাকে আদর অভ্যর্থনা করল।

স্কুল থেকে এমিলির ফেরার পথে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আমাকে দেখেই হাসতে হাসতে ছুটে পালিয়ে গেল ও। আমি তাকে ছুটে গিয়ে ধরে ফেললাম। দেখলাম এমিলি আগের থেকে একটু বড় হয়েছে। তার চোখদুটো আরও নীল হয়ে উঠেছে। তার চোখেমুখে লজ্জার ভাব। আমি তাকে চুম্বন করতে গেলে সে হাত দিয়ে মুখ ঢাকল।

এমিলিকে দেখে সত্যিই আমার খুব ভাল লাগল। কিন্তু আগের মত আর সমুদ্রের বেলাভূমিতে হাত ধরাধরি করে বেড়াতে গেলাম না। সে আপত্তির সুরে বলল, আমি এখন বড় হয়েছি না!

রাত্রিতে শুয়ে আগের বারের মতই এবারও এক অজানা আশঙ্কায় বুকটা আমার কেঁপে উঠতে লাগল তন্দ্রার ঘোরে। মনে হচ্ছিল, সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের আঘাতে হয়ত ভেসে যাবে আমাদের এই কাঠের বাড়িটা। সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো, সমুদ্রের মতই এমনি ভয়ঙ্কর এক অজানা অদেখা শক্তি আমার মা আর আমাদের সুখের বাড়িটাকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! কোন অতলে ডুবিয়ে দিয়েছে!

রোজ সন্ধ্যেবেলায় বার্কিস আসত। পেগটিকে বিয়ে করতে চায় সে। এবার কোন অজুহাত মানবে না। মুখে কিন্তু কোন কথা বলত না সে। শুধু যাবার সময় কিছু না কিছু খাবার জিনিস উপহার হিসাবে রেখে যেত।

পেগটি প্রথম প্রথম অমত করলেও পরে তার ভবিষ্যৎ ভেবে রাজী হলো। আমার মা আগেই পেগটির এই বিয়েতে মত দিয়েছিলেন।

অবশেষে বার্কিসের সঙ্গে পেগটির বিয়ে হয়ে গেল। আমরা সবাই সে বিয়েতে হাজির ছিলাম। চার্চে ওদের বিয়ে হলো যথারীতি। বিয়ের পর বার্কিসের বাসায় চলে গেল পেগটি। আমি তার ভাইয়ের বাসাতেই রয়ে গেলাম।

একদিন পেগটি ও বার্কিস আমাকে আর এমিলিকে গাড়িতে করে বেড়াতে নিয়ে গেল। চার্চের কাছে গাড়ি থামিয়ে আমাকে ও এমিলিকে গাড়িতে রেখে কিছুক্ষণের জন্য চার্চে ঢুকল বার্কিস আর পেগটি।

আমি একা পেয়ে এমিলিকে চুম্বন করলাম। তার কোমরটা জড়িয়ে ধরে বললাম, ভবিষ্যতে আমি তাকে বিয়ে করব। আমাদের মিলনের পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করলে আমি তার রক্তপাত করতেও ছাড়ব না।

কিন্তু এমিলি ছোট হলেও তার বাস্তববুদ্ধি অনেক বেশী। সে হেসে উড়িয়ে দিল আমার কথাগুলোকে। কোন গুরুত্বই দিল না। এর পর পেগটিরা ফিরে এলে আমরা একটা হোটেলে গিয়ে তৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। রীতিমত ভুরিভোজ যাকে বলে।

পরদিন সকালে পেগটি আমাকে ডেকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। ছোট্ট বাসা। একখানা ঘর। ছাদের উপরেও একখানা ঘর ছিল। যেখানে আমাকে বসাল পেগটি। আমার সেই সুখের শৈশবে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কুমীর নিয়ে লেখা যে বইটি থেকে কুমীরের গল্প পড়ে পেগটিকে শোনাতাম, সেই বইটি তার বাক্স থেকে বার করে পেগটি আমাকে দেখাল। সেই বইয়ের সঙ্গে আমার মার মধুর সান্নিধ্য ভরা কত আরামঘন সন্ধ্যার সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে। বইটাকে আমি আদরের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। পেগটি বলল, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, এই বইটা আমি কখনো ছাড়ব না। এটাকে খুব যত্নের সঙ্গে রেখে দেব।

পরদিন আবার আমাকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আমি পেগটির ভাইয়ের বাড়ি গিয়ে ওদের সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসে রাতটা পেগটির বাসায় কাটালাম।

পরদিন সকালে বার্কিস ও পেগটি ঘোড়ার গাড়িতে করে আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিল। পেগটি নামল না গাড়ি থেকে। আমাকে গেটের কাছে নামিয়ে দিয়ে ওরা চলে গেল। আবার আমি পরিত্যক্ত ও অবাঞ্ছিত অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলাম বাড়িতে। আবার সেই কারাগারের যন্ত্রনা। তবে বসার ঘরে বা আমার ঘরে সব সময় বসে থাকতাম না। আমাকে দেখলেই মিস মার্ডস্টোন রেগে যেতেন। মিঃ মার্ডস্টোন কোন কথাই বলতেন না। তবে আমাকে মারধোর করা বা আমার উপর কোন নির্যাতন করা হত না। খাবার সময়মত দেওয়া হত নিয়মিত।

আমি ছিলাম একেবারে অবহেলিত। আমার উপর ওদের নির্মম নির্দয় অবহেলাটাই ছিল আমার দুঃখের সবচেয়ে বড় কারণ। আমাকে পড়াশুনার কথা কেউ বলত না। পেগটি কাছে না থাকায় আরও বেশী নিঃসঙ্গ মনে হত নিজেকে। এই নিঃসঙ্গতাটাকে কিছুটা কাটাবার জন্যই আমি বাড়ি থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পাড়ায় এখানে সেখানে কিছুটা ঘুরে বেড়াতাম। মার্ডস্টোনরা তা চাইতেন না, কারণ ভাবতেন আমি হয়ত তাদের বিরুদ্ধে লোকেদের কিছু বলব।

একদিনের একটা ঘটনায় আমার জীবনের মোড় ফিরল। সেদিনকার কথা আজও আমার মনে আছে স্পষ্ট। একদিন আমি উদ্দেশ্যহীন ভাবে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। এক সময় আমাদের বাড়ির কাছে একটা গলিপথে মোড় ঘুরতেই দেখলাম মিঃ মার্ডস্টোন একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন। পরে খুঁটিয়ে দেখলাম ভদ্রলোক হচ্ছেন মিঃ কুইনিয়ন। অনেকদিন আগে একবার মিঃ মার্ডস্টোনের সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে নোয়েমটক্‌টে গিয়ে তাঁকে দেখি।

কুইনিয়ন আমাকে দেখেই ঠাট্টার ছলে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার ব্রুকস?

আমি বললাম, ডেভিড কপারফিল্ড।

কুইনিয়ন বললেন, না না, তুমি হচ্ছ শোকিণ্ডের ব্রুকস। আগের বারের তাঁর হাসির কথাটা মনে পড়ল আমার।

কুইনিয়ন আমার ঘাড়ের উপর হাত দিয়ে আমার মুখটা ঘুরিয়ে কথা বলতে চাইলেন।

বললেন, কি করছ এখন? পড়াশুনো হচ্ছে ?

আমি কি উত্তর দেব খুঁজে পেলাম না। আমি মিঃ মার্ডস্টোনের মুখপানে তাকালাম।

আমার হয়ে মার্ডস্টোনই কথাটার উত্তর দিলেন। বললেন, ও এখন বাড়িতেই আছে। কোথাও পড়ছে না। ওকে নিয়ে কি করব আমি তার কিছুই ভেবে পাচ্ছি না। ও এখন একটা কঠিন সমস্যা হয়ে উঠেছে।

এই বলে বিরক্তিতে অন্য দিকে মুখ ফেরালেন মার্ডস্টোন। এক কালো ভ্রূকুটি দেখা দিল তাঁর চোখে।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ । তারপর সেই নীরবতা ভঙ্গ করে কুইনিয়ন বললেন, তোমার তো বেশ বুদ্ধি আছে ব্রুকস।

কুইনিয়নের একটা হাত তখনও আমার ঘাড়ের উপর ছিল। মিঃ মার্ডস্টোন বললেন, হ্যাঁ ওর বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ। তুমি বরং ওকে এখন যেতে দাও।

কুইনিয়ন আমাকে ছেড়ে দিলেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি চলে আসি। তারপর দেখি, আমাদের বাড়ির বাগানে মিঃ মার্ডস্টোন কুইনিয়নের সঙ্গে কথা বলছেন। ওঁরা আমার দিকে প্রায়ই তাকাচ্ছেন মনে হলো, ওঁরা আমার সম্বন্ধেই বোধহয় কথা বলছিলেন।

সেদিন রাতে কুইনিয়ন আমাদের বাড়িতেই রয়ে গেলেন। পরদিন প্রাতরাশের সময় মিঃ মার্ডস্টোন আমাকে তাঁর কাছে ডাকলেন। তারপর গম্ভীরভাবে বলতে লাগলেন, ডেভিড, বালকদের কাছে এ জগৎ শুধুই কাজের জগৎ। এ জগৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর জগৎ নয়। কাজ করতে হবে। কর্মময় জগতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে।

মিস মার্ডস্টোন কাছেই বসে ছিলেন। মিঃ কুইনিয়ন পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

মিঃ মার্ডস্টোন আবার বলতে লাগলেন, ডেভিড, তুমি হয়ত জান, আমি ধনী নই। অন্তত এখন তা টের পাচ্ছি। কিছুটা শিক্ষা তুমি ইতিমধ্যেই পেয়েছ—লেখাপড়ার ব্যাপারটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। যদি তা নাও হত, যদি আমি তোমাকে লেখাপড়া শেখাতেও পারতাম, তাতে তোমার মত ছেলের পক্ষে কিছু সুবিধা হতনা। তোমার চরিত্র ও স্বভাবের সংশোধনের জন্য এখন তোমাকে জীবন ও জগতের সঙ্গে সংগ্রাম করতেই হবে। আর সে সংগ্রাম এখনই শুরু করা উচিৎ।

মার্ডস্টোন বলে যেতে লাগলেন, তুমি হয়ত কাউন্টিং হাউস-এর নামটা শুনেছ। মার্ডস্টোন এ্যাণ্ড গ্রিনবি নামে এক মদের ব্যবসা। কারবারটা কুইনিয়নই দেখাশোনা করে। ও বলছে কিছু ছেলেকে চাকরি দেওয়া যেতে পারে এবং তোমাকেও সেখানে একটা চাকরি দেওয়া হবে।

মিঃ কুইনিয়নই কিছুটা আপত্তির সুরে বললেন, কিন্তু ও কাজে কোন ভবিষ্যৎ নেই।

কিন্তু মার্ডস্টোন সে কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, এবার শোন কাজের শর্তাবলীর কথা। তুমি কাজ করে যা পাবে, তাতে তোমার খাওয়া আর হাতখরচ চলবে। তোমার পোশাক আশাক, কাপড় কাচার খরচ আর থাকার খরচ আমি চালাব। এসব খরচ এখন তুমি চালাতে পারবে না।

মিস মার্ডস্টোন বললেন, হ্যাঁ এসব খরচ আমাদের। মিঃ মার্ডস্টোন বললেন, এখন তুমি কুইনিয়নের সঙ্গে লণ্ডন চলে যাও। এবার থেকে নিজের দায়িত্বে নতুন করে জীবন শুরু কর।

মিস মার্ডস্টোন এই সময় বলে উঠলেন, মোট কথা, তোমার সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। এবার তুমি শুধু কাজ করে যাবে। তোমার কর্তব্য-কর্ম করে যাবে।

যদিও তখন আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে আমার ভরন-পোষণের দায় থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই ওরা আমার এই ব্যবস্থা করেছে, তবু ওদের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সেদিন আমি আনন্দ না ভয় কি অনুভব করেছিলাম, তা এখন আমার মনে নেই।

তখন চিন্তা ভাবনার সময় ছিল না। কারণ পরদিনই কুইনিয়নের সঙ্গে একটা কালো জ্যাকেট আর একটা অতি সাধারণ পায়জামা পরে লণ্ডন যাবার গাড়িতে উঠতে হলো আমায়। গাড়ি ছেড়ে দিল। দেখতে দেখতে আমার বাড়ি, বাগান, গ্রামের চার্চ সব অদৃশ্য হয়ে গেল আমার দৃষ্টিপথ হতে। সব যেন আকাশে মিলিয়ে গেল। মাত্র দশ বছর বয়সেই আমি এক শ্রমিক হয়ে উঠলাম।

১৩

মার্ডস্টোন অ্যাণ্ড গ্রিনবি কোম্পানিটা ছিল ব্ল্যাকফায়ার অঞ্চলে নদীর ধারে। একেবারে নদীর ঘাটের কাছে। ওখান থেকে লোকে নৌকোয় চাপত। এটা ছিল কোম্পানির গুদাম ঘর। বিরাট লম্বা ঘরখানা মনে হয় একশো বছরের পুরানো। ধোঁয়ায় আর ধুলোয় ভরা। নীচের মেঝেটা চটা ; সিঁড়িগুলো আধভাঙ্গা। কালিধুলিতে ভরা দেওয়ালগুলো। এই গুদাম ঘরে থাকত যতসব মদ আর স্পিরিটের বোতল। সেই সব বোতল জাহাজে চালান করা হত। সে সব জাহাজ যেত পূর্ব ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। গোটা অঞ্চলটার উন্নতি হলেও এ দিকটার কোন উন্নতি হয়নি। রাস্তার শেষ প্রান্তে অবস্থিত এই গুদাম ঘরের পায়ের কাছটা নদীতে ভাটার সময় কানায় কানায় ভরে যেত।

কিছু লোক আর আমার মত তিন চারটে ছেলে কাজ করত এই গুদাম ঘরে।

মিক ওয়াকার নামে একটা বড় ছেলে আমায় কাজ বুঝিয়ে দিল। আমার কাজ ছিল মদের খালি বোতল ধুয়ে পরিষ্কার করে বোতলগুলোকে গুছিয়ে রাখা। মিনি পোটাটো নামে আর একটি ছেলের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হলো। তার আসল নাম অন্য। এরা খুব গরীব ঘরের ছেলে, খুবই কম বেতনে চাকরি করে এই নোংরা জায়গায়। এদের সঙ্গে স্যালেম হাউসের স্টীয়ারফোর্থ ও ট্যাড্‌লস্ এর তুলনা করে বেদনায় বুক ফেটে যেতে লাগল আমার। আমার সেই অর্ন্তবেদনাকে কোন ভাষা দ্বারা প্রকাশ করতে পারা যাবে না। আমি বেশ বুঝতে পারলাম, আমার ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য অন্ধকার হয়ে গেল। আমার জীবনে বড় হবার আর কোন আশাই নেই।

মিঃ কুইনিয়ন এমন একটা জায়গায় বসতেন যেখান থেকে আমাকে দেখা যেত। কাউন্ট হাউসের বড় ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বাজতেই ডিনারের সময় হলো। মিঃ কুইনিয়ন আমাকে ইশারায় ডাকলেন। আমার দুপুরের খাওয়া শেষ হতেই এক ভদ্রলোক কুইনিয়নের সঙ্গে দেখা

করতে এলেন। কুইনিয়ন আমাকে দেখিয়ে ভদ্রলোককে বললেন, এই হলো মাস্টার কপারফিল্ড।

ভদ্রলোকের নাম মিঃ মিকবার। তিনি বললেন, মিঃ মার্ডস্টোনের একটা চিঠি পেলাম। তিনি একটা ছেলের থাকার কথা বলেছেন। আমার সামনের দিকে একটা ঘরের একটা সীট খালি আছে। ঐ সীটটা ভাড়া দেওয়া হবে।

মিঃ মিকবারের বাড়িতে আমার থাকা ঠিক হয়ে গেল। কুইনিয়ন তাঁকে সন্ধ্যে আটটার সময় এসে আমাকে নিয়ে যেতে বললেন। ভদ্রলোক তখনকার মত চলে গেলেন।

কুইনিয়ন আমাকে যথারীতি চাকরিতে নিযুক্ত করেন। সপ্তায় ছয় শিলিং বেতন ধার্য হলো আমার। সেদিন রাত্রি আটটার সময় মিঃ মিকবার এসে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। আমার বাক্সটা বয়ে নিয়ে গেল যে, তাকে আমি ছয় পেনি দিলাম।

মিঃ মিকবারদের বাড়িটা ছিল উইন্ডসর টেরাসে। মিঃ মিকবারের বাড়িটার অবস্থাটাও খারাপ। তাঁর স্ত্রী মিসেস মিকবারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন তিনি। রোগা চেহারার মধ্যবর্তী বিগত যৌবনা এক নারী। তাঁদের দুটি সন্তান। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। ছেলেটি চার বছরের, মেয়েটি তিন বছরের। একটি কালো রঙের যুবতী মেয়েলোক তাঁদের বাড়ি কাজ করে।

মিসেস মিকবার বললেন, আমি যখন বাবা-মার কাছ থাকতাম, তখন ভাবতেই পারিনি আমাদের বাড়িতে একজন ভাড়াটে রাখতে হবে। মিঃ মিকবারের অনটন সব সময় লেগেই আছে। মিঃ ও মিসেস মিকবার আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁদের প্রতি সহানুভূতিতে মন আমার ফেটে পড়ত। তাঁদের দুঃখ কষ্টের সংসারে আমি কিছুই করতে পারতাম না—এটাই ছিল আমার দুঃখ।

এদিকে মার্ডস্টোন এ্যাণ্ড গ্রিনবি কোম্পানিতে কাজ করতে আর আমার ভাল লাগছিল না। সারাদিন বোতল ধোয়ার কাজ করতে খুবই কষ্ট হচ্ছিল আমার। এত কম মাইনেতে এত পরিশ্রমের কাজ আমার মত বয়সের ছেলের পক্ষে করা সম্ভব নয়। এই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে চাইছিলাম আমি। কিন্তু এর থেকে ভাল কাজ কোথায় পাব তা জানি না। তবে এই দুঃখ কষ্টের মাঝে একটাই আমার সান্ত্বনা ছিল—মিঃ মিকবারের কাছে আমি আপনজনের মত থাকতাম। সারাদিন ক্লান্তিকর শ্রমজীবন কাটানোর পর আমি যখন বাসায় ফিরতাম, তখন মনে হত আমি যেন স্নেহ, ভালবাসায় ভরা আমার নিজের বাড়িতে এসেছি। মিকবারের সঙ্গে এক আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল আমার। তাঁর সংসারে শত অভাব অনটন থাকতেও আমার প্রতি তাঁদের স্নেহ-ভালবাসার কোন অভাব কোনদিনের জন্য ছিল না। তাঁরা তাঁদের অবস্থার কথা আমাকে বলতেন। আমিও আমার জীবনের কথা সব বলতাম তাঁদের।

এক একবার আমি এই কাজ ছেড়ে পালিয়ে যেতে চাইতাম মনে মনে, কোথায় তা জানি না। কিন্তু মিঃ মিকবারের স্নেহ ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়ে কোথাও যেতে শেষ পর্যন্ত মন চাইত না আমার।

অবশেষে একটি ঘটনায় মুক্তি অনেক কাছে এসে গেল আমার।

মিঃ মিকবার মানুষ হিসাবে খুবই উদারচেতা ও সরল প্রকৃতির ছিলেন। কিন্তু তিনি কাজের কাজ কিছুই করতেন না। সামান্য ঘরভাড়া ছাড়া অন্য আয় ছিল না তাঁদের। তাঁদের সংসারটা

টিকে ছিল ধার দেনার উপরেই। তাঁর স্ত্রী এই নিয়ে অনেক অনুযোগ করলেও তিনি তাতে কান দিতেন না।

একবার এক দেনাদার আদালতে মামলা করেন মিকবারের বিরুদ্ধে। সেই মামলা মেটাতে তাঁর যা কিছু ছিল সব খোয়া গেল। সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ল তাঁর পক্ষে। তিনি তখন এই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও সপরিবারে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। সব ঠিক হয়ে গেল এ ব্যাপারে।

আর ঠিক তখনি আমিও আমার চাকরি ছেড়ে, লণ্ডন ছেড়ে চলে যাওয়ার ঠিক করলাম মনে মনে। কিছুদিন আগে থেকেই আমার মাথায় একটা কথা প্রায়ই ঘুরে ফিরে আসত। আমি ডোভারে আমার বাবার পিসি মিস বেটসির কাছে চলে যাব। তাঁর কথা আমার মা ও পেগটির কাছ থেকে শুনেছি। বাবার সম্পর্কে তিনি আমার আত্মীয়া। আমার কেবলি মনে হতে লাগল এই জগতে একমাত্র তিনি ছাড়া আমার আত্মীয় বলতে আর কেউ নেই। আমি হলে তিনি একদিন রাগ করে আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান চিরতরে। আমি তাঁর কাছে গিয়ে পড়লে আমার এই সকরুণ অবস্থার কথা শুনে তিনি নিশ্চয় আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না। নিশ্চয় তিনি আশ্রয় দেবেন আমাকে—এই ছিল আমার বিশ্বাস।

এই সব চিন্তা ভাবনাগুলি দিনে দিনে দানা বেঁধে অবশেষে দৃঢ় সংকল্পে পরিণত হল আমার মনের মধ্যে। তাই ঠিক করলাম, মিঃ মিকবার সপরিবারে এখান থেকে চলে গেলেই আমিও চলে যাব এখান থেকে।

সব কিছু ঠিক করে আমি পেগটির কাছে একটি চিঠি লিখে মিস বেটসির ঠিকানা আর আধ-গিনি ধার চাইলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই পেগটি একটি চিঠি মারফৎ আধ-গিনি পাঠিয়ে দিল আর জানাল, মিস বেটসি ডোভারের সমুদ্র-উপকূলে এক জায়গায় একটি কটেজে বাস করেন—এ ছাড়া বেশী কিছু জানে না ও।

এদিকে মিকবারদের চলে যাবার দিন উপস্থিত হলো। যাবার আগের দিন তাঁরা আমাকে ডিনার খাবার নিমন্ত্রণ করলেন। আমি তাঁদের ছেলেমেয়ের জন্য একটা করে পুতুল কিনে নিয়ে গিয়ে উপহার দিলাম। আমরা সেদিন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে ডিনার খেলাম।

পরদিন সকালেই গাড়িতে করে মিকবার দম্পতি তাঁদের ছেলেদের ও জিনিসপত্র নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। আমি অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে তাঁদের বিদায় দিলাম। আমার মনটা বিষাদে ভরে গেল। ঠিক করলাম এবার আমি এক সপ্তাহ কাজ করার পর মাইনেটা নিয়েই ডোভারে মিস বেটসির কাছে চলে যাব।

আমার কাছে পেগটির পাঠানো আধ গিনী ছিল। তাই আমার সাপ্তাহিক বেতন না নিয়েই আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। আমি আমার বাসায় গিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করলাম। গাড়ির চালক লোকটা দুষ্ট প্রকৃতির ছিল। আমি তাকে আমার বাসা থেকে আমার বাক্সটা নিয়ে গাড়ীতে চাপাতে বললাম। লোকটা গাড়িতে বাক্সটা চাপাল। আমি তখন গাড়িতে ওঠার আগে আমার পকেট থেকে গিনীটা বার করে বসতে যেতেই সেটা পড়ে গেল। আর সেই লোকটা

সেটা নিয়েই নিমেষের মধ্যে গাড়ি ছেড়ে দিল। সে জোরে গাড়ি চালিয়ে দিল। আমি কিছু রাস্তা অনেকক্ষণ ধরে ছুটলাম। 'আমার বাক্স আর গিনী' বলে চিৎকার করে ডাকলাম। কিন্তু গাড়িটা কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেল। আমার ক্ষতি হলেও লোকটার কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে বাঁচলাম।

আমার হাতে গিনীটা দেখেই লোকটা বলেছিল, তুমি পুলিশের কাছে চল।

আমি তাকে যেই বলেছিলাম,আমি যাবনা তোমার গাড়িতে, আমার বাক্স আর গিনীটা দাও, তখন এই মন্তব্য করার জন্য পুলিশের কাছে নিয়ে যাবার কথা বলছিল। অবশেষে এক কথায় সে গাড়িতে উঠে গাড়িটা ছেড়ে দেয়।

আমি সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে গেলাম। এমন সময় পকেট হাতড়ে দেখলাম কয়েকটা পেনি পকেটে পড়েছিল। আমি তা জানতাম না। তাই নিয়ে অল্প কিছু রুটি কিনে খেলাম। তারপর ক্রমাগত জোরে হেঁটে এগিয়ে যেতে লাগলাম ডোভারের দিকে। সেদিন রাত্রিতে আমি যে স্কুলে পড়তাম সেই হাউসের পিছনে খড়ের গাদায় শুয়ে ঘুমোলাম। পরদিন সকালে উঠে আবার হাঁটতে লাগলাম। এইদিন যেতে যেতে পথের ধারে একটা পুরনো জামা প্যান্ট কেনা-বেচার দোকানে আমার ওয়েস্ট কোর্টটা খুলে বিক্রী করে নটা পেনি পেলাম। তা দিয়ে পাঁউরুটি কিনে খেলাম। সেদিন রাতে আর এক খড়ের গাদায় শুয়ে রাতটা কাটালাম। পরদিন আমার জ্যাকেটটা একটা দোকানে মাত্র চার পেনিতে বিক্রী করলাম। আমার পরনে রইল কেবল একটা শার্ট আর পায়জামা। তিনদিন ক্রমাগত হাঁটতে হাঁটতে পায়ে ব্যথা করছিল আমার। তার উপর পেটে খিদের জ্বালা।

তার পরদিন আবার এগিয়ে যেতে লাগলাম। ডোভারের কাছে এসে একটা ঘোড়ার গাড়ির চালককে মিস বেটসির কথা জিজ্ঞাসা করলাম। বললাম সমুদ্রের ধারে একটা কটেজে থাকেন উনি। সে লোকটা ভাল ছিল। সে হাত বাড়িয়ে আঙ্গুল দিয়ে একটা পথ দেখিয়ে দিল।

আমি সেই পথ দিয়ে সমুদ্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। সেখানে গিয়ে পথের ধারে একটা দোকানে গিয়ে একে-তাকে জিজ্ঞাসা করতে অবশেষে উনিশ-কুড়ি বছরের একটি যুবতী মেয়ে বলল, মিস বেটসি আমার মালিক, আমি তাঁর বাড়িতে কাজ করি। তুমি কি তাঁর কাছে ভিক্ষে চাইতে যাবে?

আমি বললাম, না, আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চাই। বাগান সংলগ্ন একটি বাড়িতে আমায় নিয়ে গেল মেয়েটি। মিস বেটসি তখন ফুলবাগানে এক জায়গায় বসে কাজ করছিলেন। মেয়েটি তাঁকে খবর দিতেই তিনি আমার দিকে চাইলেন। তিনি আমাকে দেখেই চমকে উঠলেন। বলে উঠলেন, হা ভগবান! আমি তখন তাঁকে বললাম, আপনি আমার বাবার পিসি, আমার নাম ডেভিড কপারফিল্ড। আমার মার মৃত্যুর পর আমাকে ব্লান্ডারস্টোনের বাড়ি থেকে লণ্ডনে কাজ করতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পড়া বন্ধ করে কাজ করতে হয়। আমি অত কষ্ট করতে না পেরে পালিয়ে এসেছি আপনার কাছে। পথে আমার বাক্স, টাকা পয়সা, যা ছিল সব চুরি হয়ে যায়। কয়েকদিন আমার খাওয়া হয়নি। আমি ক্ষুধাতৃষ্ণায় বড় ক্লান্ত। সমস্ত পথ আমি হেঁটে এসেছি। পায়ে আমার অসহ্য ব্যথা। আমার জন্মের পরই আপনি আমাদের বাড়ি গিয়েই চলে এসেছিলেন।

মিস বেটসি আমাকে দেখে প্রথমে মাটিতে বসে পড়েছিলেন। পরে আমার সব কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে ধরে বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর তাঁর বাড়ির ঝি জেনেটকে ডাক দিলেন। তারপর মিঃ ডিককে ডাক দিলেন। খানিক পর আমাকে সোফাতে বসিয়ে প্রথমে কিছু ঘন মদ ঢেলে দিলেন আমার মুখে।

মিঃ ডিক এসে গেলে মিস বেটসি বললেন, এ হচ্ছে আমার ভাইপোর ছেলে ডেভিড কপারফিল্ড। এখন একে নিয়ে আমার কি করা উচিত বলতো।

মিঃ ডিক বললেন, সবকথা পরে হবে, একে এখন স্নান করানো উচিত।

মিস বেটসি তখন জেনেটকে ডেকে জল গরম করে আমার স্নানের ব্যবস্থা করতে বললেন।

কয়েকদিন পর স্নান করে আরামবোধ করলাম আমি। তারপর আমাকে পরিষ্কার জামা প্যাণ্ট পরতে দেওয়া হলো। মনে হলো সেগুলো ডিকের। তারপর আমাকে সোফায় বসতে বলা হল। আমার ঘুম পাচ্ছিল তখন।

খাওয়ার পর আমার জীবনের সব কথা শুনতে চাইলেন বেটসি। তাঁর একটা বাগান ছিল। তাঁর কেবলই মনে হত বাইরে থেকে গাধা এসে তাঁর বাগানের গাছপালা সব নষ্ট করছে। দূরে কোন গাধা দেখতে পেলেই তিনি জেনেটকে ডাক দিতেন ব্যস্ত হয়ে।

যাই হোক, আমি সব কথা একে একে বললাম। আমি বললাম, আমি আমার জ্ঞান হওয়ার পর থেকে আমাদের বাড়িতে আমরা তিনজন অর্থাৎ আমি, আমার মা আর পেগটি বেশ সুখে ছিলাম। তারপর মা হঠাৎ মার্ডস্টোন নামে একটা লোককে বিয়ে করার পর থেকে অশান্তি নেমে এল সংসারে। বিয়ের পর মার্ডস্টোনের এক অবিবাহিত বোন এসে সংসারের সব কর্তৃত্বভার নিজের হাতে তুলে নিল—কোন বিষয়ে মার কোন কিছু বলার ছিল না। ওরা দুই ভাইবোন আমাকে মোটেই দেখতে পারত না। পড়ার নাম করে আমার উপর পীড়ন করত ওরা। মাকে ওরা আমার সঙ্গে কথা বলতে দিত না। মাকে দুর্বল পেয়ে তাকে শুধু দৃঢ়তার কথা শেখাত। পেগটি আমাকে স্নেহ করত বলে তার সঙ্গে মিশতে দিত না আমাকে। ওরা আমাকে স্যালেম হাউস স্কুলবোর্ডিং এ পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু মার মৃত্যুর পরেই পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে আমাকে লণ্ডনে অতি কম মাইনেতে চাকরি করতে পাঠিয়ে দেয়। বলে, তুমি নিজের ব্যবস্থা নিজেই করে নাও। অবশেষে আমি এই বয়সে এত সব কষ্ট সহ্য করতে না পেরে এখানে পালিয়ে এসেছি।

আমার সব কথা শুনে আমার ঠাকুরমা মিস বেটসি বললেন, বেশ তো ছিল, সেই বাচ্চা মেয়েটা আবার বিয়ে করতে গেল কেন?

প্রশ্নটা তিনি মিঃ ডিককে করলেন। ডিক বললেন, হয়ত তিনি ভালবেসেছিলেন লোকটাকে।

ঠাকুমা বললেন, ভালবাসা না ছাই, একটা খুনীকে ভালবেসেছিল! প্রেম নয়, মৃত্যুর ফাঁস।

এমন সময় বাগানে গাধা ঢুকতে দেখে তিনি বেরিয়ে গেলেন ব্যস্ত হয়ে। ফিরে এসে ডিককে জিজ্ঞাসা করলেন, ডিক, এখন আমি কি করব ওকে নিয়ে?

ডিক উত্তর করল, আমি হলে ওকে এখন বিছানায় শুইয়ে দিতাম।

সঙ্গে সঙ্গে জেনেটকে ডেকে একটা ঘরে আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিতে বললেন উনি।

নরম আরামদায়ক বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই কয়দিন ডোভারে আসার পথে কোথায় কোথায়

শুয়ে কত কষ্টে রাত কাটিয়েছিলাম, তা ভাবতে গা শিউরে উঠল। আমার মত যারা নিরাশ্রয় ও দীনদুঃখী তাদের কথাও ভাবতে কষ্ট হল মনে।

১৪

এখানে আসার পর থেকে দিনগুলো ভালভাবে কাটলেও এক অনিশ্চয়তার কাঁটায় মনটা আমার বিঁধছিল প্রায়ই। আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না, মিস বেটসির মত খামখেয়ালী বাতিকগ্রস্ত এক নারী আমাকে তাঁর কাছে আশ্রয় দেবেন কিনা।

যাই হোক, পরদিন সকালে আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সন্দেহের দোলায় দুলতে দুলতে আমি প্রাতরাশের টেবিলের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম।

প্রাতরাশ খেতে গিয়ে আমার হাতের কাঁটা চামচ পড়ে গেল। আমি কোনরকমে খেয়ে চা খেলাম। আমার ঠাকুরমা সব নিজের হাতে পরিষ্কার করলেন। তারপর একসময় বললেন, আমি তাকে চিঠি দিয়েছি। আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কাকে ঠাকুমা?

উনি বললেন, মিঃ মার্ডস্টোনকে।

আমি ভয় পেয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, উনি এলেও আমি ওঁর সঙ্গে যাব না।

মিস বেটসি আমার বাবার পিসিমা হলেও আমি পিসিমা বলেই ডাকতাম। পিসিমা আমাকে বললেন, উপরে গিয়ে ডিককে নমস্কার কর। উনি কেমন আছেন দেখ।

আমি উপরে গিয়ে দেখলাম মিঃ ডিক একমনে একটা কালো রঙের ঘুড়ি তৈরি করছেন। প্রথমটায় দেখেন নি। পরে দেখতে পেয়ে বললেন, স্কুলে পড়েছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

উনি আবার বললেন, রাজা প্রথম চার্লস এর কখন মাথা কাটা যায় তা জান?

আমি বললাম, আমি অত সব জানি না।

উনি বললেন, ইতিহাসে তাই বলে। কিন্তু আমি নতুন করে ইতিহাস লিখছি।

আমি সত্যিই ডিকের পাশে অনেক হাতে লেখা কাগজ দেখলাম। তিনি বললেন, আমি তোমার সঙ্গে এই ঘুড়ি ওড়াব।

আমি বললাম, আমার পিসি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন।

ডিক বললেন, তাঁকেও আমার নমস্কার দেবে।

আমি নীচে নেমে গিয়ে পিসিমাকে ডিকের কথা বললাম। বললাম, উনি আপনাকে নমস্কার জানিয়েছেন। উনি ভালই আছেন।

পিসি বললেন, ডিককে তোমার কেমন লাগে?

আমি বললাম, খুব ভাল লোক। প্রকৃতপক্ষে একজন ভদ্রলোক।

উনি বললেন, ডিকের আসল নাম কিন্তু অজানা। ওর আসল নাম হচ্ছে রিচার্ড ব্যাবলে। কিন্তু ও নামে ডাকলে রেগে যাবে।

আমি বললাম, মানুষ হিসাবে খুব ভাল, তবে মাথায় একটু ছিট্ আছে বলে মনে হয়।

পিসি বললেন, ওর ভাই তাই বলত। আর এই বলে দাদার ওপর ওপর অত্যাচার করত।

ওকে একটা পাগলা গারদে রাখা হয়েছিল। সেখানেও ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হত। ডিক আমার এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়। ওর এক বোন ছিল। সে ওকে খুব ভালবাসত। কিন্তু সবাই যা করে—সেও বিয়ে করে চলে গেল। ওর সেবাযত্ন করার মত দুনিয়ায় কেউ নেই। আমি ওকে দেখতে গিয়ে ওর ভাইকে বললাম, ও মোটেই পাগল নয়। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। ও আমার কাছে থাকবে। আমি ওকে দেখব। সেই থেকে আজ প্রায় দশ বছর হলো ও আমার কাছেই আছে। নানাবিষয়েও আমি ওর উপদেশ চাই। আর ও সদুপদেশই দান করে। ওর সাধারণ জ্ঞান বেশ স্বচ্ছ। সেই জ্ঞান থেকে ও যে পরামর্শ দেয়, তাতে উপকার হয়। তা বলতে গেলে বেশ কাজেই লাগে।

আমি যখন এমনি করে সহজভাবে কথা বলছিলাম, পিসির সঙ্গে তখনও কিন্তু আমার মনটা আচ্ছন্ন হয়েছিল এক নিবিড় আশঙ্কায়। মার্ডস্টোনকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। সে হয়ত আমাকে নিতে আসবে। তখন পিসি কি করবেন? আমাকে কি আশ্রয় দেবেন? না, আমাকে ছেড়ে দেবেন তাঁর হাতে? এই প্রশ্নে আকুল হয়েছিল আমার মন। কখনো আশায়,কখনো ভয়ের দোলায় মনটা আমার প্রায়ই দুলছিল।

এমন সময় আমি শুনলাম মার্ডস্টোন চিঠির উত্তর লিখেছেন, তিনি কালই আসবেন।

পরদিন সকাল থেকেই আমি ভয়ে তটস্থ হয়ে রইলাম। এক বিরাট কালো মেঘ যেন সারাক্ষণ বসে রইল আমার বুক চেপে। আমি কোন কিছু ভাবতেই পারছিলাম না।

অবশেষে সারাদিনের শঙ্কিত প্রতীক্ষার পর মার্ডস্টোন ও তাঁর বোন দুজনে এলেন বিকালের দিকে। ওঁরা দুজনে দুটি ঘোড়ায় চড়ে এলেন।

আমার পিসি উপরতলায় জানালার ধারে বসে পথ পানে চেয়ে ছিলেন। মার্ডস্টোনরা ঘোড়ায় চেপে বাগানের ভিতর দিয়ে আসার জন্য ভীষণ রেগে গেলেন পিসি। জেনেটকে ডেকে বললেন, জেনেট, গাধা—যাও, ওদের তাড়িয়ে দিয়ে এস।

জেনেট গিয়ে ওঁদের বলল, আপনারা ঘোড়া থেকে নেমে আসুন। ঘোড়ায় চড়ে বাগানের উপর দিয়ে আসবেন না।

যাই হোক ওঁরা এসে বসার ঘরে ঢুকলেন। আমার পিসি বেটসি আমাকে হাত ধরে নিয়ে গিয়ে এক কোণে বসিয়ে রাখলেন।

মার্ডস্টোন এসেই অভিবাদন জানিয়ে বললেন, মিস ট্রটউড, আমি ব্লান্ডারস্টোন, রুকারি থেকে আসছি। আপনার চিঠির উত্তর দেবার জন্য সশরীরে উপস্থিত হয়েছি।

আপনি কিন্তু ওই বাচ্চা মেয়েটাকে বিয়ে করে ব্লান্ডারস্টোনে না এলেই ভাল করতেন।

গম্ভীরভাবে এই কথাগুলো বলে ওঁদের সম্ভাষণ জানালেন মিস বেটসি।

মিস মার্ডস্টোন বললেন, আমিও এই মতই পোষণ করি। একেবারে বাচ্চা আর অনভিজ্ঞ।

মিস বেটসি মিঃ মার্ডস্টোনকে বললেন, আপনি ওদের সংসারের আসার পর থেকেই যত বিপত্তির উদ্ভব হয়। আপনি বিয়ে করেছিলেন, বেশ করেছিলেন। ও কাউকে না কাউকে বিয়ে করত। কিন্তু বিয়ের পর থেকে আপনি ছেলেটার প্রতি কি ব্যবহার করেছেন বলুন তো? আপনার উচিত ছিল সত্যিকারের পিতার মত স্নেহভালবাসা দিয়ে যত্ন করা ওকে। আপনারা ওর মায়ের

স্নেহ-ভালবাসা থেকেও ওকে বঞ্চিত করেছিলেন। আপনারা ওর মায়ের মনটাকে একেবারে বিরূপ করে দিয়েছিলেন। সে তার নিজের ছেলেকে ভালবাসতে গেলেই তাকে দৃঢ়তার কথা শিক্ষা দিতেন। আপনারা মানুষ?

মিঃ মার্ডস্টোন বললেন, এই ছেলেটাই যত কিছু বিপত্তি ও অশান্তির মূল। ও ক্রোধী, একরোখা, কোন বুদ্ধি নেই। আছে শুধু কুবুদ্ধি।

মিস মার্ডস্টোন বললেন, ওর মত বাজে ছেলে পৃথিবীতে আর একটিও নেই।

মিঃ মার্ডস্টোন বললেন, ওকে সংশোধন করার অনেক চেষ্টা করেছি আমি। আমার আর্থিক সঙ্গতি কম। তবু ওকে ভালভাবে রাখার চেষ্টা করেছি। আমি ওকে একটা ভাল কোম্পানিতে কাজ দিয়ে লণ্ডনে এক বন্ধুর কাছে রেখেছিলাম। কিন্তু ও চোরের মত পালিয়ে এসেছে।

মিস বেটসি বললেন, ও যদি আপনার নিজের ছেলে হত তাহলে এই শিশু বয়সে স্কুল ছাড়িয়ে ওকে ভাল কোম্পানিতে চাকরি করতে পাঠাতে পারতেন? ওর মা বেঁচে থাকলেও পাঠাতে পারতেন? আপনার আর্থিক সঙ্গতি নেই। ওর বাবা অর্থাৎ আমার ভাইপো ওর নামে যে বার্ষিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল সেটা কি ওর মার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মরে যায়?

মার্ডস্টোন বললেন, সেটা ওর মার নামে।

মিস বেটসি বললেন, ওটা ওর মার নামে আছে,তাই না? কিন্তু জানেন, স্ত্রী দ্বিতীয়বার বিয়ে করলে স্বামীর ধন সম্পত্তিতে তার অধিকার থাকে না। সব তার ছেলে পায়। কিন্তু এই বালকের পক্ষে দাঁড়িয়ে এ কথা বলার মত তখন কেউ ছিল না। ব্লান্ডারস্টোনের বাড়ি ঘর সব এই ছেলের প্রাপ্য। ওটা ওর বাবার সম্পত্তি।

মিস মার্ডস্টোন বললেন, ওর মা আমাদের কোন কথার কোন প্রতিবাদ করত না।

মিস বেটসি রাগের সঙ্গে বললেন, সেই বাচ্চা মেয়েটাকে আপনারা ভেড়া বানিয়ে রেখেছিলেন। তার বোধশক্তি কিছু ছিল না। আপনারা দুজনে মিলে ভালবাসার নাম করে কৌশলে তার সব স্বাধীনতা হরণ করে নিয়েছিলেন।

মার্ডস্টোন এবার বললেন, যাই হোক, আমরা আপনার সঙ্গে এতদূরে ঝগড়া করতে আসিনি। আমি এসেছি ডেভিডকে নিয়ে যেতে। ও যদি আমার সঙ্গে যায় ভাল, না যায়তোআরো ভাল, আপনাকেই ওর সব ভার নিতে হবে। আজ না গেলে আমার দরজা চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে। আপনার দ্বার হয়ত খোলা থাকবে।

মিস বেটসি তখন মার্ডস্টোনকে বললেন, এখন ডেভিডকে বলে দেখুন, সে যাবে কিনা।

আমি তখন বললাম, আমি যাব না।

তারপর আমি মিস বেটসিকে কাতর কণ্ঠে বললাম, পিসিমা, ওঁদের সঙ্গে আমাকে পাঠিও না। আমি বাড়িতে থাকাকালে ওঁরা দারুণ কষ্ট দিয়েছেন। আমাকে বন্দীর মত করে রাখতেন। আমার মাকে পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বলতে দিতেন না। মার মৃত্যুর পর আমি বাড়িতে ছিলাম আরও অবহেলিত, সেই অবস্থায় স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে বাড়িতে আমায় বসিয়ে রাখেন। আমার সঙ্গে ওঁরা কেউ বসতেন না। আমাকে দেখলেই রেগে যেতেন। তারপর আমাকে ওঁদের কোম্পানিতে চাকরি করতে পাঠান। সেখানে আমাকে অন্যান্য শ্রমিকদের সঙ্গে এই বয়সে

হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে হত। সেখানে আমাকে একটা নোংরা গুদাম ঘরে মদের বোতল পরিষ্কার করতে হত। সপ্তায় মাইনে দিত মাত্র ছয় শিলিং। আমি ওঁদের কাছে আর যাব না। তাতে যদি আমাকে না খেয়ে মরতে হয় তো তাও ভাল।

মিস বেটসি তখন দৃঢ়ভাবে বললেন, ওর সঙ্গে যে ব্যবহার আপনারা করেছেন তাতে ও আর আপনাদের কাছে যাবে না। আপনারা তাহলে এবার চলে যেতে পারেন। দ্বিতীয় পিতা হিসাবে আপনার কোন কর্তব্যই আপনি করেননি। ও যদি আপনার নিজের ছেলে হত তাহলে আপনাদের ভাল কোম্পানিতে এই বয়সে পড়া ছাড়িয়ে দিয়ে চাকরি করতে পাঠাতে পারতেন না। তাছাড়া ওর মার অকালমৃত্যুর জন্য আপনারাই দায়ী। একটা নিরীহ নির্দোষ সরল প্রকৃতির মেয়ের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলেছিলেন আপনারা দুজনে মিলে। তার দোষ—সে কোন প্রতিবাদ করতে পারত না। আপনারা তাকে দেখার অনেক আগে থেকে তাকে আমি জানতাম। আপনাদের স্বরূপ আমি জেনেছি। যান, চলে যান। ছেলেটা মোটেই খারাপ নয়। দেখি, ওকে নিয়ে কি করতে পারি আমি। তবে ঘোড়ায় চড়ে আমার বাগানের উপর দিয়ে যাবেন না।

মার্ডস্টোনরা চলে গেলে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সেদিনকার সেই মুহূর্তের আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করে বোঝাতে পারব না। আনন্দের আবেগে চোখে আমার জল এসেছিল। আমি পিসিমার গলাটা জড়িয়ে ধরে বললাম, পিসিমা তুমি আমায় বাঁচালে ওদের হাত থেকে।

পিসিমা বললেন, ডিক, এখন আমার কি করা উচিত? মিঃ ডিক বললেন, এখনই ওর পোশাক তৈরি করে দিতে হবে।

পিসিমা তখনি জেনেটকে ডেকে দোকানে নিয়ে আমার জন্য ভাল পোশাক কিনে দিলেন। তারপর বাড়িতে এসে বললেন, ওর নামের সঙ্গে 'ট্রটউড'টা জুড়ে দাও ।

ডিক বললেন, হ্যাঁ, ওর নাম হবে ট্রটউড কপারফিল্ড। আমরা বন্ধু হয়ে থাকতে চাই।

আমি বললাম, হ্যাঁ, আমি আপনার বন্ধু হয়েই থাকব।

পিসিমা খুশি হলেন।

সহজভাবে সেদিন আমার পিসিমার কাছে এক নিরাপদ স্থায়ী আশ্রয় পেয়ে গেলাম আমি। আমি বুঝলাম, বহিরঙ্গের কঠোরতা, ও কিছু বাতিক সত্ত্বেও মিস বেটসির মধ্যে এমন একটা কোমল অন্তর, এমন একটা মন আছে যা তাঁকে শ্রদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল আমার কাছে । সেদিন রাত্রিতে আমি আরামে শুয়ে পড়লাম। আমার মনে পড়তে লাগল, একদিন আমি কত কষ্ট করেছি, কিন্তু যে দুঃখকষ্টের পথ আমি অতিক্রম করেছি, সেই পথের বেদনাময় গৌরবই আমাকে এই আশাতীত স্বপ্নের জগতে নিয়ে এসেছে।

১৫

দিনের শেষে রোজ মিঃ ডিকের সঙ্গে বাড়ির বাইরে একটা ফাঁকা জায়গায় ঘুড়ি ওড়াতে যেতাম। ডিকের ঘুড়ি ওড়ানোর সখটা ছিল প্রবল। ঘুড়িটা যখন আকাশে অনেক উঁচুতে উড়ত তখন লাটাইটা ধরে তা দেখতেন। দেখে প্রচুর আনন্দ পেতেন বলে মনে হত। তারপর যখন

ঘুড়িটা নীচে নামতে নামতে মাটিতে পড়ে যেত, তখন কেমন যেন এক হতাশা আর বিষাদে মুখটা ভারী হয়ে উঠত তাঁর! সারাদিন তিনি নিজের ঘরে বসে লেখালেখি করতেন আর বিকেল হলেই আমাকে নিয়ে ঘুড়ি ওড়াতে যেতেন বাইরে সমুদ্রের ধারে। এটাই ছিল তাঁর আমোদ প্রমোদের একমাত্র উপকরণ।

এইভাবে আমরা দুজনে বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও অন্তরঙ্গ ও উত্তম বন্ধু হয়ে উঠলাম দুজনের।

কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল এইভাবে। আমার পিসিমা আমাকে যে ট্রটউড নামটা দিয়েছিলেন সেই নামেই তিনি ডাকতেন আমাকে। আমার বোন হলে তো তিনি তাকে এই নামেই ডাকতেন! তাই এই নামে আমাকে ডেকে তৃপ্তি পেতেন উনি। আমিও ক্রমে আমার সেই কল্পিত বোনের মতই প্রিয় হয়ে উঠলাম তাঁর কাছে।

আমার একমাত্র উদ্বেগের ব্যাপার অন্য বিষয়ে। এখানে আশ্রয় পাবার পর থেকে মাঝে মাঝেই একথাটা ভাবতাম আমি—শুধু খাওয়া দাওয়া ও স্বচ্ছন্দে থাকাটাই বড় কথা নয়, লেখাপড়া করতে হবে। জীবনে শিক্ষা চাই। তাই পিসিমা এই শিক্ষার কথাটা উল্লেখ করলে আমি খুশি হতাম।

একদিন পিসিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ট্রট, তুমি কি ক্যাণ্টারবেরি স্কুলে পড়তে চাও?

আমি বললাম, হ্যাঁ পিসিমা। খুব ভাল হবে। আমি তোমার কাছে থাকব তাহলে?

পিসিমা বললেন, ভাল কথা, তাহলে কালই যাবে?

আমার পিসিমার প্রকৃতি আমি জানতাম। তাই তাঁর এই প্রস্তাবের আকস্মিকতায় বিস্মিত না হয়ে উত্তর দিলাম, হ্যাঁ পিসিমা তাই হবে।

পিসিমা বললেন, জেনেট, তুমি গিয়ে সেই ছাইরঙা ঘোড়ার ছোট গাড়িটা ঠিক করে এস। কাল সকাল দশটার সময় আসতে বল।

পিসিমার এই আদেশের কথা শুনে আনন্দে বুকটা ফুলে উঠল আমার। কিন্তু বেচারা ডিকের কথা ভেবে মনে আঘাত লাগল। কারণ আমিই এখানে ছিলাম ওঁর একমাত্র বন্ধু ও খেলার সাথী। এই আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে মিঃ ডিকও মুষড়ে পড়লেন বিষাদে। তারপর আমার পিসিমা যখন বললেন, আমি মাঝে মাঝে শনিবার বাড়ি আসতে পারব আর ডিকও বুধবার আমার কাছে গিয়ে দেখা করতে পারবেন, তখন তিনি কিছুটা খুশি হলেন।

আমার পিসিমা জনমতের কথা মোটেই গ্রাহ্য করতেন না। তাই পরদিন সকাল দশটায় বাড়ি থেকে রওনা হয়ে নিজেই গাড়ি চালাতে লাগলেন। স্থির হয়ে বসে কোন দিকে না তাকিয়ে গাড়ি চালাতে লাগলেন তিনি। গাড়ি ক্যাণ্টারবেরির পথে এগিয়ে যেতে লাগল। একসময় তিনি আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কি তুমি খুশি তো?

আমি বললাম হ্যাঁ পিসিমা, আচ্ছা ক্যাণ্টারবেরির স্কুলটা কি খুব বড়?

পিসিমা বললেন, আমি জানি না। আমরা এখন যাচ্ছি মিঃ উইকফিল্ডের কাছে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, স্কুলটা কি তাঁর?

পিসিমা বললেন, না, তাঁর বাড়িতে যে অফিস আছে সেখানে যাচ্ছি। তারপর স্কুলটা ঠিক করা হবে।

অনেকক্ষণ পর আমাদের গাড়িটা পথের ধারে একটা পুরনো দোতলা বাড়ি সামনে দাঁড়াল। বছর পনের বয়সের একটা ছেলে দরজা খুলে দিল। তাকে দেখে তার বয়সটা আরো বেশী বলে মনে হলো। তার চেহারাটা রোগা রোগা, হাতগুলো সরু সরু। কিন্তু সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার, তার চোখের উপর ভ্রূ নেই, চোখের পাতাও নেই। তার নাম ইউরিয়া হীপ।

দরজা খুলে ইউরিয়া হীপ আমাদের অফিস ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাল। আমি বুঝতে পারলাম, এটা এক উকিলের অফিস। কিছুক্ষণের মধ্যে চকচকে কোট, ওয়েস্টকোট ও ভাল পোশাক পরা মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এসে পিসিমাকে অভিবাদন জানিয়ে বসলেন। পিসিমা আমার পরিচয় দিয়ে বললেন, এই ছেলেটি হচ্ছে আমার ভাইপোর ছেলে। আমি একে আমার কাছে রেখেছি—একে একটা ভাল স্কুলে ভর্তি করতে চাই। স্কুলবোর্ডিংয়েই থাকবে।

মিঃ উইকফিল্ড আমার পিসিকে বললেন, আগে স্কুলটা আমার সঙ্গে দেখে আসুন। ছেলেটি এখানে আমার বাড়িতে বসুক।

আমাকে রেখে পিসিমা উইকফিল্ডের সঙ্গে তখনি চলে গেলেন, আমি সেই অফিসঘরে বসে বসে ঘরের আসবাবপত্র ও ছবি দেখতে লাগলাম। ইউরিয়া হীপ কি একটা কাজ করছিল।

অনেকক্ষণ পর ওঁরা ফিরে এলেন। জানতে পারলাম, স্কুলটা পিসিমার পছন্দ হলেও তার বোর্ডিংটা ভাল নয়। সেটা নাকি আমার থাকার উপযুক্ত নয়।

তখন এই সমস্যাটা দূর করার জন্য মিঃ উইকফিল্ড একটা প্রস্তাব দিলেন। যতদিন না ভাল একটা থাকার জায়গা পাওয়া যায় ততদিন তাঁর বাড়িতে থেকেই আমি স্কুল যাব। তিনি আরও বললেন, এই বাড়িটা আমার পড়াশুনোর পক্ষে উপযুক্ত স্থান—নির্জন নিরিবিলি।

পিসিমা তাতে রাজী। কিন্তু একটা বিষয়ে তিনি ইতস্ততঃ করছিলেন। মিঃ উইকফিল্ড তা বুঝতে পেরে বললেন, আপনি না হয় ওর খাওয়া থাকার জন্য কিছু খরচ দেবেন। সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়।

আমার পিসিমা ও আমি দুজনেই খুশি হলাম। সদাশয় ভদ্রলোক মিঃ উইকফিল্ড বললেন, তাহলে এই বাড়ির কর্ত্রীকে ডাকি একবার।

কর্ত্রী মানে আমার বয়সেরই একটি মেয়ে। তাকে ডাকতেই সে এসে গেল। উইকফিল্ড তাকে নীচু গলায় কিছু বলতে মেয়েটির মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বুঝলাম উইকফিল্ডের স্ত্রী মারা গেছে এবং এই মেয়েই তার জীবনের সব কিছু। ঘরে সামনের দেওয়ালে যে মহিলার ছবি টাঙ্গানো ছিল মেয়েটির মুখটি সেই মহিলার মুখের মত। মেয়েটির নাম এ্যাগনিস। এ্যাগনিস আমাদের উপরতলায় নিয়ে গিয়ে থাকার ঘরটা দেখিয়ে দিল। আমি দেখলাম কোন অসুবিধা হবে না আমার।

পিসিমাকে ওঁরা ডিনার খেয়ে যেতে বললেন। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই বাড়ি পৌঁছাতে চান বলে পিসিমা অল্প কিছু জলযোগ করেই বিদায় নিলেন। আমাকে বলে গেলেন, উইকফিল্ড তোমার সব কিছু দেখাশোনা করবেন। তুমি মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। যখন যা কিছু দরকার উনিই তার ব্যবস্থা করবেন।

তিনি আমাকে আদেশ দিয়ে বললেন, কখনো কোন নীচতাকে প্রশ্রয় দেবে না, কখনো মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেবে না, কখনো কোন অবস্থাতেই নিষ্ঠুর হবে না। আমি তাঁকে এই বলে আশ্বস্ত

www.BanglaBook.net

করলাম, আমি কখনো এই রকম কাজ করব না পিসিমা।

পিসিমা বললেন, গাড়ি এসে গেছে। আমি যাচ্ছি। তুমি এখানে থাক।

এই বলে তিনি আমাকে আলিঙ্গন করে তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। আমি দেখলাম তাঁর মুখটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে।

পাঁচটার সময় মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতে ডিনার খাওয়া হয়। ডিনারের সময় আমরা নীচের ঘরে গেলাম। উইকফিল্ডের মেয়ে এ্যাগনিস সব ব্যবস্থা করল। খাওয়ার পর আমরা আবার উপরের বসার ঘরে গেলাম। উইকফিল্ড ঘরের কোণে বসে ধীরে ধীরে প্রায় দু ঘণ্টা ধরে মদ্যপান করতে লাগলেন। আমি লক্ষ্য করছিলাম; মিঃ উইকফিল্ড তাঁর মেয়ের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলছেন। বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে তাঁর মনটা। এ্যাগনিস একটা বই পেড়ে অন্য কথা বলে তাঁর মনটা ঘুরিয়ে দিল। উইকফিল্ড তখন বিষাদটা কাটিয়ে নিশ্চিন্ত মনে মদ্যপান করতে লাগলেন।

এ্যাগনিস আমাদের চা করে দিয়ে উপরে চলে গেল। মিঃ উইকফিল্ড চাবি নিয়ে তাঁর অফিসঘরে চলে গেলেন। আমিও চলে গেলাম।

কিন্তু সন্ধ্যার সময় আমি এক ফাঁকে বাইরে থেকে বেরিয়ে শহরটাকে একটু ঘুরে দেখে নিলাম। আবার ফিরে এলাম।এসে দেখি ইউরিয়া হীপ অফিসঘর বন্ধ করছে। সে আমার সঙ্গে করমর্দন করল। তার রোগা রোগা হাতটা খুব ঠাণ্ডা, হাতটা ভূতের মত। আমি উপরে শুতে চলে গেলাম। তখনো আমার মনে হচ্ছিল, তার ভুতুড়ে হাতের অস্বস্তিকর স্পর্শটা তখনো লেগে রয়েছে আমার হাতে।

১৬

পরদিন সকালে প্রাতরাশের পর আবার নতুন করে স্কুলজীবনে প্রবেশ করলাম আমি। মিঃ উইকফিল্ড আমায় স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিলেন। পুরনো আমলের একটি বড় বাড়ি, সামনে ফাঁকা মাঠ, স্কুলের প্রধান ডঃ স্ট্রং-এর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো।

ডঃ স্ট্রং-এর কাছে এ্যানী নামে একটি যুবতী মেয়ে বসেছিল। মিঃ উইকফিল্ড তাকে স্ট্রং এর স্ত্রী বলে ভাবলেন প্রথমে। পরে জানা গেল যে সে তার স্ত্রীর এক খুড়তুতো বোন।

স্ট্রং আমাকে আমার ক্লাশ ঘরে নিয়ে গেলেন। দেখলাম বড় ঘরখানা একেবারে নিস্তব্ধ। সে ঘরে পঁচিশ জন ছাত্র নীরবে পড়াশুনা করছিল।

মিঃ স্ট্রং ক্লাশে গিয়ে ছেলেদের বললেন, ডেভিড কপারফিল্ড নামে একটি নতুন ছেলে ভর্তি হয়েছে।

ছেলেদের মধ্যে প্রধান অ্যাডাম নামে একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। ছেলেটির আচরণ খুবই ভাল।

এর আগে বাড়িতে মার কাছে ও পরে স্যালেম হাউসে যা কিছু শিখেছিলাম, লণ্ডনে অফিসের কাজ করতে গিয়ে তা সব ভুলে গেছি। দুঃখের বিষয় কিছুই মনে ছিল না আমার। তাই আমাকে

পরীক্ষা করে দেখা গেল আমি কিছুই জানি না। তাই সবচেয়ে নীচের ক্লাশে ভর্তি করা হলো আমায়।

স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রথম দিনটা বড় অস্বস্তিতে কাটল। আমি কোন ছেলের দিকে ভাল করে তাকাতে পারছিলাম না। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল এই সব ছেলেদের মধ্যে কেউ যদি আমার অতীত জীবনের দুরবস্থার কথা জেনে থাকে, আমি মার্ডস্টোন গ্রিনবিতে কিভাবে কাজ করতাম, পিসিমার কাছে ডোভার আসার পথে ক্যাণ্টারবেরি শহর পার হবার সময় এদের কেউ যদি ময়লা জামা আর ছেঁড়া জুতো পরা ভিখারির অবস্থায় আমাকে দেখে থাকে, তাহলে সে এখন কি ভাববে? এই ভেবে একটা অজানা আশঙ্কায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি।

কিন্তু নতুন বইয়ের গোছা হাতে যখন আমি আবার আমার অর্থাৎ উইকফিল্ডের বাড়িতে ফিরলাম তখন সব অস্বস্তি, সব আশঙ্কা দূর হয়ে গেল।

অ্যাগনিস তখন বসার ঘরে আমার আসার জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাকে দেখে খুশি হয়ে মৃদু হাসল। আমাকে জিজ্ঞাসা করল, স্কুলটা লাগল কেমন?

আমি বললাম, ভালই লাগল। তবে আজ প্রথমতো।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি স্কুলে যাও না?

অ্যাগনিস বলল, এই বাড়িটাই তো আমার স্কুল। বাপী আমাকে কোথাও যেতে দিতে চান না।

আমি বললাম, তোমার বাবা তোমাকে খুবই ভালবাসেন।

অ্যাগনিস বলল, হ্যাঁ। আমার জন্মের পরই আমার মা মারা যান। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, শুধু তাঁর ছবি দেখেছি, যে ছবিটা নীচের তলায় আছে। গতকাল তুমিও ছবিটা দেখছিলে।

আমি বললাম, ছবিটা একেবারে তোমার মত। মনে হয় তুমি বড় হলে ঐ রকম হবে।

ও বলল, বাবাও তাই বলেন।

এমন সময় মিঃ উইকফিল্ড বাড়ি আসতেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল অ্যাগনিসের মুখখানা। মিঃ উইকফিল্ড ঘরে ঢুকে আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানালেন আমাকে। তারপর বললেন, আশা করি ডঃ স্ট্রং-এর অধীনে থেকে ঐ স্কুলে পড়াশুনা করে আনন্দিত হবে। অনেকে তাঁর দয়ার অপব্যবহার করে। কিন্তু তুমি যেন তা কোর না। জগতে যত লোক আছে তার মধ্যে ডঃ স্ট্রং হচ্ছেন সবচেয়ে শান্ত ও ভদ্র। তিনি কোন মানুষকে সন্দেহ বা অবিশ্বাস করেন না। এটা তাঁর গুণ বা দোষ যাই বল না কেন।

তাঁর কথা শুনে আমার মনে হলো তিনি খুবই চিন্তিত এবং কোন একটা বিষয়ে অসন্তুষ্ট। তবু সে ব্যাপারে আমি কোন প্রশ্ন করলাম না।

এমন সময় আমাদের ডিনারের কথা ঘোষণা করা হলো এবং আমরা সকলে নীচে চলে গেলাম। আমরা সকলে আমাদের নির্দিষ্ট আসনে বসলে ইউরিয়া হীপ তার সরু হাত দিয়ে দরজা ঠেলে তার লাল মুখটা বাড়িয়ে মিঃ উইকফিল্ডকে বলল, মিঃ ম্যালডন একটা কথা বলতে চান স্যার।

মিঃ উইকফিল্ড বললেন, কথা যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এমন সময় ইউরিয়া হীপের

পিছন থেকে ম্যালডন আর তার বোন অ্যানি ডঃ স্ট্রং সম্বন্ধে কি সব কথা বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। কারণ সমস্ত ব্যাপারটা আমি ঠিক জানতাম না।

ম্যালডন চলে গেলে আমরা সকলে ডিনার খাওয়া শেষ করে উপরতলায় বসার ঘরে চলে গেলাম। মিঃ উইকফিল্ড যথারীতি একমনে মদ্যপান করে যেতে লাগলেন। অ্যাগনিস পিয়ানো বাজাতে লাগল। মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে কথা বলল।

মদ্যপান শেষ হলে মিঃ উইকফিল্ড আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ট্রটউড, তুমি কি আমাদের কাছেই থাকতে চাও, না অন্য কোথাও যেতে চাও?

আমি বললাম, আপনাদের যদি কোন অসুবিধা না হয় এবং আপনারা যদি চান, তবে আমি এখানেই থাকতে চাই।

মিঃ উইকফিল্ড বললেন, আমাদের অসুবিধার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আমি শুধু ভাবছি তোমার কথা। আমাদের বাড়িটা বড় নীরস। কোন বৈচিত্র্য নেই, আনন্দের কোন উপকরণ নেই। আমরা বড় একঘেয়ে জীবন যাপন করি।

আমি বললাম, আমার সমবয়সী অ্যাগনিসের যদি কোন অসুবিধা না হয় তবে আমার অসুবিধা হবে কেন? এবাড়িতে থাকতে আমার ভালই লাগে।

মিঃ উইকফিল্ড বললেন, অসুবিধা তো দূরের কথা, তুমি থাকলে আমাদের ভালই লাগে। তুমি বড় ভাল ছেলে। তোমার সঙ্গ ও সাহচর্য আমাদের খুব ভাল লাগে।

মিঃ উইকফিল্ডের সঙ্গে এ বিষয়ে খোলাখুলি আলোচনা হওয়ায় আমি খুবই সন্তুষ্ট হলাম। আমি ভাবতে লাগলাম, এ বাড়িতে থাকতে আমার সত্যিই ভাল লাগে। মিঃ উইকফিল্ড একজন যথার্থ ভদ্রলোক, অত্যন্ত সরল প্রকৃতির ও সহানুভূতিশীল। আর অ্যাগনিসকে শুধু ভাল লাগে না, তাকে শ্রদ্ধা করতেও ইচ্ছা করে। ইয়ারমাউথের এমিলি সুন্দরী, তাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু অ্যাগনিস এই বয়সেই যেভাবে স্থিতধী ও ব্যক্তিত্বসম্পন্না হয়ে উঠেছে তা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। সে যেন সত্য, সংযম ও ন্যায়নিষ্ঠার মূর্ত প্রতীক। তার প্রতিটি কথা ও আচরণ শ্রদ্ধা জাগায় মনে।

অ্যাগনিস শুতে চলে যাবার পর মিঃ উইকফিল্ডও শুতে গেলেন। তখন তিনি একটু বেশী মদ্যপান করছিলেন। তাঁর চোখদুটো লাল হয়ে উঠেছিল।

আমি শুতে যাবার আগে একবার অফিসঘরে গেলাম। দেখলাম, ঘরে আলো জ্বলছে। ইউরিয়া হীপ মন দিয়ে একটা বই পড়ছে। আমি তাকে বললাম, তুমি এত রাত পর্যন্ত কি করছ?

ইউরিয়া হীপ বলল, কোন কাজ নয় মাস্টার কপারফিল্ড, আমি আমার আইনের জ্ঞানটা বাড়ানোর জন্য 'টিডস প্র্যাকটিস' বইটা পড়ছি। খুব ভাল লেখা।

আমি তাকে বললাম, তুমিও একদিন উকীল হতে পার এবং তখন হয়ত মিঃ উইকফিল্ডের ব্যবসার একজন অংশীদার হতেও পার।

ইউরিয়া হীপ বিনীতভাবে হাত কচলে বলল, আমি একজন অক্ষম ব্যক্তি। আমার পক্ষে তা হওয়া সম্ভব নয় মাস্টার কপারফিল্ড। আমার বাবার মৃত্যুর পর আমি অনাথ হয়েছি। মা একটা নিকৃষ্ট বাড়িতে থাকে। আমরা খুব হীন ব্যক্তি, আমাদের কোন সামাজিক মর্যাদা নেই।

www.banglainternet.com

আমার এক প্রশ্নের উত্তরে হীপ বলল, আমি চার বছর মিঃ উইকফিল্ডের কাছে কাজ করছি। উনি খুব ভাল লোক।

এরপর হীপ বলল, মাস্টার কপারফিল্ড, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে একদিন বিকেলে আমাদের বাড়ি যাও তাহলে আমি ও আমার মা খুবই গর্ববোধ করব।

আমি বললাম, একদিন বিকেলের দিকে আমি যাব তোমাদের বাড়িতে।

হীপ আমার কথায় খুব খুশি হলো। এরপর অ্যাগনিসের খুব প্রশংসা করল হীপ। আমিও অ্যাগনিসের একজন ভক্ত—একথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলো হীপ। আমি বললাম যে যদিও ওঁদের সঙ্গে আমার পরিচয় অল্পদিনের, তবু তাঁরা দুজনেই খুব ভাল। এরই মধ্যে তাঁদের মনস্তাত্ত্বিক পরিচয় পেয়েছি।

হীপ বলল, এখানে থাকলে আরাম পাবেন।

এরপর হাতের বইটা বন্ধ করে তাকের উপর রেখে দিল হীপ। তারপর, আমার সঙ্গে করমর্দন করে ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে তার বাড়ি চলে গেল। যাবার সময় বলল, আমার মা আমার জন্য অপেক্ষা করছে।

ডঃ স্ট্রং-এর স্কুলে আমি নিয়মিত যেতে লাগলাম। স্কুলটা সত্যিই ভাল। শিক্ষক ও স্কুল পরিচালক হিসাবে ডঃ স্ট্রং মিঃ ক্রীকল্-এর চেয়ে শতগুণ ভাল ও দক্ষ। স্কুলে ছেলেদের স্বাধীনতা ছিল এবং এই স্বাধীন পরিবেশে পড়াশুনাও ভাল হত। ছেলেরা ডঃ স্ট্রংকে শ্রদ্ধা করত, ভালবাসত। কিন্তু স্যালেম হাউসের মিঃ ক্রীকল্‌কে শুধু আমরা ভয় করতাম।

পরে ছাত্রদের প্রধানের কাছে জানা যায় ডঃ স্ট্রং গ্রীক শব্দের একটি অভিধান তৈরী করছেন। এর জন্য শব্দজ্ঞানই তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে উঠেছে। সময় পেলেই তিনি লিখতে শুরু করেন। কাগজপত্র তাঁর কাছেই থাকে সবসময়। পরে এও জানলাম মিঃ উইকফিল্ড ঠিকই বলেছিলেন, সুন্দরী যুবতী এ্যানী-ই ডঃ স্ট্রংএর স্ত্রী। ডঃ স্ট্রং এর বয়স ষাটের বেশী হলেও এ্যানী তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। এই আত্মভোলা, সরল, সামাজিক ও সহৃদয় মানুষটিকে সত্যিই ভাল না বেসে পারা যায় না।

শুনলাম, এ্যানীর ভাই ম্যালডন একটা কাজ নিয়ে ভারতে যাচ্ছে। সেই উপলক্ষে ডঃ স্ট্রং তাঁর বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় এক ভোজসভার আয়োজন করেছেন। আমাদেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার পর আমি মিঃ উইকফিল্ড ও অ্যাগনিসের সঙ্গে গিয়ে সেই ভোজসভায় যোগদান করলাম। ডঃ স্ট্রং যত্নের সঙ্গে সকল নিমন্ত্রিতদের যথার্থভাবে আপ্যায়িত করলেন। ভোজসভার শেষে এ্যানীর মা ডঃ স্ট্রংএর উদারতার জন্য খুব প্রসংসা করলেন। কিন্তু ডঃ স্ট্রং তা শুনে উদাসীনভাবে বললেন, ও কিছু না। ও কথা বলবেন না।

১৭

এতদিন পেগটির কথাটার উল্লেখ করিনি আমি। মনে ছিল না। আমি ডঃ স্ট্রংএর স্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার পর সব কথা জানিয়ে পেগটিকে একটা চিঠি দিয়েছিলাম। সেই সঙ্গে তার কাছ থেকে

ধার নেওয়া সেই আধ্র-গিনিটাও পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

পেগটি খুব তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়েছিল। পেগটি আমার এই সুখের অবস্থা জেনেও কিছুটা উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল তার চিঠিতে। মিস বেটসির প্রতি তার ভয়টা তখনও কাটেনি। সে ভেবেছে, আবার আমাকে পালাতে হবে। পেগটির এই অমূলক আশঙ্কা ছাড়া একটা নতুন খবর দিয়েছিল। সে তার চিঠিতে জানিয়েছিল, মিঃ ও মিস মার্ডস্টোন আমাদের বাড়ি ছেড়ে কোথাও চলে যাচ্ছে। বাড়ির আসবাবপত্র সব বিক্রী করে দিয়েছে। বাড়িটা হয় ভাড়া দেবে নয়ত বিক্রী করে দেবে। বাড়িটা এখন বন্ধ।

কথাটা জানতে পেরে মনের মধ্যে একটা ব্যথা অনুভব করলাম আমি। আমার বাবা মার মতই আমার জন্মভিটে ও আমাদের বাড়িটাও মৃতের মত পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। একথা ভাবতে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল আমার। বাড়ির উঠোনটা বাগানের গাছগুলো থেকে ঝরেপড়া পাতায় ভরে যাবে। ধুলো-ময়লা জমে উঠবে দরজা জানালাগুলোয়। কোন মানুষের কণ্ঠ শোনা যাবে না সে বাড়িতে, শুধু হাওয়ার শন্‌শন্ শব্দ শোনা যাবে শূন্য বাড়িটাতে। চাঁদের আলো ভূতের মত উঁকি-ঝুঁকি মারবে নির্জন বাড়িটার আনাচে কানাচে।

পেগটি এর মধ্যে ইয়ারমাউথের খবরও দিয়েছিল। লিখেছিল, মিঃ পেগটি ভাল আছে। মিসেস গামিজ কেবলি হা হুতাশ করে চলেছে। এমিলি সরাসরি আমাকে ভালবাসা জানায়নি। সে পেগটিকে তা জানাতে বলেছে।

আমি পিসিমাকে ইয়ারমাউথের খবর ছাড়া আর সব কথা জানালাম।

আমি স্কুলে কেমন পড়াশুনা করছি তা জানার জন্য তিনি প্রায়ই ক্যান্টারবেরিতে হঠাৎ চলে আসতেন। পরে যখন শুনলেন, আমি ভালভাবেই পড়াশুনা করছি এবং আমার আচরণ ছাত্র হিসাবে খুবই ভাল, তখন আসা বন্ধ করে দেন। আমি তাঁর কথামত মাঝে মাঝে শনিবার ডোভারে যেতাম। মিঃ ডিক একটা ঘরে বুধবার আমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। বিকেলে আমার সঙ্গে দেখা করে রাতটা হোটেলে কাটিয়ে পরদিন সকালে চলে যেতেন। তিনি আসতেন যেতেন ঘোড়ার গাড়িতে করে। অর্থাৎ মাসে দুটো বুধবার আসতেন মিঃ ডিক।

মিঃ ডিক ক্রমে ক্রমে আমাদের স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠলেন। তিনি বিকেলের দিকে আমাদের খেলা দেখতেন এবং নিজেও কিছু কিছু খেলা শেখাতেন। তবে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল ঘুড়ি ওড়ানো।

কিছুদিনের মধ্যে একদিন ডঃ স্ট্রং-এর সঙ্গে পরিচয় হলো মিঃ ডিক এর। ডিককে ভাল লেগে গেল ডঃ স্ট্রং-এর। ডঃ স্ট্রং ডিকের বিষয়ে জানতে চাইলে আমি তাঁকে সব কথা খুলে বললাম। সব শুনে তিনি একদিন মিঃ ডিককে বললেন, যে বুধবার বিকালে আসবেন, সেদিন স্কুল ছুটির জন্য আপনাকে মাঠে দাঁড়াতে হবে না। আপনি আমার বাসায় চলে যাবেন। তিনি মিসেস স্ট্রং-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলেন। আমি একদিন দেখলাম ডঃ স্ট্রং মিঃ ডিককে সঙ্গে নিয়ে স্কুলের মাঠের একপাশের পথটা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, মাঝে মাঝে তাঁর অভিধানের কথা বলছেন আর মিঃ ডিক বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কথা শুনছেন এবং মাঝে মাঝে সমর্থনের সঙ্গে কি বলছেন। এসময় মিঃ ডিক উচ্ছ্বাসিত হলেন এবং বললেন, আমি বলে দিচ্ছি, আপনার এই

অভিধান পৃথিবীর মধ্যে এক সেরা অভিধান হবে।

একদিন মিঃ ডিক আমাকে এক অদ্ভুত কথা বললেন। বললেন, এক একদিন সন্ধ্যের সময় অচেনা একটা লোক বাগানের ধারে দোকানে দাঁড়িয়ে থাকে আর মিস বেটসি তাকে কিছু করে টাকা দেন!

আমি বললাম, লোকটা হয়ত ভিখারি।

মিঃ ডিক বললেন, না, লোকটি ভিখারি নয়, আমি চাঁদের আলোয় স্পষ্ট একদিন সন্ধ্যায় দেখেছি, তিনি কিছু টাকা দিচ্ছেন! তারপর, গম্ভীরভাবে বাড়ির ভিতরে ফিরে এলেন মিস বেটসি।

এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করে ভাবলাম নিশ্চয় লোকটা ডিকের কোন আত্মীয়। সে ডিককে হয়ত তার কাছে নিয়ে যেতে চায়। তাই তাকে এ ব্যাপারে ঠেকিয়ে রাখার জন্য টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করতে চান মিস বেটসি। ডিক যাতে শান্তিতে তাঁর বাড়িতে থাকতে পারেন তার জন্যই এই ব্যবস্থা অর্থাৎ এই টাকা দিয়ে ডিকের শান্তি, স্বস্তি আর নিরাপত্তাকে কিনতে চান তিনি।

মিঃ ডিককে একদিন আমি মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতেও নিয়ে গেলাম। অ্যাগনিসের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। যে বুধবার মিঃ ডিক রাত্রিতে হোটেলে থাকতেন, সেদিনের সব খরচ আমার পিসিমাই চালাতেন।

মিসেস স্ট্রং অ্যাগনিসকে খুব ভালবাসতেন। অ্যাগনিসের কাছে প্রায়ই আসতেন তিনি। আমি অ্যাগনিসের বন্ধু বলে আমাকে বিশেষভাবে স্নেহের চোখে দেখতেন তিনি। তবে মিঃ উইকফিল্ডকে কেমন যেন ভয়ের চোখে দেখতেন, বিশেষ সমীহ করে চলতেন।

যে বুধবার বিকালে আমার কাছে আসতেন ডিক, সেদিনটা ছিল তাঁর কাছে খুবই সুখের দিন। একদিন বিকেলে আমি মিঃ ডিকের সঙ্গে যখন রাস্তায় বেড়াচ্ছিলাম, তখন হঠাৎ ইউরিয়া হীপের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সে আমাকে তার বাড়িতে আসার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিল। সে বলল, আমরা হীন ব্যক্তি, আমি আমাদের হীন অবস্থার কথা জানি। তুমি আমাদের বাড়িতে গেলে আমার মা গর্ববোধ করবেন। তুমি যাবে বলে কথা দিয়েছিলে কিন্তু।

আমি ইউরিয়া হীপকে এখনো পর্যন্ত ঠিক চিনে উঠতে পারিনি। তাকে আমি ভালবাসি না ঘৃণা করি তা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। তবু আমার মনের ভয়টা গোপন রেখে আমি বললাম, ঠিক আছে, আমি মিঃ উইফিল্ডকে একবার বলে তাঁর অনুমতি নিয়ে তোমার বাড়ি যাব। তবে মনে হয়, এ অনুমতি পাওয়া খুব কঠিন হবে না।

এই বলে আমি তখনকার মত বিদায় দিলাম ইউরিয়াকে। পরদিন বিকেলেই আমি স্কুল থেকে এসে মিঃ উইকফিল্ডের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে ইউরিয়ার সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলাম। রাস্তার ধারেই একটা ছোট ঘরে থাকে ইউরিয়া হীপ আর তার মা। তার মাকে দেখতে অনেকটা ইউরিয়ার মতই রোগা রোগা। তার মতই বিনয়ী এবং তার মতই এক হীনতাবোধকে সদা সর্বদা প্রশ্রয় দিয়ে চলে।

ইউরিয়া তার মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেই তার মা সত্যিই খুব খুশি হলো। বললো, তুমি আমাদের মত দীন-হীনদের ঘরে এসেছ, এটা তোমার অসীম দয়া মাস্টার কপারফিল্ড। আমরা অতি দীন-হীন এবং দীন-হীন হয়েই সারাজীবন থাকতে হবে আমাদের।

আমি বললাম, একথা কেন শুধু শুধু ভাবছেন?

খাবার টেবিলে নানারকম খাবার দিয়ে চা তৈরি করতে লাগল ইউরিয়ার মা। ইউরিয়া হীপ আমাকে বলল, টিডের আইনের বইটা আমি পড়ছি। বড় ভাল বই। কিন্তু অনেক ল্যাটিন শব্দ আছে, বুঝতে কষ্ট হয়।

আমি বুঝতে পারলাম ইউরিয়া হীপ লেখাপড়া বেশী জানে না। ও বই পড়ে বোঝা তার পক্ষে সম্ভব নয়। নিছক আত্মতৃপ্তির জন্যই পড়ে সে। আমি তাকে বললাম, আমি কিছু ল্যাটিন জানি। আমি তোমাকে তা শিখিয়ে দেব যদি তুমি চাও। পড়াশুনোর ব্যাপারে আমি তোমাকে অনেক বিষয়ে সাহায্য করতে পারব।

কিন্তু ইউরিয়া তাতে হাত কচলে বিনীতভাবে বলল, না মাস্টার কপারফিল্ড। আমরা অতি দীন-হীন ব্যক্তি। তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার সাহায্য নেওয়া উচিত হবে না আমার পক্ষে। নিজের চেষ্টাতেই যতটুকু পারি এগিয়ে যাব।

যাইহোক, খাওয়ার পর আমি ইউরিয়াদের বাড়ি থেকে বেরোবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছি এমন সময় হঠাৎ রাস্তা থেকে ঝড়ের বেগে এসে ঢুকলেন মিঃ মিকবার। আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। বললেন, আমার পুরোন দিনের বন্ধু মাস্টার কপারফিল্ড।

আমি মিঃ মিকবারকে দেখে মনে খুবই আনন্দ পেলেও এই অবস্থায় কেমন যেন একটা অস্বস্তিবোধ করতে লাগলাম। তবে তিনি হারিয়ে গিয়েছিলেন, আবার খুঁজে পেলাম। তাই কিছুটা আনন্দ অনুভব না করে পারছিলাম না। আমি প্রথমে তাঁকে মিসেস মিকবার ও তাঁর ছেলে মেয়েদের কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। মিঃ মিকবার বললেন, তুমি আমাদের বাসায় গেলে আমার স্ত্রী খুবই আনন্দ পাবে। অনিমন্ত্রিত এক আগন্তুক হয়েও কোনরূপ ইতস্ততঃ না করে খাওয়ার টেবিলেই বসে পড়লেন মিঃ মিকবার। ইউরিয়া হীপের মা তাঁকে বলল, মিঃ কপারফিল্ড আমার ছেলের বন্ধু। আমরা এত দীন-হীন যে তাঁর বন্ধু হবার যোগ্য নই। তিনি এত সদাশয়, ও মহানুভব যে আমাদের ঘরে আতিথ্য গ্রহণ করে চা পান করেছেন আপনার মতো। এতে আমরা কৃতজ্ঞ তাঁর প্রতি।

মিঃ মিকবার আমাকে বললেন, এখন কি করছ কপারফিল্ড? এখনো কি সেই মদের ব্যবসায়ে?

আমি মিকবারের এই কথায় দারুণ অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ইউরিয়া হীপের কাছে আমার অতীতের সেই হীন দুরবস্থার কথা প্রকাশ হয়ে যাওয়ার সেই লজ্জায় তাই আমার মুখটা লাল হয়ে উঠল। আমি বললাম, আমি এখন ডঃ স্ট্রং-এর স্কুলের ছাত্র।

মিঃ মিকবার আশ্চর্য হয়ে ভ্রূ কুঁচকে বললেন, ছাত্র! শুনে খুবই খুশি হলাম আমি।

এরপর ইউরিয়া হীপ ও মিসেস হীপের দিকে তাকিয়ে বললেন, এই রকম সুযোগও উন্মুক্ত ক্ষেত্র পেলে আমার বন্ধু কপারফিল্ড অন্তর্নিহিত বুদ্ধি ও মেধায় ফুলে ফলে বিকশিত হয়ে উঠবেই।

ইউরিয়া হীপ তার হাত দুটো কচলাতে লাগল। তার কোমর থেকে উপরদিকে দেহটা মুচড়ে গেল। আমি মিঃ মিকবারকে এখান থেকে কোনরকমে সরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে বললাম,

মিসেস মিকবারের সঙ্গে একবার দেখা করে আসতে পারি কি স্যার?

মিঃ মিকবার বললেন, তুমি যদি অনুগ্রহ করে তা কর তবে খুবই ভাল হয়। আমি তো কয়েকবছর ধরে নিদারুণ অর্থাভাবের সঙ্গে লড়াই করে আসছি—কখনো তাকে কিছুটা দমন করতে পারি, আবার কখনো বা সেই অর্থাভাবের প্রবল বন্যায় ভেসে যাই।

এই বলে হীপদের সান্ধ্য নমস্কার জানিয়ে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন মিঃ মিকবার।

একটা ছোট হোটেলের একটা ছোট্ট ঘরে ওঁরা এসে উঠেছেন। মিসেস মিকবার আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন।

মিঃ মিকবার তাঁর স্ত্রীকে বললেন, জান, মাস্টার কপারফিল্ড এখন ডঃ স্ট্রং-এর ছাত্র।

এই বলে মিঃ মিকবার খবরের কাগজে তাঁর দেওয়া বিজ্ঞাপনে কোন ফল হলো কিনা তা দেখতে চলে গেলেন। যাবার সময় স্ত্রীকে বলে গেলেন, আমাদের বর্তমান অবস্থাটা মাস্টার কপারফিল্ডকে বুঝিয়ে বল প্রিয়তমা।

আমি মিসেস মিকবারকে বললাম, আমি ভেবেছিলাম আপনারা প্লাইমাউথে গেছেন।

মিসেস মিকবার বললেন, আমরা প্লাইমাউথেই গিয়েছিলাম প্রথমে। সেখানে আমাদের পরিবারেরই কিছু লোক আছে। সেখানে মিঃ মিকবারের একটা চাকরির জন্য অনেক চেষ্টা করা হলো। কিন্তু কাউস্টিং হাউসে কোন চাকরি পাওয়া গেল না। অবশ্য ওঁর মত প্রতিভাবান লোকের পক্ষে চাকরি পাওয়া যাবে না। উনি সকলের দোষ ধরেন। সেখানে আমরা এক সপ্তাহ ছিলাম। আমাদের দেখে ওরা খুশি হয়নি। আমাদের মোটেই অভ্যর্থনা করেনি। আমাদের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল খুবই নীরস আর উদাসীন। কোন কাজ না পাওয়ায় তাদের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে এখানে চলে এলাম। কতদিন আর তাদের গলগ্রহ হয়ে থাকব? আমরা ছ'টি প্রাণী, আমরা স্বামী স্ত্রী দুজন, দুটি ছেলে আর দুটি যমজ মেয়ে। এখানে এসে শেষে ওয়ে কোম্পানির সঙ্গে কয়েকবার কারবার করার চেষ্টা করা হলো। মিঃ মিকবারের বুদ্ধি আছে, তবে মূলধন নেই। টাকা নেই। সুতরাং তার কোন আশা নেই। এখন আমার তরফের এক আত্মীয়ের কিছু টাকা পাঠানোর কথা আছে। সেটার আশায় বসে আছি। সেই টাকা এলে তবে এখানকার হোটেল খরচ মেটাতে পারব। ছেলেমেয়েদের আত্মীয়ের কাছে রেখে এসেছি।

এমন সময় মিঃ মিকবার এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁদের দুরবস্থার কথা শুনে দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লাম। আমি মিসেস মিকবারকে বললাম, আমার কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে আপনাদের হোটেল খরচ মেটানো যাবে।

আমার কথা শুনে আবেগে কেঁদে ফেললেন মিঃ মিকবার। তিনি বললেন, সত্যিই আমার বন্ধুভাগ্য ভাল। বারবার বিপদের মাঝে আমার বন্ধুদের জন্যই বেঁচে যাচ্ছি।

যাই হোক, এবার আমি মিকবার দম্পতির কাছে বিদায় নেবার জন্য ঘরের মধ্যে যে ছোট সোফাটায় বসেছিলাম সেখান থেকে উঠে পড়লাম। আমি চলে যাবার জন্য প্রস্তুত হতে মিঃ মিকবার বললেন, আগামীকাল তিনি দেখা করবেন আমার সঙ্গে। কারণ আমার পক্ষে আর আসা সম্ভব নয়। মিসেস মিকবার বললেন, ওখান থেকে টাকা না এলে তাঁরা হোটেল খরচ মিটিয়ে লণ্ডনের বাড়িতে চলে যাবেন।

পরদিন বিকেলের দিকে মিঃ মিকবার স্কুলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলেন। পরে দেখলাম, তিনি রাস্তায় ইউরিয়া হীপের সঙ্গে পাশাপাশি কথা বলতে বলতে যাচ্ছেন। দেখলাম, দুজনের মধ্যে গলায় গলায় ভাব। মিঃ মিকবার আমার সম্বন্ধে ইউরিয়াকে কিছু বলেছেন কিনা তা ভেবে ভয় হলো আমার। পরদিন তাঁদের সঙ্গে তাঁদের হোটেলের ঘরে ডিনার খাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন মিঃ মিকবার।

পরদিন আমি যথাসময়ে তাঁদের ঘরে গেলাম। ডিনার খাওয়া ভালই হলো। আমি মিঃ মিকবারকে জিজ্ঞাসা করলাম, যে টাকা আসার কথা ছিল তা এসে গেছে কিনা? কিন্তু মিঃ মিকবারের মুখখানা গম্ভীর হয়ে গেল। আমার প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না। আমিও তা আর জানতে চাইলাম না।

পরদিনই তাঁদের হোটেলে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করবার কথা ছিল। সেইমত আমি যথাসময়ে তাঁদের হোটেলে চলে গেলাম। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তাঁরা একটু আগে ঘোড়ার গাড়িতে চেপে চলে গেছেন। আমি দূর থেকে দেখলাম মিঃ ও মিসেস মিকবার ঘোড়ার গাড়িতে পাশাপাশি বসে যাচ্ছেন। যাই হোক, অবশেষে তাঁরা যাচ্ছেন দেখে আমি কিছুটা স্বস্তি পেলাম।

১৮

আমার অতীতের স্কুলজীবনের কথা আমার মনে পড়ে মাঝে মাঝে। সেই স্কুলজীবনের দিনগুলো যে পথে চলে গেছে, সে পথে কি তারা কোন চিহ্ন রেখে গেছে, যার ফলে তাদের কথা সহজেই স্মরণ করতে পারি?

ছাত্র হিসাবে আমি খারাপ ছিলাম না। ডঃ স্ট্রং-এর স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর কয়েকমাসের মধ্যেই আমি অনেক উন্নতি করি। কিন্তু আমাদের ক্লাসের যে ছেলেটি সব পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করত, তার নাগাল কখনো পাইনি আমি। তার মতন স্তরে উঠতে পারা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। অবশ্য অ্যাগনিস আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলত, চেষ্টা করলে তুমিও প্রথম হতে পারবে। কিন্তু তার সব উৎসাহ সত্ত্বেও তা হওয়া সম্ভব ছিল না আমার পক্ষে।

আমাদের স্কুলের কাছে যে ক্যাথিড্রেল বা বড় গীর্জাটা ছিল, সেখানে আমরা প্রতি রবিবার সমবেত প্রার্থনায় যোগ দিতে যেতাম। এই প্রার্থনাসভাতেই মিস শেফার্ড নামে সুন্দর ফুটফুটে একটি মেয়েকে দেখি। তাকে আমার খুবই ভাল লেগে যায়।

ক্রমে স্কুলে আমি পড়াশুনায় অন্য সব ছাত্রকে ছাড়িয়ে গেলাম। ল্যাটিন কবিতা আমার খুব ভাল লাগত। আমি তাতে অনেক উন্নতি করলাম। ডঃ স্ট্রং বিভিন্ন অঞ্চলে একজন উদীয়মান তরুণ ব্যক্তি হিসাবে আমার প্রশংসা করতেন। এই প্রশংসার কথা শুনে মিঃ ডিক আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠলেন। পিসিমাও খুশি হয়ে আমাকে একটা গিনী উপহার হিসাবে পাঠালেন।

স্কুলে ছেলেদের মধ্যে প্রধান অ্যাডামস্ স্কুলের পড়া শেষ করে চলে গেল। সে ডঃ স্ট্রং-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। সে অ্যাডভোকেট হতে চায় এবং এবার থেকে তার জন্য পড়াশুনা করবে।

আমার চেহারার মধ্যে একটা পরিবর্তন এল। আমার বয়স তখন সতের। আগের থেকে লম্বা

হলাম। আমার জ্ঞানও বাড়ল। লেখাপড়ার জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হিতাহিত জ্ঞান ও বাস্তব জীবনবোধ বাড়ল। আগে মিস শেফার্ড, মিস লার্কিণ প্রভৃতি মেয়েদের প্রতি তরুণ বয়সোচিত এক তরল আসক্তি ছিল। কিন্তু সে সব আসক্তি সব কেটে গেল একে একে।

একমাত্র অ্যাগনিসের সঙ্গে ছিল আমার এক মধুর সম্পর্ক। একেবারে ভাইবোনের এক স্নেহসিক্ত সম্পর্ক। আমি তাকে সব সময় আমার 'প্রিয় দিদি' বলে সম্বোধন করতাম। সে ছিল আমার একমাত্র অন্তরঙ্গ বন্ধু, সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরামর্শদাতা। তার মত স্থিরবুদ্ধি ও আত্মোৎসমাহিত মেয়ে আমি আর কোথাও কখনো দেখিনি। আমার কেবলি মনে হত, অ্যাগনিস যা কিছু করে, যা কিছু ভাবে, যা কিছু বলে, সব ঠিক।

১৯

আমার স্কুলজীবন যখন শেষ হয়ে এল, তখন আনন্দ না বেদনা কি যে অনুভব করতে লাগলাম আমি, আমার সেই অনুভূতির কথাটা আমি বলতে পারব না। ডঃ স্ট্রং-এর স্কুলে আমি খুব ভালই ছিলাম। বেশ আনন্দের সঙ্গেই পড়াশুনা করলাম আমি। আমি এক নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করতাম। সে জীবনে আনন্দ ছিল প্রচুর। কোন ঝুঁকি ছিল না। শুধু পড়াশুনা আর খেলাধূলা—আর কোন কাজ নেই, কোন চিন্তা নেই।

এই স্কুল ছেড়ে কোন্ বিষয়ে আমি উচ্চশিক্ষা লাভ করব, জীবনে আমি কি হব, কিভাবে আমি উপার্জন করব, কিভাবে আমি আমার পারিবারিক ও সমাজজীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের সম্মুখীন হব—এই সব নানা চিন্তায় বিব্রত হয়ে উঠলাম আমি। অজানা উদ্ভট এক বিশাল আকাশে এক অসহায় পাখির মত ইতস্ততঃ উড়ে বেড়াতে লাগল আমার মনটা।

স্কুলের সঙ্গে আমার বিচ্ছেদটা কোন এক প্রিয়জনের বিচ্ছেদের মতোই হয়ে উঠল আমার কাছে।

স্কুলের পড়া শেষ হতে মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতে থাকাও শেষ হলো । আমি ডোভারে পিসিমার কাছেই চলে গেলাম। সেখানে তাঁর সঙ্গে আমার উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলাম।

একদিন সকালে পিসিমা, মিঃ ডিক ও আমি যখন চা খাচ্ছিলাম তখন সেই চায়ের টেবিলেই পিসিমা আমার উচ্চশিক্ষার কথাটা তুললেন।

একথা সেকথার পর পিসিমা বললেন, শোন ট্রট, এতদিন তুমি স্কুলের ছেলে ছিলে, একজন স্কুল বালকের দৃষ্টিতে জীবন ও জগৎকে দেখতে। তাই আমার মনে হয়, তোমার এখন কিছুটা পরিবর্তন দরকার। আমার মনে হয় কিছুদিনের জন্য কোথাও বাইরে যাওয়া দরকার। এই বাড়ি ও এই পরিবেশ থেকে দূরে গিয়ে খোলা মন নিয়ে ভিন্ন পরিবেশে বিচিত্র মানুষ ও তাদের জীবনকে দেখ। প্রথমে লণ্ডনে কিছুদিন থাকবে। তারপর যেখানে খুশি যাবে, ইচ্ছা হলে সেই বিদ্‌ঘুটে নামের মেয়েটা মানে পেগটির কাছেও যেতে পার। এই সব বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে দিয়ে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে একটা সূত্র খুঁজে পেতে পার। এতে তোমার উচ্চশিক্ষা,

পেশা ও উচ্চাভিলাষটাকে বেছে নেবার সুবিধা পাবে।

আমি এই প্রস্তাবে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে বললাম, হ্যাঁ, পিসিমা, খুব ভাল হবে। আমিও তাই চাই।

পিসিমা বললেন, বাছা, আমিতো সেটাই চাই। ট্রট, তোমার চেহারাটা ভাল, দেহটা বেশ শক্ত সমর্থ। আমার কথা হচ্ছে শুধু দেহটা বলিষ্ঠ হলেই হবে না। তোমার নীতিবোধটাকেও বলিষ্ঠ করতে হবে। এক দৃঢ় নৈতিক ভিত্তির উপর তোমার জীবনকে গড়ে তুলতে হবে। তোমার চরিত্রবুদ্ধি এমনই হতে হবে যাতে সে চরিত্র একমাত্র শুভ ছাড়া কোন অশুভ শক্তির দ্বারা কখনো কোন মতে প্রভাবিত না হয়।

আমি পিসিমাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম, তুমি যা চাইছ, আমি তাই করব পিসিমা।

পিসিমা বললেন, আমি তাই তোমাকে এখন কিছুটা নিজের উপর ছেড়ে দিতে চাই। স্বাধীনভাবে কিছুদিন চলাফেরা করে দেখ। কিভাবে জীবন শুরু করবে। প্রথমে ভাবলাম যে ডিককেও তোমার সঙ্গে পাঠাব। কিন্তু পরে ভাবলাম, না তুমি একাই যাও, সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিতে চলে দেখ।

পিসিমার পরিকল্পনামত আমি বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম। টাকা-পয়সাও আর যা কিছু দরকার তিনি তার ব্যবস্থা করে দিলেন।

বাইরে যাবার আগে আমি ক্যাণ্টারবেরি গেলাম। সেখানে ডঃ স্ট্রং-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছে বিদায় নিয়ে মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতে গেলাম।

অ্যাগনিস আমাকে দেখে খুবই খুশি হলো। বলল, তুমি চলে যাবার পর থেকে আমাদের বাড়িটা কেমন যেন ম্লান হয়ে গেছে।

আমি বললাম, কিছুদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। কিন্তু তুমি আমার ডান হাত। আমাকে পরামর্শ দেবার জন্য তুমি কাছে থাকবে না, আমার খুবই কষ্ট হবে। তোমার অভাবটা আমি সর্বদাই বোধ করব। তোমাকে যারা জানে, তারা সবাই তোমার পরামর্শ গ্রহণ করে।

অ্যাগনিস হেসে বলল, আমাকে যারা জানে তারা আমার পরামর্শ নিয়ে নিয়ে আমাকে মাটি করে দিচ্ছে।

আমি বললাম, তোমার পরামর্শ নেওয়ার কারণ এই যে, তুমি আর পাঁচজনের মত নও। তুমি খুব ভাল ও শান্ত প্রকৃতির। বড় মিষ্টি তোমার ব্যবহার।

অ্যাগনিস এবার জোরে হাসতে হাসতে বলল, তুমি এমন ভাবে কথা বলছ যেন আমি মিস লার্কিন।

আমি বললাম, ওসব কথা বাদ দাও।

কিছুক্ষণ পর অ্যাগনিস আমাকে নীচু গলায় বলল, ট্রটউড, আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই। একথা জিজ্ঞাসা করার সুযোগ এরপর হয়ত পাব না। তুমি আমার বাবার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করেছ কি?

আমি বললাম, আমি কি খোলাখুলিভাবে কথাটা বলব?

অ্যাগনিস স্থিরদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, হ্যাঁ বল।

আমি বললাম, আমি সম্প্রতি লক্ষ্য করছি, তিনি সব সময় কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করেন। তাঁর হাত কাঁপে, তাঁর কথা স্বাভাবিক হয় না। তাঁর চোখগুলো কেমন যেন ঘোরে। মনে হয় তিনি যেন অন্য মানুষ। আর কি একটা দরকারে সব সময় কে যেন তাঁকে খোঁজে।

অ্যাগনিস বলল, সে হচ্ছে ইউরিয়া হীপ।

আমি বললাম, হ্যাঁ, বোঝা যায়, যে কাজ তিনি করতে চান না, যে কাজের তিনি উপযুক্ত নন—সেই কাজ তাঁকে দিয়ে করানো হচ্ছে। তাতে তাঁকে আরও খারাপ দেখায়।

যখন আমাদের এই সব কথাবার্তা চলছিল, তখন মিঃ উইকফিল্ড এসে ঘরে ঢুকলেন এবং অ্যাগনিস সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর কাঁধের উপর মাথাটা রেখে তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

সেদিন স্ট্রং-এর বাড়িতে আমাদের সকলের চা পানের নিমন্ত্রণ ছিল। মিঃ উইকফিল্ড এবং অ্যাগনিসের সঙ্গে আমি গেলাম সেখানে। চায়ের টেবিলে ডঃ স্ট্রং ছিলেন।

ডঃ স্ট্রং একসময় মিঃ উইকফিল্ডকে বললেন, আমি আর বেশীদিন এই মাস্টারির কাজ করব না। ছ'মাসের মধ্যে আমি অবসর গ্রহণ করে এক শান্ত নিরুদ্বেগ জীবন যাপন করব।

মিঃ উইকফিল্ড বললেন, একথা দশবছর ধরে বলে আসছ তুমি।

ডঃ স্ট্রং বললেন, দশবছর ধরে যা বলে আসছি, তা আমি করিনি , কিন্তু এখন আমি সত্যিই এটা করব। কিন্তু অভিধান রচনার কাজটা চালিয়ে যাব। আর তোমার সঙ্গে যে কাজের কথা ছিল সেটার ব্যবস্থাও করব।

মিঃ উইকফিল্ড বললেন, আমার এই ব্যবসায় তো আরও খাটুনি।

ডঃ স্ট্রং গান ভালবাসেন। তাই চায়ের অবসরের পর গানের আসর বসল। এ্যানী আর অ্যাগনিস পর পর একটা করে গান গাইল। পরে তারা দুজনে মিলে একটা দ্বৈত সঙ্গীত গাইল।

আমি লক্ষ্য করলাম, এ্যানীর সঙ্গে অ্যাগনিসের মেলামেশা ও বন্ধুত্বটা ভাল চোখে দেখেন না মিঃ উইকফিল্ড। বিদায় নেবার সময় অ্যাগনিস যখন এ্যানীকে আলিঙ্গন করছিল, তখন মিঃ উইকফিল্ড হঠাৎ এগিয়ে গিয়ে অ্যাগনিসকে টেনে সরিয়ে আনলেন।

যাই হোক, ডঃ স্ট্রং-এর কাছে আমরা বিদায় নিয়ে চলে গেলাম। আমার মনে হলো ডঃ স্ট্রং হয়ত খুব একটা স্বস্তিতে নেই। মনে হলো তাঁর বাড়ির ছাদের উপর একটা ঘন কালো মেঘ জমাট বেঁধে আছে। তিনি শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ বলেই হয়ত অনেকেই তাকে ঠকাবার চেষ্টা করে।

রাতটা কাটিয়ে পরদিনই আমার বইপত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ যা ছিল তার সব গুছিয়ে প্যাক করে নিলাম। ইউরিয়া হীপ আমাকে সাহায্য করার জন্য অতিরিক্ত উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে এল। ইউরিয়ার ভাব-গতিক দেখে মনে হলো আমি এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি বলে সে হয়ত খুশি থাকবে।

অবশেষে অ্যাগনিস ও তার বাবার কাছে বিদায় নিয়ে লণ্ডন যাবার জন্য গাড়িতে চেপে বসলাম। গাড়ির চালক মিঃ উইলিয়াম। সে আমাকে চিনত। আমি তাকে বললাম আমি লণ্ডনে যাব।

আমি উইলিয়ামের ঘোড়ার গাড়িতে বসে লণ্ডন শহরটা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। আমি

পথে যেতে যেতে সেই সব জায়গাগুলোকে দেখতে লাগলাম যে সব জায়গায় আমি অতীতে একদিন নিরাশ্রয় ভিখারির মত শুয়ে রাত কাটিয়েছি, নিঃস্ব ও ক্ষুধার্ত অবস্থায় হেঁটেছি, কোট বিক্রীর পয়সার জন্য অপেক্ষা করেছি। এখন আমি শিক্ষিত—এখন আমার পকেটে প্রচুর টাকা পয়সা আছে! আমি গাড়ি ভাড়া করে যাচ্ছি! আমার আগের অবস্থার সঙ্গে এখনকার অবস্থাটা তুলনা করে দেখতে অদ্ভুত লাগছিল।

আমি আমার পুরনো স্কুল স্যালেম হাউসটাকেও দেখলাম, সেখানে মিঃ ক্রীকল্ আমাকে কত মেরেছেন,আমার উপর কত নির্যাতন করেছেন। এখন আমি যে কোন ভাল হোটেলে থাকতে পারি, ভাল খাবার খেতে পারি।

সেদিন রাত্রিতে একটা হোটেলে জুয়ো খেলতে খেলতে হঠাৎ আমার অতীতের স্কুলজীবনের বন্ধু স্টীয়ারফোর্থকে দেখতে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা হয়ে জড়িয়ে ধরলাম তাকে।

স্টীয়ারফোর্থ আমাকে এই অবস্থায় দেখে প্রথমটায় চিনতেই পারেনি। পরে বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, সেদিনের সেই ছোট্ট কপারফিল্ড! আরে, তুমি কি করে এলে এখানে?

আমি বললাম, আমি ক্যান্টারবেরি থেকে গাড়িতে করে আজই এখানে এসেছি। ঐ অঞ্চলে ডোভারে আমার বাবার পিসী আমাকে পোষ্য নিয়েছে। আমার শিক্ষা আপাতত শেষ হয়েছে। এখন কিছুদিনের জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছি উচ্চশিক্ষা শুরু করার আগে। কিন্তু তুমি এখানে কখন এলে?

স্টীয়ারফোর্থ বলল, আমি এখন অক্সফোর্ডে পড়াশুনো করি। শহরের বাইরে কিছুদূরে গ্রামাঞ্চলে আমার মা থাকেন। ওখানকার রাস্তাটা খুব খারাপ। তাই সন্ধ্যার পর যাইনি, রাতটা জুয়াখেলে কাটাচ্ছিলাম। কাল সকালেই মার কাছে যাব।

আমি বললাম, খেলাটা কিন্তু খুব ভালই জমেছিল। বেশ মজা লাগছিল। তাই না স্টীয়ারফোর্থ?

স্টীয়ারফোর্থ এক প্রাণখোলা হাসি হাসল। তারপর হোটেলের ওয়েটারকে ডেকে বলল, কপারফিল্ডকে কত নম্বর ঘরে দিয়েছ?

ওয়েটার বলল, চুয়াল্লিশ নম্বর স্যার।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, অত বাজে ঘরে দিয়েছ কেন?

ওয়েটার বলল, তাহলে কপারফিল্ডকে আপনার পাশের বাহাত্তর নম্বর ঘরটা দিতে পারি।

ওয়েটার তৎক্ষণাৎ গিয়ে আমার ঘরটার পরিবর্তন করে দিল। স্টীয়ারফোর্থ পরদিন সকালে তার সঙ্গে প্রাতরাশ খাওয়ার নিমন্ত্রণ করল আমাকে। তখন রাত হয়েছিল বলে আমরা শুতে চলে গেলাম যে যার ঘরে।

পরদিন সকাল প্রায় দশটার সময় আমি কোভেন্ট গার্ডেন নামে সেই হোটেলটায় স্টীয়ারফার্থের সঙ্গে প্রাতরাশ খেলাম। খেতে খেতে স্টীয়ারফোর্থ আমাকে বলল, তোমার তো এখন খুব তাড়া নেই। তুমি তো এখন শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছ। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে বেড়াচ্ছ। তবে দু'একদিনের জন্য আমাদের বাড়ি চল না কেন। আমার মা তোমাকে দেখে খুশি হবেন আর

তোমারও ভাল লাগবে।

আমি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। আমি বললাম, তোমার এ প্রস্তাবটাকে তোমার দয়া বলেই মনে হচ্ছে আমার। আমি যাব তোমার সঙ্গে।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, স্কুলে আমি তোমার অভিভাবকের মত ছিলাম। তুমি তোমার সব কথা আমাকে বলতে, আমার কথামত চলতে। তুমি ছিলে যেন আমারই সম্পত্তি।

আমি বললাম, সত্যিই তাই। আমার প্রতি আজও তোমার সেই আগ্রহ ও ভালবাসা দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি স্টীয়ারফোর্থ!

স্টীয়ারফোর্থ বলল, যারা আমায় ভালবাসে, আমি যাদের পছন্দ করি বা ভালবাসি, তারাই আমার মার প্রিয়। আমরা একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে এখনি রওনা হব।

ওদের বাড়ি হচ্ছে হাইগেট অঞ্চলে।

এটা যেন স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল আমার। কোথায় একা একা হোটেলের ঘরে বসে কাটানো আর কোথায় আমার অন্তরঙ্গ পুরনো ও প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে তাদের বাড়ি যাওয়া! আমি সঙ্গে সঙ্গে পিসিমাকে একটি চিঠি লিখে জানালাম আমার এক পুরনো দিনের বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে এবং তার নিমন্ত্রণে তাদের বাড়ি যাচ্ছি।

ওদের বাড়ি হাইগেটে যাবার আগে আমরা মিউজিয়াম দেখতে গেলাম। আমি দেখলাম মিউজিয়াম সম্বন্ধে স্টীয়ারফোর্থের জ্ঞান অসাধারণ।

স্টীয়ারফোর্থ এক সময় আমার কাঁধে হাত দিয়ে বলল, হে আমার প্রিয় ডেভি, তুমি সকালে সূর্যোদয়কালে ফুটে ওঠা ডেইজি ফুলের মত সুন্দর।

মিউজিয়ামটা ভাল করে ঘুরে দেখার পর আমরা লাঞ্চ খেলাম। শীতকাল বলে তাড়াতাড়ি দিন ফুরিয়ে এলো। আমরা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে হাইগেটের দিকে রওনা হলাম।

অবশেষে গোধূলিবেলায় গাড়িটা পাহাড়ের উপর পুরনো আমলের একটা বড় বাড়ির সামনে দাঁড়াল। আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম, তখন একজন বয়স্কা মহিলা যাঁকে ঠিক বৃদ্ধা বলা যায় না, এবং বয়স হলেও যাঁর মুখখানা সুন্দর, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে স্টীয়ারফোর্থকে অভ্যর্থনা জানালেন। স্টীয়ারফোর্থ সেই মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, আমার মা। ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে আমাকে স্বাগত জানালেন।

বাড়িটা পুরনো আমলের হলেও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আর ছিমছাম। উপরতলায় যে ঘরটায় আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল, সেই ঘর থেকে দূরে লণ্ডন শহরটা বিরাট বস্তুপুঞ্জের মত স্তব্ধ দেখাচ্ছিল।

স্টীয়ারফোর্থের মা মিসেস স্টীয়ারফোর্থের চেহারাটা বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ। আমাকে ডিনার খেতে ডাকা হলে আমি গিয়ে দেখলাম ডিনার টেবিলে স্টীয়ারফোর্থ ও তার মা ছাড়া আর একজন বছর তিরিশ বয়সের অবিবাহিতা মহিলা রয়েছেন। তাঁর নাম মিস ডার্টল।

খেতে খেতে একসময় মিসেস স্টীয়ারফোর্থ জানতে চাইলেন এখানকার দক্ষিণাঞ্চলটা দিয়ে আমার বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছা আছে কি না?

কথাটা শুনেই আবেগে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠলাম আমি। আমি স্টীয়ারফোর্থকে বললাম,

তাহলে তো খুবই ভাল হয়। আমার ধাত্রী মিসেস পেগটির বাড়ি তাহলে একবার ঘুরে আসব। এই মিসেস পেগটির ভাই মিঃ পেগটি মাঝে মাঝে স্কুলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। তুমিও তাকে দেখেছ।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, হ্যাঁ, সঙ্গে এক ছেলেকে নিয়ে আসত।

আমি বললাম, ছেলে নয়, তার ভাইপো। ভাইয়ের মৃত্যুর পর তার ভাইপো-ভাইঝিকে নিজের কাছে রেখে মানুষ করে। লোকটা খুবই ভাল আর সরল প্রকৃতির। ওদের বাড়িটা আসলে নৌকোর বাড়ি। একটা বড় নৌকোর উপর কাঠের বাড়ি। ওদের সংসারটা দেখে সত্যিই তোমার মজা লাগবে।

স্টীয়ারফোর্থ আগ্রহের সঙ্গে বলল, তাহলে তো ভালই হল। আমি যাব। আমি জানি এই সব অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত তথাকথিত নীচের তলার লোকেরা বড় ভাল হয়। ওদের আচরণের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা থাকে না। ওদের মনের মধ্যে কোন জটিলতা-কুটিলতা নেই। ওরা সত্যিই সরল প্রকৃতির।

পরে মিস ডার্টল এর ঠোঁটে একটা কাটা দাগ দেখে আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম স্টীয়ারফোর্থকে। দাগটা ক্ষতের মত।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, ছোটবেলায় ও আমাকে একদিন খুব রাগিয়ে দিয়েছিল। তার জন্য আমি একটা হাতুড়ী ছুঁড়ে মেরেছিলাম। ও দাগটা সেই ক্ষত। এ ক্ষত সারাজীবন ওকে বয়ে বেড়াতে হবে। মিস ডার্টল হচ্ছে আমার বাবার এক জ্ঞাতিভাইয়ের মা মরা সন্তান। ওর বাবা মারা গেলে আমার মা ওকে এ বাড়িতে নিয়ে এসে মানুষ করতে থাকেন। নিজের মেয়ের মতই মানুষ করতে থাকেন। সেই সময় আমার বাবা মারা যান।

স্টীয়ারফোর্থ আমার সঙ্গে ইয়ারমাউথ যাবে বলে স্থির করে ফেলল। অবশেষে আমাদের যাত্রা করার দিন এসে গেল।

আমি স্টীয়ারফোর্থের মা ও মিস ডার্টল-এর কাছে বিদায় নিলাম। আমি আমার পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম তাঁদের।

দুটো বাক্সে আমাদের পোশাক-আশাক সব গুছিয়ে গাড়িতে করে ইয়ারমাউথে গিয়ে রাতটা কাটাবার জন্য একটা গলিপথের মধ্য দিয়ে একটা পান্থশালায় গিয়ে উঠলাম। পরদিন সকালে আমি ওঠবার আগেই স্টীয়ারফোর্থ সমুদ্রের ধারে বেলাভূমিতে বেড়িয়ে এল।

প্রাতরাশ খাবার সময় স্টীয়ারফোর্থ আমাকে বলল, কখন তুমি পেগটির সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে ডেইজি? এখন আমি সম্পূর্ণ তোমার হাতে। কখন কি করবে সে ব্যবস্থাটা তোমাকেই করতে হবে।

আমি বললাম, আমি ভাবছি আমরা যাব সন্ধ্যাবেলায়। ওটাই ভাল সময়। ওরা আগুনের ধারে বসে থাকবে। আমরা হঠাৎ গিয়ে ওদের তাক লাগিয়ে দেব। আমরা যে এখানে আছি তা জানাব না।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, সেই ভাল। আদিম মানুষদের দেখব তাদের সহজ স্বাভাবিক অবস্থায়। তার আগে তুমি তোমার ধাত্রীকে দেখতে যাবে তো?

আমি বললাম, সবার আগে আমি আমার ধাত্রী পেগটিকে দেখব। কিন্তু তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, যেখানে খুশি তুমি আমাকে নিয়ে যেতে পার। আমি দু-ঘণ্টার মধ্যেই তৈরি হয়ে নেব।

ঠিক হলো, আমি আগে পেগটিদের বাড়ি যাব। স্টীয়ারফোর্থ কিছু পরে যাবে। আমি তাকে বাড়ির ঠিকানাসহ পথ নির্দেশ দিয়ে দিলাম।

আমি সোজা পেগটিদের বাড়িতে চলে গেলাম। তখন বিকেল। দিনটা বেশ উজ্জ্বল ছিল। পেগটি তখন রান্নাঘরে রান্না করছিল ডিনারের জন্য।

আমি দরজায় কড়া নাড়তেই পেগটি দরজা খুলে দিল। কিন্তু সে আমাকে দেখে প্রথমে চিনতে পারল না। তার দোষ নেই—আজ থেকে সাত বছর আগে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর আমার চেহারার কত পরিবর্তন হয়েছে। অবশ্য আমি তাকে প্রায়ই চিঠি লিখে আমার সব খবরই জানিয়েছি।

আমি তখন মৃদু হেসে বললাম, আচ্ছা ম্যাডাম, মিঃ বার্কিস বাড়িতে আছে কি?

পেগটি বলল, মিঃ বার্কিস বাতরোগে আক্রান্ত হয়ে বিছানায় শুয়ে আছে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, মিঃ বার্কিস কি ব্লান্ডারস্টোন যায়?

পেগটি বলল, যখন ভাল থাকে যায়।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা মিসেস বার্কিস, আপনি কি কখনো ব্লান্ডারস্টোন যান? সেখানকার রুকারি নামে একটি বাড়ির কিছু কথা জানতে চাই।

পেগটি এবার আমাকে ভাল করে খুঁটিয়ে দেখার জন্য কয়েক পা এগিয়ে এল। আমি তখন ডাকলাম, পেগটি!

পেগটিও এবার আমাকে চিনতে পেরে চিৎকার করে বলে উঠল, আমার কত আদরের বাছাধন!

আমাদের দুজনেরই চোখে জল এল। পেগটি তার বুকে আমাকে জড়িয়ে ধরল। কত আনন্দ, কত বেদনার উচ্ছ্বাসে যে ফেটে পড়ল সে, অ বলে বোঝানো যায় না।

পেগটি তার চোখ মুছে বলল, বার্কিস তোমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হবে।

এই বলে বার্কিসকে খবর দিতে গেলে আমি নিজেই তার ঘরে চলে গেলাম। সে বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে ছিল। পায়চারি করার পর্যন্ত শক্তি নেই। কিন্তু আমাকে দেখে খুবই খুশি হলো। অতীতের স্মৃতিচারণ করে সে বলল, আমার মনে হচ্ছে আমি যেন আজ তোমাকে ব্লান্ডারস্টোনের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি আমার গাড়িতে করে। তুমি পেগটি সম্বন্ধে একদম যা যা বলেছিলে তা সব সত্যি। ও দারুণ রান্না করে, আমার সেবা করে।

বার্কিস তার দেহের যন্ত্রণা সত্ত্বেও খুশির সঙ্গে আমাকে তাদের সঙ্গে ডিনার খেতে যেতে বলল। আমি পেগটির মুখের দিকে তাকিয়ে 'না' বলতে পারলাম না।

এই সময় বার্কিস বলল, আমাকে একটু ঘুমিয়ে নিতে হবে। তাহলে জেগে উঠেই মনে পড়বে টাকাটা কোথায় রেখেছি।

আমরা ঘরের বাইরে চলে গেলাম। পেগটি বলল, আসলে ও নিজের হাতে বাক্স থেকে টাকা বার করবে।

সর্বাঙ্গে বাতবেদনা নিয়ে বিছানা থেকে উঠে বাক্স থেকে টাকা বার করতে গিয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছিল বার্কিস। তারপর কিছুক্ষণের মধ্যেই সে বিছানায় স্থির হয়ে শুয়ে পড়ে আমাদের ডাকল। তারপর বালিশের তলা থেকে একটা গিনী বার করে পেগটিকে দিল।

আমরা সকলে মিলে একসঙ্গে ডিনার খেলাম। তারপরে পেগটিদের ছোট্ট বসার ঘরটাতে আমরা বসলাম। পেগটি আমার ছেলেবেলার গল্পের বইগুলো বার করে দিল। সে যত্ন করে সেগুলো তুলে রেখেছিল। আমি একটা একটা করে বইয়ের পাতাগুলো উল্টে ছবি দেখতে লাগলাম। ছেলেবেলার কথাগুলো মনে পড়ে গেল আমার। ছেলেবেলায় আমাদের বাড়িতে সন্ধ্যার সময় আমি এই সব বই পড়ে পেগটিকে শোনাতাম। তখন কত শান্তি আর আনন্দ ছিল বাড়িতে।

এমন সময় স্টিয়ারফোর্থ এসে পড়লে আমি পেগটির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলাম। পেগটি খুশি হল।

স্টীয়ারফোর্থ আমাকে বলল, তুমি না হয় এখানেই থাক। আমি হোটেলে গিয়ে শোব।

আমি বললাম, না, এতদূর যখন এসেছি তখন মিঃ পেগটিদের নৌকো-বাড়িতে তোমাকে নিয়ে যাব।

আমরা রাত্রি আটটার সময় পেগটির কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, অন্ধকারে সমুদ্রের ধার দিয়ে পথ হাঁটতে লাগলাম। সমুদ্রের গর্জন ক্রমাগত আরও জোরে শোনা যাচ্ছিল। তা শুনে স্টীয়ারফোর্থ বলল, সমুদ্র যেন আমাদের গ্রাস করার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে উঠেছে।

অবশেষে আমরা পেগটিদের বাড়ির গেটের কাছ এসে পড়লাম। আমি স্টীয়ারফোর্থকে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে এস। আমি প্রথমে ওদের ঘরে না ঢুকে বাইরে সন্তর্পনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ওদের কথাবার্তা শুনতে লাগলাম। আমি শুনতে পেলাম ওরা কি একটা কথা নিয়ে খুব হাসাহাসি করছে। মিসেস গামিজ, মিঃ পেগটি, হ্যাম, ছোট্ট এমিলি—সবাই আছে ঘরে।

আমরা ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই যেন আনন্দোল্লাসের এক ঝড় বয়ে গেল ঘরে। 'মাস্টার ডেভি!' বলে চিৎকার করে উঠল সকলে। যে সব সময় বিষণ্ণ হয়ে থাকে সেই মিসেস গামিজও সকলের সঙ্গে হাততালি দিতে থাকে। মিঃ পেগটি আনন্দের উত্তেজনায় কি করবে, কি বলবে তা খুঁজে পায় না। সে বারবার বলতে থাকে, আজকের রাত্রি সবচেয়ে স্মরণীয় রাত্রি আমার জীবনে—দুজন ভদ্রলোক, এমিলি, তুমি যাদের ভদ্রলোক বল, তারা আমাদের এই কুঁড়ে ঘরে এসেছে।

গর্বে ও আনন্দে মুখখানা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তার। হ্যাম বলল, মাস্টার ডেভি কত বড় হয়ে উঠেছে। কত ছেলেবেলায় এসেছিল আমাদের কাছে।

মিঃ পেগটি স্টীয়ারফোর্থকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে তার সঙ্গে করমর্দন করে এমিলিকে বলল, এমিলি দেখ, মাস্টার ডেভির বন্ধু এসেছেন, ওদের দেখাশোনা কর।

স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে আলাপ করল মিঃ পেগটি। সে স্যালেম হাউসে আমার সঙ্গে দেখা

www.banglainternet.com

করতে গেলে স্টীয়ারফোর্থ তাকে সেখানে দেখেছে। মিঃ পেগটি এমিলিকে দেখিয়ে স্টীয়ারফোর্থকে বলল, এই ছোট্ট মেয়েটিকে আমি মানুষ করেছি, এ আমার প্রাণ, আমার সব। আমার ভাইপো হ্যাম ওকে খুব ভালবাসে।

আমি লক্ষ্য করলাম, সরল সাদাসিদে এই গরীব জেলে পরিবারের মধ্যে এসে নিজেকে সহজভাবে মানিয়ে নিয়েছে স্টীয়ারফোর্থ। তা দেখে আমার বড় ভাল লাগল।

এটা তার এক বড় গুণ। স্টীয়ারফোর্থ এক সময় মিঃ পেগটিকে একটা গান গাইতে বলল। পেগটি মোটা গলায় আবেগের সঙ্গে জেলেদের একটা গান গাইল। 'হে ঝড়ো বাতাস, তুমি বয়ে যাও, বয়ে যাও।' গানটা খুবই সুন্দর ভাবে গাইল মিঃ পেগটি। বড় করুণ। আমাদের ভাল লাগল। আমার মনে হতে লাগল যেন এই বাড়িটার চারদিকে সত্যি সত্যিই ঝড়ো বাতাস বইছে, উত্তাল সমুদ্রে কত নৌকো ডুবে যাচ্ছে!

স্টীয়ারফোর্থ সমুদ্র ও জাহাজডুবির গল্প বলল। এমিলি মন দিয়ে শুনল। ক্রমে আমাদের প্রতি লজ্জা আর এড়িয়ে যাবার ভাবটা কেটে গেল তার। কিছু শুকনো মাছ আর বিস্কুট খেয়ে আমরা হালকা করে নৈশভোজন করলাম।

অবশেষে আমরা দুজনে যখন ওদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তখন রাত্রি প্রায় গভীর। ওরা সকলে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। যতদূর সম্ভব আলো দেখাল আমাদের পথে। এমিলিও আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সে আমাকে বলল, সাবধানে যাবে।

স্টীয়ারফোর্থ কিভাবে ওদের সঙ্গে ওদের পরিবেশে মানিয়ে নেবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট ভয় ছিল। কিন্তু স্টীয়ারফোর্থের সুন্দর ব্যবহার আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। আমি ভাবতেই পারিনি সে এমন সহজভাবে ওদের সঙ্গে মিশবে। আমি পথে যেতে যেতে তাকে বললাম, আজ তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও অনেক বেড়ে গেল ভাই। আমি ভাবতাম, তুমি শুধু মুখেই গরীবদের কথা বল। কিন্তু আজ একটি গরীব অশিক্ষিত জেলে পরিবারের বাস্তব জীবনযাত্রার মাঝখানে এসে যেভাবে আন্তরিকতার সঙ্গে তাদের সরল নির্মল আনন্দে অংশগ্রহণ করলে তা সত্যিই অপূর্ব।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, সত্যিই ওরা গরীব তবুও বড় সৎ, বড় সরল প্রকৃতির। বড় স্বাভাবিক, কোন কৃত্রিমতা নেই ডেইজি।

আমরা হোটেলে গিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঐ অঞ্চলে আমি স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে একপক্ষ কাল রয়ে গেলাম। আমরা একসঙ্গেই একই হোটেলে থাকতাম। তবে দিনের বেলায় কয়েক ঘন্টা করে আমাদের ছাড়াছাড়ি হত। স্টীয়ারফোর্থ নৌকায় চড়তে ভালবাসত। তাই সে রোজ কিছুক্ষণ করে মিঃ পেগটির সঙ্গে নৌকোয় করে ঘুরে বেড়াত সমুদ্রে। আমি কিন্তু এ ব্যাপারে ছিলাম একেবারে উদাসীন। সমুদ্রের প্রতি আমার যেন একটা ভয় ছিল। তাই ওরা যখন নৌকোয় চেপে বেড়াত আমি তখন কূলে বসে থাকতাম। মাঝে মাঝে পেগটির বাড়িতে চলে যেতাম। কিভাবে সে সারাদিন অক্লান্তভাবে বার্কিসের সেবা করে চলে তা আমি দেখতাম। জ্যোৎস্নারাত্রিতে প্রায় সারারাত মিঃ পেগটির সঙ্গে নৌকোয় চড়ে বেড়াত স্টীয়ারফোর্থ। বুঝতাম, তার অশান্ত, উদ্ধত ও বিদ্রোহী প্রকৃতি যেন

শ্রম আর প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রাম করতে ভালবাসে। সে তাই এক জায়গায় বেশীক্ষণ চুপ করে বসে থাকতে পারে না।

আমি মাঝে মাঝে আমার জন্মভূমি ও শৈশবের স্মৃতিবিজড়িত ব্লান্ডারস্টোন গ্রামে চলে যেতাম। আমার ছেলেবেলার পরিচিত ও প্রিয় দৃশ্য, গাছপালা, পথঘাটগুলো দেখতে যেতাম। স্টীয়ারফোর্থকে একবার সেখানে নিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে আর সে সেখানে যেতে চায়নি।

আমি কিন্তু প্রায়দিনই প্রাতরাশের পর একা একা আমার শৈশবের লীলাভূমি ব্লান্ডারস্টোনে চলে যেতাম। আমাদের বাড়ির উঠোনটায় ঘুরে ঘুরে সব দেখতাম। আমাদের বাড়িটায় তখন থাকত এক গরীব আধপাগলা ভদ্রলোক। সে শুধু উপরের একটা ঘরেই থাকত। বাড়ির অন্যান্য সব ঘরগুলো বন্ধ। সব জানালা বন্ধ। বাগানের গাছগুলো সব আছে। কিন্তু গোটা বাগানটা শুকনো পাতায় ভরা, একবারে অপরিচ্ছন্ন। যে দুটি সমাধির মধ্যে আমার পিতা-মাতা শায়িত ছিলেন সেই সমাধিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আমার সুদূর অতীত শৈশবের কত কথা মনে পড়ে যেত। মনে হত, আমি যেন আমার জীবন্ত মার কাছেই রয়েছি। আমি যে ঘরটায় থাকতাম আধপাগলা লোকটি সেই ঘরেই থাকে। আমি যে ছোট জানালাটা দিয়ে প্রথম সকালের আলোয় আলোকিত এলম গাছের তলায় সমাধিভূমির দিকে তাকিয়ে থাকতাম, লোকটি সেই জানালা দিয়ে বাইরে সেইদিকেই তাকিয়ে বসে থাকে। কিন্তু আমি তখন যে কথা ভাবতাম, সেও কি সেইকথাই ভাবে?

আমাদের পুরনো প্রতিবেশী মিঃ ও মিসেস গ্রেপারেরা দক্ষিণ আমেরিকায় চলে গেছেন। তাঁদের বাড়িটা পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। ছাদের জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ে বাইরের দেওয়ালগুলোতে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে। ডাক্তার চিলীপ আবার এক লম্বা টিকলো নাকওয়ালা মেয়েকে বিয়ে করেছেন। তাঁদের অনেকগুলো ছেলেমেয়ে হয়েছে।

আনন্দ ও বিষাদের এক মিশ্রিত অনুভূতির দোলায় দুলতে দুলতে আমার জন্মভূমির চারপাশে এইভাবে একা একা ঘুরে বেড়াতাম আমি প্রায় সারাটা দিন। অবশেষে বিকেলের লীন হয়ে আসা স্তিমিত আলো আমার ফেরার কথা মনে করিয়ে দিত। আমি তখন ব্যস্ত হয়ে ইয়ারমাউথের হোটেলে ফিরে যেতাম।

সেদিন সন্ধ্যার সময় ব্লান্ডারস্টোনের থেকে ফিরে দেখলাম স্টীয়ারফোর্থ মিঃ পেগটির বাড়িতে যখন কেউ ছিল না তখন একা একা আগুনের ধারে চিন্তামগ্ন অবস্থায় বসে আছে। মনে হলো জানালা দিয়ে সামনের বালুকাময় জায়গাটির দিকে সে তাকিয়ে আছে। সে চিন্তার মধ্যে এমনভাবে ডুবে ছিল যে আমার পায়ের শব্দও শুনতে পেল না।

অবশেষে আমি তার ঘাড়ে হাত রাখতে সে মুখ তুলে বলল, এতক্ষণ কোথায় ছিলে ডেইজি?

আমি বললাম, আমি প্রতিদিনকার মত ঘুরতে বেড়িয়েছিলাম। আজ আমার জন্মভূমি ব্লান্ডারস্টোনকে বিদায় জানিয়ে এলাম।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, আমি এতক্ষণ একা একা বসে ভাবছিলাম, আমি একদিন লেখাপড়া শিখে ভুল করেছি। আমি আমার জীবনকে ঠিকমত চালাতে পারিনি। আমি যদি লেখাপড়া না শিখে মিঃ পেগটির মত জেলে হয়ে সমুদ্রে নৌকোয় করে মাছ ধরে বেড়াতাম তাহলে আমি

জীবনকে এখনকার চেয়ে অনেক বেশী করে উপভোগ করতে পারতাম।

আরো কিছুদিন আমরা দুজনে সেই হোটেলটায় থেকে আশপাশের সারা অঞ্চলটায় ঘুরে বেড়ালাম। কথায় কথায় স্টীয়ারফোর্থ আমাকে ভবিষ্যতে এক বড় দরের সাংবাদিক হবার পরামর্শ দিল।

অবশেষে আমার দেশভ্রমণের পর্ব শেষ হলো। ফেরার দিন এসে গেল। আমার যাবার আগে স্টীয়ারফোর্থ বাড়ি চলে গেল। তারপর আমি লণ্ডনে বন ফীণ্ড হোটেলে গাড়িতে করে চলে গেলাম। সেখানে পিসিমা আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

পিসিমা আমাকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরে বললেন আজ যদি আমার মা বেঁচে থাকতেন, তাহলে ছোট্ট দুষ্টু ছেলেটার জন্য তাঁর চোখ জলে ভাসত।

পিসির সঙ্গে শুধু তাঁর ঝি জেনেট এসেছে। মিঃ ডিক আসেননি।

পিসিমা বললেন, সেইজন্যই তো এখানে আসার পর থেকে ভাবছি। ডিক-এর পরিবর্তে জেনেটকে রেখে এলে ভাল করতাম। ডিক গাধা তাড়াতে পারবে না। গাধাগুলো বাগানে ঢুকে সব গাছ নষ্ট করে দেবে। ডিকের কোন দৃঢ়তা নেই।

এইসব কথার পর শেষে পিসিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে, তোমার ভবিষ্যতের পরিকল্পনাটা সম্বন্ধে কি কিছু ভেবেছ?

আমি বললাম, এ নিয়ে স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে অনেক কথা বলেছি। সে আমাকে সাংবাদিক হতে বলেছে। এই পেশাটাই আমার খুব ভাল লাগে।

পিসি বললেন, সেটা তো আনন্দের কথা। ভাল কথা।

আমি বললাম, তা তো বটে। কিন্তু আমাকে এত খরচ কে দেবে?

একটু থেমে আমি আরও বললাম, পিসিমা, তুমি ইতিমধ্যেই আমার পড়াশুনোর ব্যাপারে অনেক খরচ করেছ। তাছাড়া যখন যা কিছু চেয়েছি, উদার অকৃপন হস্তে তা দিয়েছ। এখন আমি দেখব এর থেকে কম ব্যয়বহুল কোন পেশা গ্রহণ করতে পারি কিনা। আমার মা জীবিত নেই, এখন তুমিই আমার মা। কিন্তু তুমি কি অত টাকা খরচ করতে পারবে, না সেটা ঠিক হবে?

পিসিমা তখন একটা টোস্ট খাচ্ছিলেন। সেটা খাওয়া হয়ে গেলে তিনি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ট্রট, বাছা আমার, জীবনে যদি আমার কোন উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে তা হলো তোমাকে সৎ, জ্ঞানী ও জীবনে সুখী করে তোলা। আমি এ বিষয়ে বদ্ধ পরিকর এবং ডিকও আমার সঙ্গে একমত। অবশ্য এ বিষয়ে ডিক-এর মতটা আমায় নিতে হবে। লোকটার বিচক্ষণতা অদ্ভুত। লোকটাকে দেখতে ঐ রকম বোকার মত মনে হলেও ওর মধ্যে যে কত জ্ঞানবুদ্ধি আছে তা শুধু একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জানে না।

এরপর পিসিমা তাঁর অতীত জীবনের কিছু কথা বললেন, তিনি বললেন, ট্রট, মানুষের অতীত জীবনকে স্মরণ করা বৃথা, যদি সে অতীতের পর বর্তমান জীবনে কোন কার্যকারিতা না থাকে। তোমার হতভাগ্য বাবার সঙ্গে আমার হয়ত আরও ভালভাবে চলা উচিত ছিল। তোমার মা আমার আশা মত কন্যা সন্তান প্রসব না করলেও হয়ত তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত ছিল।

তারপর যখন তুমি ছেঁড়া মলিন পোশাক পরে একটি অসহায় বালকরূপে আমার কাছে এলে, তখন থেকে তুমিই হয়ে উঠলে আমার সব। আমার জীবনের একমাত্র আনন্দ আর গর্বের বস্তু। তোমাকে পোষ্য রূপে গ্রহণ করে, তোমাকে ভালবেসে তোমার জীবনকে সুন্দর ও সুখী করে গড়ে তুলে আমি যেন আমার জীবনের সব ভুলের খেসারৎ দিতে চাইলাম। আমার যৌবনকালে যে সুখ আমি পাইনি, তোমার মধ্যে দিয়ে সে সুখ উপভোগ করতে চাইলাম। সুতরাং আমার যা কিছু আছে, তা আমার নিজের জন্য নয়। তার সবটুকুই আমি তোমার জন্যই খরচ করতে চাই।

আজ প্রথম আমি আমার পিসিকে তাঁর অতীত জীবন নিয়ে কথা বলতে শুনলাম।

কিন্তু তাঁর সেই অতীতচারণার মধ্যেও একটা সংযত ভাব ছিল। তাঁর অসহায় আবেগ ও অবদামিত অনুভূতিগুলিকে প্রকাশ করার ক্ষমতা কত সংযত! দৃঢ়তার সঙ্গে উদারতার মিশ্রণে গড়া তাঁর চরিত্র, সে চরিত্রের মধ্যে এতদিন আমরা এই গুণদুটোকেই বড় করে দেখে আসছিলাম। আজ তাঁর মধ্যে আর একটা গুণ আবিষ্কার করলাম আমি। তাঁর এ গুণ হলো তাঁর মহানুভবতা—এক বিরল মহানুভবতা। পিসিমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল।

পিসিমা বললেন, আগামীকাল সকালে তোমাকে নিয়ে প্রাতরাশের পর এ বিষয়ে কথা বলতে যাব। এখনকার মত একটা চুম্বন দাও ট্রট।

সেই হোটেলেই একই তলায় দুটো ঘরে আমি আর আমার পিসিমা রাতটা কাটালাম।

পরদিন প্রাতরাশের পর ডক্টরস্ ওফ্-এর অন্তর্গত স্পেনলো এ্যাণ্ড জর্কিন্স কোম্পানিতে যাবার জন্য রওনা হলাম। পিসিমা তাঁর টাকার থলেটা আমার হাতে দিয়ে ধরতে বললেন। আমি দেখলাম তাতে দশটা গিনী আর কিছু রুপোর মুদ্রা আছে।

আমরা ফ্লীট স্ট্রীটে একটা ভাল দোকানে এটা সেটা দেখার পর পায়ে হেঁটে লকগেট ও বেস্ট সব চার্চইয়ার্ড এর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম।

এমন সময় দেখলাম একটা ভিখারির মত লোক আমার পিসিমার কাছ ঘেঁষে যাবার চেষ্টা করছে। আমার মনে হলো তিনি ভয় পেয়ে গেছেন। আমি তাঁকে বললাম, কিছু ভেবনা পিসিমা। হয়ত একটা ভিখিরি কিছু চায়। তুমি একটা দোকানে গিয়ে দাঁড়াও। আমি দেখছি।

আমাকে অনুরোধ করে বললেন, তুমি ওকে কিছু বলো না ট্রট। তুমি ওকে চেন না। তুমি আমার জন্য একটা গাড়ি ডেকে দাও, আমি একটু ঘুরে আসছি। তুমি এখানে অপেক্ষা কর।

আমি আশ্চর্য হয়ে তাঁর জন্য এটা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে দিলাম।

আমি আশ্চর্য হয়ে দেখলাম পিসিমা সেই লোকটাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে কোথায় চলে গেলেন। আমি কবরখানার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে পিসিকে নিয়ে গাড়িটা ফিরে এল। আমার মনে হলো মিঃ ডিক এর আগে আমাকে যে লোকটার কথা বলেছিলেন, যে লোকটা মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় এসে তাঁর কাছ থেকে কিছু করে টাকা নিয়ে যায়, সেই লোকটাই একটু আগে এসেছিল। হয়ত লোকটা ডিকের আত্মীয় এবং সে ডিককে নিয়ে যেতে চায়। কিন্তু আমার পিসি মিঃ ডিকের প্রতি

করুণাবশতঃ তাঁকে কাছে রেখে দিতে চায় বলেই হয়ত লোকটাকে মাঝে মাঝে কিছু টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ রাখেন।

পিসিমা গাড়িতে বসে থেকেই আমাকে ইশারা করে গাড়িতে উঠতে বললেন। আমি গাড়িতে উঠে বসলেই আমাদের গাড়ি গন্তব্যস্থলের দিকে চলল।

বড় রাস্তা থেকে একটু ভিতরেই ডক্তরস্ ওফ্। তার মধ্যেই স্পেনলো এ্যাণ্ড জর্কিনস নামে এক আইন-ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি। শহরের কোন শব্দ এখানে আসে না। অফিস ঘরের মধ্যে চারজন লোক লেখালেখির কাজ করছিল। আর একজন রোগা রোগা চেহারার লোক বসেছিল চেয়ারে। সেই ভদ্রলোক উঠে আমাকে, পিসিকে অভিবাদন জানিয়ে বলল, মিঃ স্পেনলো এখন কোর্টে আছেন। তাকে এখনই ডেকে পাঠাচ্ছি।

ইতিমধ্যে ঘরের মধ্যে আসবাবপত্রগুলো চোখ বুলিয়ে দেখে নিলাম। চেয়ার টেবিল ছাড়া ঘরের মধ্যে এখানে সেখানে কাগজের ফাইলের স্তূপ জমে আছে। এক একটি মামলার পিছনে আছে এক একটা ইতিহাস। সেই সব ইতিহাস ঐ সব কাগজে লেখা আছে।

কিছুক্ষণ পরেই মিঃ স্পেনলো এসে গেলেন। কালো গাউনে গোটা গাটা ঢাকা। মাথায় সাদা চুল, মুখের দুপাশে গালপাট্টা। পায়ে কালো চকচকে বুট। সোনার চেনওয়ালা একটা সোনার ঘড়ি পকেটে।

আবার পিসিমা মিঃ স্পেনলোর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি সৌজন্য সহকারে আমাকে অর্ভ্যথনা জানিয়ে বললেন, তাহলে মিঃ কপারফিল্ড, তুমি আমাদের ব্যবসায় আসছ। এর আগে একদিন মিস ট্রটউডের সঙ্গে এনিয়ে কথা হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, তাঁর এক ভাইপো আছে, তাকে তিনি জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। আজ তাঁর সেই ভাইপোকে সামনে দেখছি। আমি তাঁকে বলেছিলাম, এখানে এখন একটা পদ খালি আছে।

আমি মাথা নত করে আমার স্বীকৃতি জানালাম। আমি তাঁকে আরও জানালাম যে আমি এ ব্যবসায় যোগ দিতে চাই। আমার খুবই ইচ্ছা আছে। তবে শিখতে হবে।

মিঃ স্পেনলো বললেন, একমাসের জন্য শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকতে হবে।

আমি বললাম, মোট প্রিমিয়াম কি এক হাজার পাউণ্ড দিতে হবে?

উনি বললেন, হ্যাঁ স্ট্যাম্প সমেত মোট এক হাজার পাউণ্ড। এ বিষয়ে কিছু করার উপায় নেই। আমার একজন অংশীদার আছেন, তিনি হলেন মিঃ জর্কিনস্। সব বিষয়ে তাঁর মতামত নিয়ে কাজ করতে হবে তো। তিনি বলেন, এসব কাজে এক হাজার পাউণ্ডটা খুবই কম।

আমি আমার পিসিমার খরচ কিছুটা বাঁচাবার জন্য আমি একটা কথা বললাম। বলতে লজ্জা হওয়া সত্ত্বেও বললাম—আচ্ছা এখানে কি এমন কোন রীতি নেই যাতে কোন আইনের কেরানী এই আইন ব্যবসার যত কিছু শিখে নিয়ে কাজের লোক হয়ে ওঠে? তাহলে তাকে কিছু ছাড় দেওয়া হয়?

মিঃ স্পেনলো বললেন, না, এমন কোন কথা আমি দিতে পারব না। এ ব্যাপারে মিঃ জর্কিনস্ খুবই অনমনীয়।

আমি বুঝতে পারলাম, স্পেনলো মানুষটি প্রাণখোলা এবং উদার প্রকৃতির, জর্কিনস মানুষটি তেমনি একরোখা ও অনমনীয় এবং টাকা পয়সার ব্যাপারে খুবই সর্তক, সচেতন ও আপসহীন।

কেরানীদের মাইনে ও মক্কেলদের বিল মেটানোর ব্যাপারে জর্কিনস বিশেষ কঠোরতার সঙ্গেই তাঁর দায়িত্ব পালন করেন। বুঝলাম, মিঃ স্পেনলোর উদারতা আর মিঃ জর্কিনস এর অনমনীয় কঠোরতার যুগলমিলনেই এঁদের এই আইনব্যবসাটা ভালভাবে চলছে এবং অন্যান্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও তাঁদের এই নীতিটা আদর্শস্থানীয় ও অনুকরণযোগ্য হয়ে উঠছে।

অবশেষে সব কিছু ঠিক হয়ে গেল আমার ব্যাপারটায়। প্রথমে আমাকে একমাস কাজ শেখার জন্য শিক্ষানবীশ হিসাবে থাকতে হবে। একাজ আমি আমার ইচ্ছামত শুরু করতে পারি।

আমরা সবকিছু ঠিক করে অফিস থেকে বেরিয়ে এলাম। বড় রাস্তায় এসে আমাকে পিসিমা তাঁর ব্যাগ থেকে একটা বিজ্ঞাপনের কাগজ ধরতে বললেন। কাগজটা একটা খবরের কাগজ থেকে কেটে রাখা হয়েছিল। তাতে জানানো হয়েছে বাতি হুইল স্ট্রীটের অন্তর্ত অ্যাডেনফিতে উপর তলায় কিছু ঘর আছে। ভাড়া দেওয়া হবে। এক একটি ঘরে একজন করে ভদ্রলোক একা থাকতে পারবেন।

আমার পিসিমা আমাকে নিয়ে সোজা আমার একমাস থাকার জন্য একটা ঘর ভাড়া করতে অ্যাডেনফিতে চলে গেলেন। মিঃ ক্রুপ নামে একজন ভদ্রলোক ঐ সব ঘরের মালিক। আমরা গিয়েবেল বাজাতেই একজন বয়স্কা মহিলা দরজা খুলে দিলেন। তিনিই মিসেস ক্রুপ। তিনি আমাদের উপরতলায় নিয়ে গিয়ে একটা ঘরে সোফার উপর বসতে বললেন। ঘর ভাড়ার বিষয়ে চুক্তিসম্বন্ধে কথা বলার জন্য আমাকে সেখানে রেখে তাঁরা আর একটা ঘরে চলে গেলেন। আমি জায়গাটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। ঘরের পরিবেশ ও ঘরগুলোর অবস্থা দেখে খুবই পছন্দ হয়ে গেল আমার। বুঝলাম, এ সব ঘর অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকদের বাসের জন্যই তৈরী করা হয়েছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই চুক্তি করে ওঁরা ফিরে এলেন। একমাসের জন্যই ঘরটা প্রথমে ভাড়া নেওয়া হলো, কিন্তু যদি দরকার হয় একবছরও ভাড়া নিয়ে আমি থাকতে পারব। এরপর আমার জন্য একটা ঘর নির্দিষ্ট করে দিলেন মিসেস ক্রুপ।

আমার পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, এই আসবাবপত্রগুলো কার?

মিসেস ক্রুপ বললেন, আমার ভাড়াটের। তিনি মারা গেছেন।

পিসিমা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কি রোগে মারা গেছেন উনি?

মিসেস ক্রুপ বললেন, অত্যধিক মদ্যপান আর ধুমপান।

পিসিমা আমাকে বললেন, তাহলে ঠিক আছে, এটা কোন ছোঁয়াচে রোগ নয়।

ঠিক হলো আমি আজ থেকেই থাকতে পারি। মিসেস ক্রুপ আমার রান্না ও খাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

এইভাবে আমার কাজ শেখার জন্য লণ্ডন শহরে আমার থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত করে বাইরে এসে পিসিমা আমায় বারবার উপদেশ দিলেন, আমি যেন জীবনে স্বাবলম্বী ও দৃঢ়চরিত্রের মানষ হয়ে উঠতে পারি। আমি যেন সব দিকে ভাল হয়ে উঠতে পারি—এটাই তিনি চান।

আমি বুঝলাম আমার পিসিমা এখানে আর থাকতে চান না, বাড়িতে ফেরার জন্য বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন তিনি। আমার দুঃখ হলো এর মধ্যে স্টীয়ারফোর্থ এল না। পিসিমার সঙ্গে

তার পরিচয় করিয়ে দিতে পারতাম। আমার কত ইচ্ছা ছিল এটা।

যাইহোক, শেষে নিশ্চিন্ত হয়ে পিসিমা ছেলেটাকে সঙ্গে নিয়ে ডোভার কোচে উঠে বসলেন।

আমি অ্যাডেনফিতে চলে গেলাম। উপরতলায় উঠতে উঠতে সহসা আমার অতীত জীবনের কথা মনে পড়ে গেল। একদিন আমি লণ্ডন শহরের পথে পথে সমাজের নীচু তলার ছেলেদের মত ঘুরে বেড়িয়েছি। আজ আমি সত্যিই সমাজের এক উঁচুতলার মানুষ। আমার জীবনের এই সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

২০

সদর দরজায় বেল টিপতেই মিসেস ক্রুপ দরজা খুলে দিলেন। আমি একা একা সেই ঘরে স্বাধীনভাবে থাকতে লাগলাম। সকালের দিকটা আমার সত্যিই খুব ভাল লাগত। সূর্য উঠলে আমার জীবনটাও যেন এক অভাবিত অব্যক্ত আশায় উজ্জ্বল হয়ে উঠত। কিন্তু যখন সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ত, দিনের আলো নিভে আসত একেবারে। তখন আবার আমার মনটা কেমন বিষাদে ম্লান হয়ে উঠত। সন্ধ্যায় বাড়ির আলো জ্বললেই একা একা থাকতে ভাল লাগত না। অ্যাগনিসের কথা মনে পড়ে যেত। অন্ততঃ একজনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা হত। মিসেস ক্রুপ তো সব সময়ই কাজে ব্যস্ত। কথা বলার জন্য লোক না পেয়ে সন্ধ্যার সময়টা কাটাতে সত্যিই বড় কষ্ট হত আমার। নিঃসঙ্গতায় মনটা হাঁফিয়ে উঠত আমার।

দুপুরবেলায় অফিসে কাজের মধ্যে মনটা ডুবে থাকত। তখন সময়টা কোন দিক দিয়ে যে কেটে যেত বুঝতে পারতাম না। অফিসের কাজ সেরে আমার বাসা-ঘরে ঢুকলেই আবার সেই একটানা নিঃসঙ্গতা। সেই একাকীত্ব। এইভাবে পর পর তিনটে দিন কেটে গেল। স্টীয়ারফোর্থ তবু একবারও এল না। আমার মনে হলো সে হয়ত অসুস্থ। তাই আসতে পারেনি। ইতিমধ্যে অ্যাগনিসকে আমি একটা লম্বা চিঠি লিখে পাঠিয়েছি। ওদের ঘরে যদি আমার কোন পোশাক বা বইপত্র থাকে তাহলে যেটা যেন কারো মারফৎ পাঠিয়ে দেয়।

তিনদিন পর আমি একদিন আমার অফিস থেকে বেরিয়ে সোজা হাইগেটে স্টীয়ারফোর্থদের বাড়িতে চলে গেলাম। তার মা মিসেস স্টিয়ারফোর্থ আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন। তিনি বললেন, স্টীয়ারফোর্থ এখন বাড়িতে নেই। সে তার এক অক্সফোর্ডের বন্ধুর সঙ্গে আলবানস্‌তে আর এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গেছে। একথা শুনে আমার মোটেই ভাল লাগল না। স্টীয়ারফোর্থকে আমি এমনই ভালবাসতাম যে, মনে হত ও শুধু আমার একার বন্ধু। তাই ওর অক্সফোর্ডের বন্ধুদের প্রতি ঈর্ষা হচ্ছিল আমার।

আমি চলে আসতে চাইছিলাম। কিন্তু মিসেস স্টীয়ারফোর্থ কিছুতেই ছাড়লেন না। ডিনার খেয়ে যাবার জন্য বারবার অনুরোধ করলেন। অগত্যা আমি রয়ে গেলাম। আমি কথা প্রসঙ্গে তাঁকে বললাম ইয়ারমাউথে আমরা বেড়াতে গেলে ওখানকার সকলেই স্টীয়ারফোর্থকে ভালবাসত। যেখানে সে দিনগুলো ভালোই কাটিয়েছে।

মিস ডার্টল সর্বক্ষণ আমাদের কথা আগ্রহের সঙ্গে শুনছিল। মিস ডার্টলকে সত্যিই আমার বেশ ভাল লাগছিল। আমার কেবলি মনে হচ্ছিল এই মিস ডার্টলকে যদি সন্ধ্যার সময় আমার অ্যাডেনফির ঘরে পেতাম তাহলে দুজনে গল্প করে খুবই আনন্দ পেতাম।

সন্ধ্যার সময় আমি আমার বাসাঘরে ফিরে গেলাম। পরদিন সকালে অফিসে যাওয়ার আগে আমি যখন মিসেস ক্রুপের দেওয়া কফি আর রোল খাচ্ছিলাম, তখন আমার ফিরে পাওয়া আনন্দের বস্তু হিসাবে হঠাৎ স্টীয়ারফোর্থ এসে হাজির হলো। আমি আবেগ আর আনন্দের সঙ্গে বলে উঠলাম, হে আমার প্রিয় স্টীয়ারফোর্থ, আমি তো ভেবেছিলাম জীবনে তোমার সঙ্গে আর আমার দেখাই হবে না।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, আমি বাড়ি যাওয়ার পরদিন সকালেই ওরা আমায় জোর করে ধরে নিয়ে যায়। তাহলে ডেইজি, তুমি তো এখানে চিরকুমারের মত ভালই আছ। শহরে এলে আমার একটা থাকার জায়গা হলো।

আমি বললাম, আমি তোমার জন্য প্রাতরাশের ব্যবস্থা করি। মিসেস ক্রুপকে বললেই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

আমার থাকার জায়গাটা ভাল বলে ঘুরিয়ে দেখালাম তাকে। স্টীয়ারফোর্থ কিন্তু প্রাতরাশ খেতে চাইল না। বলল, কোভেন্টগার্ডে নে দিয়াদা হোটেলে একজন বন্ধু আসার জন্য অপেক্ষা করছে। সেখানেই আমাকে প্রাতরাশ খেতে হবে।

আমি বললাম, তাহলে বল, ডিনার খেতে আসবে?

স্টীয়ারফোর্থ বলল, তুমিই এস না, আমাদের সঙ্গে ডিনার খাবে। সেটাই ভাল হবে।

কিন্তু আমার পীড়াপীড়িতে স্টীয়ারফোর্থ আমার বাসায় আসতে রাজী হল পাঁচটার সময়।

স্টীয়ারফোর্থ চলে গেলে আমি মিসেস ক্রুপকে সন্ধ্যের সময় চার জনের মত ডিনারের আয়োজন করতে বললাম। কিন্তু তিনি বললেন, তাঁর একার দ্বারা তা সম্ভব হবে না। আর একজন লোককে সঙ্গে নিতে হবে।

আমি অফিস থেকে ফিরে এলে ওরাও এসে গেল। আমার কথামত আয়োজন দেখে স্টীয়ারফোর্থ আমার খুব প্রশংসা করল। তাঁর সঙ্গে তার দুজন বন্ধু ছিল। একজনের নাম গ্রেজার আর একজনের নাম মারখল।

ডিনার খাওয়ার পর আমরা মনের সুখে মদ্যপান করলাম। একজন বলল, চল কপারফিল্ড, থিয়েটারে যাওয়া যাক।

থিয়েটারে যাবার আগে আমি স্টীয়ারফোর্থকে বললাম, তোমরা এমনি করে মাঝে মাঝে পাঁচটার সময় এখানে ডিনার খেতে আসবে। তারপর সন্ধ্যে পর্যন্ত গল্প করা যাবে। সন্ধ্যেটা আমার তাহলে ভালভাবেই কেটে যাবে ভাই।

আমরা একসঙ্গে চারজনে মিলে থিয়েটারে গিয়ে প্রবেশ করলাম। থিয়েটার দেখতে দেখতে আমি একসময় আমার সামনের সীটে অ্যাগনিসকে দেখতে পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার পাশে একজন ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁকে আমি চিনি না। আমি তখন আশ্চর্য হয়ে অ্যাগনিস, অ্যাগনিস বলে চিৎকার করে উঠলাম। অ্যাগনিস চাপা গলায় বলল, এখন চুপ কর। সকলের অসুবিধা হচ্ছে—এখন চুপ করে সামনের দিকে তাকাও।

থিয়েটার শেষ হলে বাইরে এসে আমি স্টীয়ারফোর্থকে বললাম, অ্যাগনিস আমার বোন হয়। অ্যাগনিস কিছুক্ষণ মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করে হয়ত বুঝল আমি বেশী মদ্যপান করে

ফেলেছি। তাই সে চাপা গলায় বলল, আমি আশা করি আমি যা বলব, তুমি তাই করবে। আমি বলছি তুমি এখন বাড়ি চলে যাও এবং তোমার বন্ধুদের বল, তারা তোমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে।

আমি কিছুটা লজ্জিত হয়ে আর কোন কথা না বলে সেখান থেকে চলে গেলাম। স্টীয়ারফোর্থ ও তার বন্ধুদের কাছে বিদায় নিয়ে আমি আমার বাসায় ফিরে এলাম। সারারাত ঘুমের মাঝে মাঝে আমার শুধু অ্যাগনিসের কথাগুলো মনে পড়ছিল। লজ্জা, অন্তর্বেদনা ও অনুশোচনার অন্ত ছিল না আমার মনে। পরদিন সকালেও আমি সে কথা ভুলতে পারলাম না।

২১

পরদিন সকালেও আমি সেই কথাটাই ভাবছিলাম। ভাবনা ও অনুশোচনার অন্ত ছিল না আমার। হঠাৎ একজন লোক এসে অ্যাগনিসের একটা চিঠি দিয়ে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে চিঠিটা নিয়ে খুললাম। পরে দেখলাম ভয়ের কিছু নেই।

অ্যাগনিস অল্প কয়েকটি কথায় লিখেছে, প্রিয় ট্রটউড, আমি এখন হলবর্ণের অন্তর্গত এলিপ্লেনে বাবার এক এজেন্ট মিঃ ওয়াটার ক্রুকের বাড়িতে রয়েছি। আজ কি তুমি একবার এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে? তোমার সুবিধামত সময় নির্দিষ্ট করে পত্রপাঠ এই লোকটিকে জানাবে।

আমার উত্তর নিয়ে যাবার জন্য লোকটি দাঁড়িয়ে ছিল।

আমি উত্তর দিতে গিয়ে পাগলের মত একের পর এক কয়েকটি চিঠি লিখলাম আবার তা ছিঁড়েও ফেললাম। অবশেষে আমি অল্প কথায় জানিয়ে দিলাম আমি বেলা চারটের সময় যাব।

নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে আমি হলবর্ণে গিয়ে পৌঁছালাম।

ওয়াটার ক্রুকের প্রতিষ্ঠানে তাঁর বাড়ির নীচের তলায় অফিসের কাজকর্ম হয়, আর উপরতলায় তাঁরা নিজেরা থাকেন। উপরতলায় এক সাজানো বসার ঘরে অ্যাগনিস একা বসেছিল। তার চোখমুখের শান্তভাব দেখে আমার ছাত্রজীবনের সেই ক্যান্টারবেরির দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। লজ্জা আর অনুশোচনার আবেগে আর আমি নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। আমি কেঁদে ফেললাম। আমি বুঝতে পারলাম না, কাজটা বিজ্ঞজনোচিত হলো না বলেই মনে হলো।

আমি বললাম, তুমি না হয়ে যদি অন্য কেউ হত, তাহলে আমি তা মোটেই গ্রাহ্য করতাম না। কিন্তু সেদিন যে অবস্থায় আমায় দেখেছিলে, তাতে আমার ইচ্ছা হচ্ছিল আমার মৃত্যু হলে ভাল হয়। এ মুখ যেন তোমাকে আর না দেখাতে হয়।

অ্যাগনিস এবার তার হাতটা আমার হাতের উপর রাখল নীরবে। তারপর সে বলল, মনে দুঃখ করো না ট্রটউড। তুমি যদি আমাকে বিশ্বাস করতে না পার তবে কাকে বিশ্বাস করবে?

তার হাতের স্পর্শের মধ্যে এক মধুর বন্ধুত্ব আর নিবিড় সম্প্রীতির ভাব ছিল। আমি তার হাতটা মুখে তুলে ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ না করে পারলাম না।

তারপর আমি বললাম, হে অ্যাগনিস, তুমি আমার সেই সদাশয় দেবদূত।

অ্যাগনিস হাসল। সে বলল, আমি সত্যিই যদি তোমার সৎ দেবদূত হই ট্রটউড, তাহলে

তোমাকে বাঁচাতে অসৎ দেবদূতের প্রতি আরো কড়াভাবে নজর রাখব। তোমাকে অসৎ সংস্পর্শ থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করব আমি।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, হে আমার প্রিয় অ্যাগনিস, তুমি কি স্টীয়ারফোর্থের কথা বলছ?

অ্যাগনিস শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ আমি তাই বলছি।

আমি মৃদু আপত্তির সঙ্গে বললাম, তাহলে তুমি তার প্রতি অন্যায় করছ অ্যাগনিস। সে আমার বা কারোরই খারাপ দেবদূত নয়। সে আমার বন্ধু। অভিভাবক ও একজন পথ নির্দেশক। সেদিন তুমি আমার সঙ্গে ঐ অবস্থায় তাকে দেখে যদি তার চরিত্রের বিচার কর তাহলে তোমার মত মেয়ের পক্ষে সেটা ভুল করা হবে না কি?

অ্যাগনিস বলল, আমি সেদিন তোমার সঙ্গে ওকে ওই অবস্থায় দেখে বিচার করছি না।

আমি তাকে বললাম, তবে কিসের থেকে?

অ্যাগনিস বলল, অনেকগুলো জিনিষ থেকে। যেগুলো তুচ্ছ হলেও একসঙ্গে মিলে বড় হয়ে ওঠে। তার সম্বন্ধে তুমি যা বলেছ আর তোমার উপর সে যে প্রভাব বিস্তার করেছে আমি তার থেকেই ওর বিচার করছি।

অ্যাগনিস কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বলতে লাগল, আমার মত যে মেয়ে সব সময় বাড়িতে একা একা থাকে, যার বাইরের জগৎ সম্বন্ধে কোন অভিজ্ঞতাই নেই, লোকচরিত্র সম্বন্ধে সে এত কথা বলে কি করে? এটা আশ্চর্যজনক মনে হতে পারে। কিন্তু তোমার সঙ্গে এক বাড়িতে বেশ কিছুদিন বাস করার অভিজ্ঞতা আছে বলেই আমি তোমার সম্বন্ধে এইসব কথা বলতে পারি এবং দেখা যাবে সে সব কথা সত্য হচ্ছে। আমি আবার তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি, ও হচ্ছে তোমার বিপজ্জনক বন্ধু।

স্টীয়ারফোর্থের ভাবমূর্তিটা আমার মনের মধ্যে কিছুটা ম্লান হয়ে পড়লেও আমি অ্যাগনিসের কথাটা পুরোপুরি মেনে নিতে পারলাম না।

অ্যাগনিস বলল, জানি যে বিশ্বাস তোমার মনে একবার বদ্ধমূল হয়েছে, তা হঠাৎ একেবারে উপড়ে ফেলা সম্ভব হবে না তোমার পক্ষে। তাড়াতাড়ি এ কাজ করতে যাবে না। আমি চাই আমি যে কথা বললাম সেটা মনে রাখবে, সেটা নিজে চিন্তা করবে। আমি যা বললাম তার জন্য ক্ষমা করবে আমায়।

আমি বললাম, আমি তোমাকে সেইদিন ক্ষমা করব যেদিন তুমি স্টীয়ারফোর্থের প্রতি সুবিচার করবে। সেদিন তুমি আমার মতই তাকে হয়ত পছন্দ করবে।

এরপর আমি সে রাতের ঘটনার পূর্ণ বিবরণ দিলাম। বললাম, সেদিন মদ্যপান করে আমার যে অবস্থা হয়েছিল, সেই অবস্থায় স্টীয়ারফোর্থ আমায় ধরে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে প্রকৃত বন্ধুর কাজই করেছে।

অ্যাগনিস বলল, মোট কথা আমি বলতে চাই, তুমি শুধু তোমার বিপদের কথাই আমাকে জানাবে না, তুমি যখন কারো প্রেমে পড়বে সে কথাও আমাকে অকুণ্ঠভাবে জানাবে। আচ্ছা ট্রটউড, মিস লার্কিনের পর আবার কে তার জায়গায় এসেছে শুনি?

অ্যাগনিস হাসিমুখে এই কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বললাম, বিশ্বাস কর অ্যাগনিস, অন্য

কেউ আসেনি। কারো প্রতিই আমি আসক্ত হইনি। স্টীয়ারফোর্থদের বাড়িতে মিস ডার্টল নামে প্রায় তিরিশ বছরের এক মহিলা আছে। সে বড় চতুর। তার সঙ্গে আমার কথা বলতে ভাল লাগে। তবে তার প্রতি আমার কোন অনুরাগ নেই।

অ্যাগনিস এবার আমাকে জিজ্ঞাসা করল অন্য কথা। বলল, এর মধ্যে তুমি ইউরিয়া হীপকে দেখেছ?

আমি বললাম, না তো। সে কি লণ্ডনে আছে?

অ্যাগনিস বলল, একসপ্তাহ আগে সে লণ্ডনে ছিল। আমার ভয় হচ্ছে সে কোন একটা অশুভ ব্যবসায় নেমেছে।,

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, যে ব্যবসা তোমাকে অস্বস্তিতে ফেলেছে সে ব্যবসাটা কি?

অ্যাগনিস তার বোনার কাজ সরিয়ে রেখে চিন্তান্বিত মুখে আমার মুখপানে তাকিয়ে বলল, আমার মনে হয় সে ঐ কারবারে বাবাকে অংশীদার হিসাবে জড়িয়েছে।

একথা শুনে আমি এক ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধে ফেটে পড়লাম। বললাম, সে কি ! ঐ ধূর্ত শয়তানটা এইভাবে তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করছে! তুমি কি এর প্রতিবাদ করনি অ্যাগনিস? একবার ভেবে দেখ তো এর ফল কি হবে? তোমার বাবাকে এ কাজে এগোতে দেওয়া মোটেই উচিত নয়। সময় থাকতে এখনি বাধা দেওয়া উচিত।

অ্যাগনিস আমার দিকে সেইভাবে তাকিয়েই বলতে লাগল, সেদিন বাবার সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে যে কথা হয়েছিল তার দু'তিন দিন পরেই আমি তোমাকে এখন যে কথাটা বললাম তা বাবা আমাকে জানান। তিনি কথাটা বলতে গিয়ে তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্বটা চেপে রাখতে পারছিলেন না। দেখে কষ্ট হচ্ছিল। তিনি বোঝাতে চাইছিলেন , এটা জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর উপর।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, কে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে তাঁর উপর?

অ্যাগনিস কিছুটা ইতস্ততঃ করে বলল, ধূর্ত ইউরিয়া ধীরে ধীরে নিজেকে অপরিহার্য করে তোলে বাবার কাছে। বাবার দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে বশীভূত করে তোলে। মোট কথা, এমন কি বাবা তাকে ভয় করতে থাকেন।

এ ব্যাপারে কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল অ্যাগনিসের। তাই আমি তাকে আর বেশী কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না, যদিও তার আরও কথা বাকী ছিল। তবে আমি বুঝতে পারলাম, ব্যাপারটা অনেকদিন আগে থেকেই চলছিল।

অ্যাগনিস বলল, সে মুখে বিশেষভাবে দীনতা প্রকাশ করলেও এখন তার শক্তি বেড়েছে এবং নিজের প্রতিষ্ঠাও অর্জন করেছে। এখন সেটা কাজে লাগাচ্ছেও। সে আমাকে মাঝে মাঝে বলত , সে আরো ভাল কাজ নিয়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। এজন্য সে দুঃখিত। তার ইচ্ছা না থাকলেও তাকে যেতে হবে।

বাবা একথা শুনে আগের থেকে আরো বেশী বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ইউরিয়া চলে গেলে তিনি যেন অসহায় হয়ে পড়বেন।

আমি তখন অ্যাগনিসকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপারটাকে তুমি তাহলে কিভাবে দেখছ?

অ্যাগনিস বলল, বাবার শান্তির জন্য আমাকে এই ত্যাগ স্বীকার করতেই হবে, তাতে আমার ইচ্ছা থাক বা নাই থাক। এতে তাঁর বোঝা-ভার হালকা হয়ে উঠবে বলে যদি তিনি মনে করেন তবে সেটাই মেনে নেওয়া উচিত। আমি যদি তাঁকে এ বিষয়ে কোন বাধা দিতে যাই তাহলে তিনি আমাকে শত্রু ভাববেন। আমি জানি, বাবা আমার কথা ভেবে ভেবে তাঁর জীবনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন। এ বোঝা আর আমি বাড়াতে চাই না।

এই বলে অ্যাগনিস তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি তাকে এভাবে কোনদিন কাঁদতে দেখিনি। আনন্দের সময় আমি তাদের বাড়িতে থাকাকালে স্কুলে পড়াশুনোর সময় কোন ভাল ফল করলে আনন্দে তার চোখে জল আসত। কিন্তু দুঃখে তাকে কখনো কাঁদতে দেখিনি, ভেঙ্গে পড়তে দেখিনি। কারণ সাধারণতঃ তার চিত্ত দৃঢ়, শান্ত ও অবিচলিত থাকে সব সময়। আমার থেকে তার দৃঢ়তা ও ধৈর্য্য অনেক বেশী।

তাই আমি কি বলব কিছু খুঁজে পেলাম না। অ্যাগনিস এবার নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, ইউরিয়ার সব কিছু জানার জন্য ওর অগোচরে ওর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য আমি তোমাকে অনুরোধ করছি, তুমি তার প্রতি বন্ধুত্বপূর্ণ ভাব দেখাবে। তাকে মোটেই ঘৃণার ভাব দেখাবে না। তাহলে সে তোমাকে আরো বেশী করে বিশ্বাস করবে।

অ্যাগনিস হয়ত আমাকে আরো কিছু বলত। কিন্তু ও যে বাড়িতে ছিল সেই বাড়ির গৃহিনী মিসেস ওয়াটারকক এসে ঘরে ঢুকতে তার কথায় ছেদ পড়ল।

মিসেস ওয়াটারকক যখন দেখলেন আমি মদ্যপান করে আসিনি এবং আচরণ ভদ্র ও সৎ তখন তিনি আমার উপর খুশি হয়ে পরদিন এক ডিনার পার্টিতে নিমন্ত্রণ করলেন আমায়। আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম সানন্দ চিত্তে।

পরদিন আমি সেই বাড়িতে গিয়ে ডিনার পার্টিতে যোগদান করলাম। সেখানে ছিল মিঃ ও মিসেস ওয়াটারকক, মিঃ ও মিসেস হেনরি স্পাইথন, হ্যাবনেটের পিসী, অ্যাগনিস এবং এক অচেনা লোক। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে ইউরিয়া হীপও ছিল। আমি সবচেয়ে আশ্চর্য ও খুশি হলাম আমার স্যালেম হাউসের পুরনো বন্ধু টমি ট্যাড্‌লস্‌কে দেখে। খাবার আগে সকলেই এক একজন নারী সঙ্গী নিয়ে ডিনারে বসল। যেমন মিঃ ওয়াটারকক হ্যাবনেটের পিসীর সঙ্গে, মিঃ হেনরী মিসেস ওয়াটারককের সঙ্গে, সেই অচেনা খোঁড়া লোকটা অ্যাগনিসের সঙ্গে বসল। কেবল, ট্র্যাড্‌লস্‌, ইউরিয়া আর আমার কোন সঙ্গিনী ছিল না। আমরা তাই অন্য এক জায়গায় বসলাম। আমি ট্র্যাড্‌লস্‌কে নিয়ে এক টেবিলে বসলাম। ট্র্যাড্‌লস্‌কে পেয়ে আমার খুবই আনন্দ হচ্ছিল। সুদূর অতীতের স্যালেম হাউসের সেই পুরনো দিনগুলোর কথা মনে পড়ছিল খুব। আমাদের কথা হচ্ছিল আভিজাত্য ও রক্তের মর্যাদা সম্পর্কে। মিঃ ও মিসেস ওয়াটারকক আমাদের কথা সমর্থন করলেন। ট্যাড্‌লস্‌ আইন পড়ছে। সে ব্যারিস্টার হবে। ভোজসভা শেষে অ্যাগনিসের সঙ্গে কথা হল আমার। জানলাম ওরা দিনকতকের মধ্যেই ক্যান্টারবেরি চলে যাবে। একই গাড়িতে ইউরিয়াও যাবে। ভোজসভা শেষ হয়ে গেলে ইউরিয়া সব সময় আমার কাছে কাছে ঘুর ঘুর করতে লাগল। ছিনে জোঁকের মত সে আমাকে ধরে রইল। তার সঙ্গ আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। কিন্তু অ্যাগনিসের পরামর্শের কথা মনে করেই আমি তাকে অকুণ্ঠভাবে সহ্য

করে যাচ্ছিলাম। আমি তাকে আমার বাসায় গিয়ে কফি খাবার আমন্ত্রণও জানালাম। সে সঙ্গে সঙ্গে সানন্দে রাজী হয়ে গেল।

আমি ইউরিয়াকে সঙ্গে করে আমার বাসায় নিয়ে গেলাম। সেখানে গিয়ে ইউরিয়া আমার বাসাতেই রাতটা কাটাতে চাইল। আমি বললাম, ভাই আমার বিছানা মাত্র একটাই। সে বলল, কোন বিছানার দরকার হবে না। আগুনের ধারে একটু জায়গা পেলেই হবে।

অবশেষে নিশ্চিন্ত হয়ে ইউরিয়া আমার ঘরে সোফায় বসে কফি খেতে খেতে বলল, মাস্টার কপারফিল্ড, আমার অবস্থার একটা পরিবর্তন হয়েছে এবং সে কথা আপনি হয়ত শুনেছেন।

অ্যাগনিস এটা জানে এবং আমি এতে খুশি।

ইউরিয়া এবার আরো উৎসাহিত হয়ে বলল, আপনি একদিন যে ভবিষ্যদ্‌বাণী করেছিলেন আজ তা সব প্রমাণিত হলো। আপনি আমাকে একদিন বলেছিলেন, উইকফিল্ড এ্যাণ্ড হীপ কোম্পানির তুমি হবে অংশীদার। এইভাবে উচ্চাভিলাষের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আপনিই প্রথমে আমার মধ্যে জাগিয়ে দেন মিস্টার কপারফিল্ড। উইকফিল্ড খুবই যোগ্য লোক, কিন্তু মোটেই দৃঢ়চিত্ত নন। আমার পরিবর্তে অন্য যে কোন লোক এই ক'বছর তাঁর কাছে থাকলে সে তাঁকে কুক্ষিগত করে ফেলত। আমি হচ্ছি তাঁর একটা অতি প্রয়োজনীয় হাতিয়ার। তাঁর কাজে সহায়তা করি আর তিনিও আমাকে ধীরে ধীরে উন্নতির শিখরে নিয়ে যান। এত উন্নতির কথা আগে কখনো আশা করতে পারিনি আমি। আমি এজন্য কৃতজ্ঞ তাঁর কাছে।

এরপর ইউরিয়া বলল, আজ সন্ধ্যের ভোজসভায় অ্যাগনিসকে কত সুন্দর দেখাচ্ছিল, দেখেছেন আপনি ?

আমি বললাম, আমি জানি সে সুন্দরী এবং যেকোন সভাতেই আর পাঁচজন মেয়ের থেকে সে সুন্দরী এবং গুণবতী।

ইউরিয়া বলল, যদিও আমাদের মত ছোট্ট নিকৃষ্ট ঘরে তার মত মেয়েকে মানায় না, তবু জানবেন আমি তার শত গুণগ্রাহী, যে মাটির উপর দিয়ে সে হেঁটে যায় আমি সেই মাটিটাকে পর্যন্ত ভালবাসি।

আমি তখন তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি তোমার এই অনুভূতির কথাটা তাকে জানিয়েছ?

ইউরিয়া বলল, না না কখনই না। একমাত্র আপনি ছাড়া একথা আমি কাউকে বলিনি। আপনাকে প্রথম দেখার পর থেকেই এমন ভাল লেগে গেছে যে, আমি আমার সব গোপন কথা একমাত্র আপনাকেই বলতে পারি। এখন এ কথা অ্যাগনিসকে বলার সময় আসেনি। এখন আমাকে খেটে আরও উন্নতি করতে হবে। এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। তবে আমি আশা করি ও যখন জানতে পারবে আমি তার বাবার পক্ষে কত দরকারী, তাঁকে কিভাবে কত সাহায্য করি, তাঁর জীবনের পথকে কতভাবে সুগম করে তুলি, তখন ও সদয় হবে আমার প্রতি। তাই আমি আশা ছাড়ি না। আশা করি সে একদিন আমার হবেই। তাকে আমার করার জন্য আমি হাতে পাওয়া রাজমুকুট পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারি।

আমার মনে হচ্ছিল, জ্বলন্ত উনুন থেকে লোহার তপ্ত শিকটা এনে ওর দেহের মধ্যে বসিয়ে দিই। অ্যাগনিসের মত এত সুন্দর সদাশয় মেয়ে শেষে কিনা ইউরিয়া হীপের স্ত্রী হবে!

এরপর পাশের ঘরে শুতে চলে যায় ইউরিয়া। পরদিন সকালে যখন সে চা না খেয়েই চলে গেল আমার বাসা ছেড়ে, তখন আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল ঘৃণার কুটিল অন্ধকার রাত্রিটা ইউরিয়ার মধ্যেই শরীরী রূপ ধারণ করে চলে গেল।

২২

অ্যাগনিস যেদিন লণ্ডন ছেড়ে ক্যাণ্টারবেরি চলে যায় তার আগে পর্যন্ত ইউরিয়া হীপের সঙ্গে দেখা হয়নি। আমি ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তাকে বিদায় জানালাম। সে গাড়িতেই ইউরিয়াও ক্যাণ্টারবেরি যাচ্ছে। গাড়ি ছাড়ার পর গাড়ির জানালা দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ মুখ বার করে আমার দিকে তাকিয়ে রইল অ্যাগনিস।

অ্যাগনিসের সেই বিদায়দৃশ্যটা আমি বেশ কিছুদিন ভুলতে পারিনি। অ্যাগনিসের কথা প্রায়ই মনে পড়ত আমার। তার সমস্যার কথাটা প্রায়ই ভাবতাম। একদিন লণ্ডনে থাকাকালে সে আমাকে বলেছিল, তার পিতার শান্তির জন্য এ ত্যাগটুকু তাকে করতেই হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারলাম না সে ত্যাগের সীমাটা কতদূর? সে ত্যাগের মানে কি ইউরিয়া হীপের মত কুৎসিতদেহী, নীচকুলজাত ও হীন প্রকৃতির লোকটাকে বিয়ে করা?

এদিকে আমার দিনের পর দিন কেটে যেতে লাগল। আমি স্পেনলো এ্যাণ্ড জর্কিনস নামে সেই আইনব্যবসার প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিশির কাজ করে যেতে লাগলাম। আমার পিসিমার কাছ থেকে আমি বছরে নব্বই পাউণ্ড করে পেতাম। আমি যে বাসাটায় থাকতাম, সেটা এক বছরের জন্য চুক্তি করা হয়। সন্ধ্যের দিকটায় সে বাসায় একা একা থাকতে আমার কষ্ট হলেও মোটামুটি বাসাটা ভাল এবং আমি সেখানেই রয়ে গেলাম।

আমাদের কোম্পানির অন্যতম অংশীদার মিঃ স্পেনলো একদিন আমাকে বললেন, আমাদের বাড়িতে তোমাকে একবার যেতে হবে। আমার মেয়ে প্যারিসে পড়াশুনা করে। সে কিছুদিনের মধ্যে এসে পড়বে। এলে তোমাকে বলব। তুমি তখন আমার বাড়ি যাবে।

আমি জানতাম মিঃ স্পেনলো বিপত্নীক। একটি মাত্র কন্যা ছাড়া আর কোন সন্তান নেই। আমি যাব বলে তাঁকে কথা দিলাম।

দু এক সপ্তাহ পরই মিঃ স্পেনলো আমাকে জানালেন, তাঁর মেয়ে এসে গেছে। তারপর তিনি আমাকে বললেন, তুমি পরের শনিবার আমার বাড়িতে গিয়ে পরের সোমবার পর্যন্ত থাকলে খুব ভাল হয়।

নির্ধারিত দিনে একটি ফীটন গাড়িতে করে আমি নরউডে মিঃ স্পেনলোর বাড়িতে গেলাম। মিঃ স্পেনলো আমাকে সঙ্গে করে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেলেন। হলঘরে ঢুকে তাঁর ভৃত্যদের জিজ্ঞাসা করলেন, ডোরা কোথায়?

ডোরা! কি সুন্দর নাম। বাড়ির সঙ্গেই বাগান। বাগানটা খুব সুন্দরভাবে সাজানো। আমি ভাবলাম, এই বাগানেই মিস স্পেনলো বেড়ায়। এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি যখন বাগানে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম তখন মিঃ স্পেনলো আমাকে পিছন থেকে ডাকলেন, মিঃ

কপারফিল্ড, আমার মেয়ে ডোরা।

আমি পিছন ফিরে তাকিয়েই চমকে উঠলাম, দেখলাম , ডোরা যেন কোন নারী নয়, সে পরী অথবা স্বর্গের দেবদূত। কোন মেয়ের মধ্যে এত রূপ আমি জীবনে কখনো দেখিনি এর আগে। আমি এক মুহূর্তেই তার প্রেমের হাতে বন্দী হয়ে গেলাম। ডোরার প্রতি ভালবাসা গ্রাস করে ফেলল আমার সমস্ত অন্তরটাকে।

অবশেষে আমি ডোরাকে সৌজন্যমূলকভাবে বললাম, কেমন আছ মিস স্পেনলো?

ডোরা বলল, ভাল।

ডোরার সঙ্গে মিস মার্ডস্টোনকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মিঃ স্পেনলো তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার মেয়ের একান্ত সচিব এবং বন্ধু। উনিই ওর সব কিছু দেখাশোনা করে। মিস মার্ডস্টোন বললেন, আমি মিঃ কপারফিল্ডকে আগেই দেখিছি এবং চিনি।

আমি মিস মার্ডস্টোনকে জিজ্ঞাসা করলাম, মিঃ মার্ডস্টোন কেমন আছেন?

মিস মার্ডস্টোন বললেন, আমার ভাই ভালই আছে।

মিঃ স্পেনলো আমাকে বললেন, তুমি যে আগে থেকেই মিস মার্ডস্টোনের সঙ্গে পরিচিত তা জেনে খুশি হলাম।

মিস মার্ডস্টোন বললেন, আমি ওকে শৈশবে দেখেছি। ওকে খুবই চিনতাম। তারপর অবস্থার বিপাকে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে আমাদের।

তখন আমার শুধু ডোরার কথাই মনে হচ্ছিল। তার সুন্দর মুখ, উজ্জ্বল নীল চোখ, তার রেশমী চুল—আমি শুধু অপলক দৃষ্টিতে দেখতে চাইছিলাম। আমি দেখলাম ডিনারের আগে ডোরা একজন বৃদ্ধ লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। আমার তখন মনে হচ্ছিল ডোরা শুধু আমার সঙ্গে কথা বলুক আর কারো সঙ্গে নয়। সে আমার কথাই চিন্তা করুক কেবল।

এমন সময় মিস মার্ডস্টোন একবার আমাকে একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। তারপর আমাকে বললেন, দেখ ডেভিড, তোমার ছোটবেলায় তোমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা করেছিলাম, একটা ভ্রান্ত মত পোষণ করতাম আমি। এখন আর সেই পরিস্থিতি নেই। ঘটনাক্রমে আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসে পড়েছি। তোমার সম্বন্ধে আমার মনে অথবা আমার সম্বন্ধে তোমার মনে যে মত বা যে ধারণাই থাক, সেই সব মতামত এখন যেন কোন সংঘর্ষের মধ্যে আসে না। এখন যেন আমরা পরস্পরের প্রতি এমন কোন ব্যবহার না করি যাতে আমাদের সম্বন্ধে অপরে কোন মন্তব্য করতে সুযোগ পায়।

আমি বললাম, দেখুন মিস মার্ডস্টোন, আপনি ও মিঃ মার্ডস্টোন শৈশব আমার প্রতি ও আমার মার প্রতি অতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছিলেন। আপনাদেব নির্যাতনের কোন সীমা ছিল না। একথা আমি জীবনে কোনদিনও ভুলতে পারব না। কিন্তু সে যাই হোক তা এখন আপনি যা বললেন, আপনার সেই প্রস্তাবে আমি সম্পূর্ণ একমত। আমাদের মতান্তর যাই থাক, বাইরে আমরা তা প্রকাশ করব না কারো কাছেই।

মিস মার্ডস্টোন আর কোন কথা না বলে তাঁর একটা হাতের আঙুলের ডগা দিয়ে আমার একটা হাতের উল্টো দিকটা স্পর্শ করে বেরিয়ে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় ডোরার গান শুনলাম। ফরাসী ভাষায় লেখা কতকগুলো লোকগাথা বা আখ্যানকাব্য মিষ্টি গলায় গেয়ে শোনাল সে। সেইদিন সারা সন্ধ্যাটা গীটারের মত একটা বাদ্যযন্ত্র সহযোগে আমার হৃদয়ের উচ্চাভিলাষের শিখরদেশ স্বরূপা ডোরা গান গেয়ে শোনাল এবং সমস্ত সময়টা যেন স্বপ্নের মত কেটে গেল।

আমি কেবলি ভাবতে লাগলাম ডোরার কথা। আমি খাওয়ার কথা ভুলে গেলাম। অবশেষে মিস মার্ডস্টোন এসে তাকে নিয়ে গেলেন। আমি শুতে চলে গেলাম। আমি কেবলি ভাবতে লাগলাম, পরীর মত সুন্দরী এই ডোরার সঙ্গে আমি কিভাবে মেলামেশা করার সুযোগ পাবো, তার প্রেম কি লাভ করতে পারব? তার সঙ্গে বিয়ে হওয়াটা তো স্বপ্নের ব্যাপার। ছোট্ট এমিলিকে আমি যখন একদিন ভালবেসেছিলাম তখন আমার বয়স কম ছিল বলে এ ধরনের কোন অভিলাষ বা পরিকল্পনা ছিল না আমার মধ্যে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে হলঘরে পা দিতেই ডোরার প্রিয় কুকুর 'জিপ'-কে দেখতে পেলাম। তার নামটা হয়ত 'জিপসি'র অপভ্রংশ। ডোরার যা প্রিয় আমারও তাই প্রিয়। আমি হাত বাড়িয়ে জিপকে আমার কোলে নিতে গেলে সে দাঁত বার করে গর্জন করতে লাগল। সে আমাকে ভাল করে চেনে না।

একা একা বাগানে চলে গেলাম আমি। ডোরাকে পেলে জীবনে আমি কত সুখী হব সেই কথাই শুধু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাবতে লাগলাম আমি।

কিছুক্ষণ একা একা বেড়াতেই ডোরাকে দেখতে পেলাম। আমি বললাম, আপনি এত সকালে উঠেছেন মিস স্পেনলো? ডোরা বলল, সকালে ঘুম ভেঙ্গে গেলে ঘরে থাকতে আমার মোটেই ভাল লাগে না। আমি বাবাকে বলে রেখেছিলাম। রবিবার সকালে আমার কোন কাজ না থাকায় আমি সকালে বাগানে বেড়াব। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টাই সবচেয়ে উজ্জ্বল থাকে। তাই নয় কি?

আমি কোনরকম আমতা আমতা না করে পরিষ্কার কণ্ঠে বললাম, এখন আমার কাছে দিনটা উজ্জ্বল মনে হচ্ছে ঠিক, কিন্তু এক মিনিট আগে দিনটাকে অন্ধকার মনে হচ্ছিল আমার।

ডোরা হাসিমুখে বলল, একথা বলে আপনি কি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন আমার প্রতি, না কি সত্যিই সত্যিই আবহাওয়ার পরিবর্তন হয়েছে?

আমি বললাম, আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। আমি আমার মনের অনুভূতির কথাটাই প্রকাশ করলাম শুধু।

এরপর আমি একসময় বললাম, তুমি প্যারিস থেকে বাড়ি এসেছ?

ডোরা বলল, হ্যাঁ, তুমি কখনো প্যারিসে গিয়েছিলে?

আমি বললাম, না, কখনো যাইনি।

ডোরা আশ্চর্য হয়ে বলল, সেকি? আমি আশা করি তুমি ওখান থেকে শীঘ্রই ঘুরে আসবে। খুব ভাল শহর, খুব ভাল লাগবে।

আমি বললাম, যত ভালই হোক, আমি এখন এখান ছেড়ে প্যারিস যেতে পারব না।

তারপর আমি তার কুঞ্চিত কেশরাশির প্রশংসা করে বললাম, এমন চুল আমি কোথাও কোন মেয়ের দেখিনি। আমার ইচ্ছে হচ্ছে তোমার মাথার টুপীটা আর চুলের নীল ফিতেটা আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে টাঙিয়ে রাখি।

এমন সময় ডোরার কুকুর জিপ ছুটে এসে ডোরার কোলে উঠে পড়ল। আমাকে দেখে সে রেগে গেল। আমার মনে হলো আমার প্রতি সে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছে। ডোরা যেন তার একার সম্পত্তি। অবশেষে অনেক করে তাকে শান্ত করল ডোরা।

ডোরা এক সময় বলল, মিস মার্ডস্টোনের সঙ্গে তোমার পরিচয় থাকলেও মনে হচ্ছে তার সঙ্গে তোমার কোন অন্তরঙ্গতা নেই।

আমি বল্লাম, না। বিশেষ কোন ঘনিষ্ঠতা নেই।

ডোরা বলল, মিস মার্ডস্টোন বড় বিরক্তিকর মানুষ। জানি না, তার মধ্যে বাবা কি গুণ যে খুঁজে পেল এবং আমার সহচরী হিসাবে নিযুক্ত করল। আমাকে পাহারা দেবার জন্য কোন লোকের দরকার নেই। জিপই যথেষ্ট। তাই নয় কি জিপ, তুই কি বলিস?

জিপ শুধু চোখ পিট্ পিট্ করে তাকাল ডোরার দিকে।

ডোরা বলল, কোথায় এক সহৃদয় নিবিড় ব্যবহারের সঙ্গী পাব, না তার পরিবর্ত পেলাম গোমরামুখো, নিয়মনিষ্ঠ, কঠোর প্রকৃতির মিস মার্ডস্টোনকে। সব সময় আমার পিছু লেগে আছে।

বেড়াতে বেড়াতে বাগানে আমরা জেরানিয়াম ফুল দেখছিলাম, এমন সময় মিস মার্ডস্টোন প্রাতরাশের জন্য আমাদের খুঁজতে খুঁজতে সেখানে চলে এলেন। তারপর তিনি ডোরার একটা হাত ধরে তাকে প্রাতরাশের টেবিলে নিয়ে গেলেন গম্ভীরভাবে।

আমরা সেদিন বাড়ির চারজনে কেবল বেশ শান্ত-নির্ঝঞ্ঝাট পরিবেশে ডিনার খেলাম। মিঃ স্পেনলো, ডোরা, মিস মার্ডস্টোন আর আমি। বাইরের কোন লোক ছিল না।

সন্ধ্যেটা আমরা বই পড়ে, ছবি দেখে কাটালাম। রাতে শুতে যাবার সময় মিঃ স্পেনলোর কাছে বিদায় নেবার সময় আমার কেবলি মনে হতে লাগল, আমি যে তাঁর মেয়েকে এত ভালবেসেছি তা তিনি এখনো কিছুই জানেন না। ডোরাকে আমি বিয়ে করতে চাই। কিন্তু এ বিষয়ে এখনো আমি তার কোন অনুমতি নিইনি।

পরদিন সকালেই আমার এ বাড়ি ছেড়ে যাবার পালা। তিন দিন এখানে মহা আনন্দে কাটালাম।

আমি মিঃ স্পেনলোর বাড়ি থেকে সোজা আমার অফিসে চলে গেলাম। ছুটির পর আমি যখন আমার বাসায় ফিরলাম তখন খুবই কষ্ট হচ্ছিল। মিঃ স্পেনলো যখন অফিসের কাজ সেরে বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে দেখে আমার ডোরার কথা মনে হচ্ছিল কেবল।

আমি তিন দিন ডোরাদের বাড়িতে কাটিয়ে অফিস ছুটির পর সোজা আমার বাসায় চলে তো গেলাম, কিন্তু আমাদের বাড়িওয়ালী মিসেস ক্রুপ-এর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা খুবই তীক্ষ্ণ। তিনি আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, কি ব্যাপার মিঃ কপারফিল্ড এ-কদিন কোথায় ছিলে? মনে হচ্ছে একজন মেয়ে এসেছে তোমার জীবনে।

আমি বললাম, কি করে বুঝলেন, মেয়ে এসেছে?

মিসেস ক্রুপ বললেন, আমি সব বুঝতে পারি মিঃ কপারফিল্ড। জানবে আমিও একজন মা। অবশ্য তোমার ব্যক্তিজীবনে আমি হস্তক্ষেপ করতে চাই না এবং এ বিষয়ে কোন অনুমতি না নিয়েই কথা বলছি। তবে আমার একটা কথা মনে রাখবে। তোমার ঘরে যে ভদ্রলোক আগে থাকতেন তিনি খুব মদ্যপান করতেন আর বারবনিতার প্রেমে পড়েন এবং মারা যান। মদ্যপানে তাঁর দেহ ফুলে যায়। এইভাবে তিনি কুপথে গিয়ে নিজের সর্বনাশ নিজেই ডেকে আনেন।

আমি তখন মিসেস ক্রুপকে বললাম, আপনি দয়া করে আমার প্রেমাস্পদ তরুণীকে একজন বারবনিতার সঙ্গে এক করে দেখবেন না।

মিসেস ক্রুপ বললেন, শুনুন মিঃ কপারফিল্ড। তুমি না চাইলে তোমাকে কোন উপদেশ দেওয়া মোটেই উচিত হবে না আমার। আমি তা চাইও না। আসলে আমি নিজে একজন মা। তাই আমি তোমার ভালো চাই। তুমি একজন তরুণবয়স্ক যুবক। কাজ কর আর আনন্দে থাক। কোন নারীপ্রেমের দিকে মন না দেওয়াই ভাল। কোন না কোন খেলায় মন দাও। তাতে শরীর মন দুই-ই ভাল থাকবে।

এই বলে মিসেস ক্রুপ আমাকে অভিবাদন জানিয়ে চলে গেলেন।

২৩

সেদিন হঠাৎ আমার মাথায় ট্র্যাড্‌লস্-এর কথাটা এসে পড়ল। পরদিন আমি তার খোঁজ করতে লাগলাম। ট্র্যাড্‌লস্ থাকত ক্যাণ্ডন টাউনে ভেটেরিনারি কলেজের কাছে একটা কোয়ার্টারের ধারে। ঐ অঞ্চলে পশু-চিকিৎসা কলেজের ছাত্রেরা থাকে। তারা জীবন্ত গাধা কিনে এনে আপন আপন বাসায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করত।

আমি আমার পুরনো স্কুলবন্ধু ট্র্যাড্‌লস্ এর খোঁজে সেই রাস্তায় গেলাম। জায়গাটা আবর্জনায় ভরা। শুধু বাঁধাকপির পাতায় ভর্তি। এই নোংরা পরিবেশটা দেখে আমার অতীতে আমি যেখান মিঃ মিকবার ও মিসেস মিকবারের সঙ্গে থাকতাম, সেই জায়গাটার কথা মনে পড়ে গেল। আমি খোঁজ করতে করতে একজন গোয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম, ট্র্যাড্‌লস্ নামে এখানে কেউ থাকে কিনা? এমন সময় সেই পথের একপ্রান্তে একটি ঘরের ভিতর থেকে এক বৃদ্ধ-লোকের কণ্ঠস্বর বলল, হাঁ থাকে।

আমি তখন সেই বাড়িটার উপরতলায় সোজা চলে গেলাম। ঘরের এক কোণে একটা সাদা কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়েছিল ট্র্যাড্‌লস্। আমি তাকে ডাকতেই সে উঠে এসে বলল, আমি তোমাকে দেখে কত যে আনন্দিত হলাম কপারফিল্ড! একদিন ট্রেনে তোমার সঙ্গে দেখা হলে আমি তোমাকে আমার এই ঠিকানাটা দিয়েছিলাম, তাই না?

আমিও তার দেখা পেয়ে খুশি হয়ে বললাম, মিঃ ওয়াটারকক বলেছিলেন তুমি নাকি আইন পড়ছ?

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, হাঁ আমি পড়ছি, কিন্তু একশো পাউণ্ড টাকাটা দেওয়া যে কত কঠিন ব্যাপার। আমাকে সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে, কষ্টের মধ্যে দিয়ে এগোতে হচ্ছে ভাই।

আমি জানতাম, ট্র্যাড্‌লস্-এর ভাগ্যের কোন উন্নতি হচ্ছে না, তবে সে বড় সরল ও সামাজিক প্রকৃতির।

আমি তাকে বললাম, এখানে আসার সময় আমি একটা কথা না ভেবে পারছিলাম না। সেটা কি কথা জান?

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, না।

আমি বললাম, আমি তোমাকে সেই আকাশ-নীল পোশাক পরা অবস্থায় দেখব।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, সেসব স্কুলজীবনের ব্যাপার। তখন দিনগুলো বেশ সুখেই কাটত। তবে হেডমাস্টার ক্রীকল্ তোমার উপর বড় খারাপ ব্যবহার করত। সেই সব রাত্রির কথা মনে পড়ে? তুমি কত গল্প বলতে! অন্ধকার ঘরে চাঁদের আলো এসে পড়ত জানালা দিয়ে। তখন দিনগুলো বেশ কাটত।

আমি বললাম, তোমার এক কাকা তখন তোমায় লালন-পালন করতেন।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, হ্যাঁ, আমার কাকাকে আমি প্রায়ই চিঠি লিখব ভাবতাম। কিন্তু লিখতাম না শেষ পর্যন্ত। আমি স্কুল ছাড়ার পরই সেই কাকার মৃত্যু হয়। আমি বড় হওয়ার পর তিনি আর পছন্দ করতেন না আমায়। তাঁর কাপড় ছাপার একটা কারবার ছিল। প্রথমে তিনি আমাকেই তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু পরে তিনি আমাকে মোটেই পছন্দ করতেন না। তাঁর কথা, তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন আমি তা হয়ে উঠতে পারিনি। তাই তিনি পরে বিয়ে করেছিলেন। যাই হোক, তিনি আমাকে পছন্দ করুন বা না করুন বছরে পঞ্চাশ পাউণ্ড করে দিতেন। কিন্তু পরে সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার কাকা গাউটরোগে ভুগতে ভুগতে মারা যান। তাঁর স্ত্রী আবার এক যুবককে বিয়ে করে। আমার বৃত্তিটা বন্ধ হয়ে যায়। সেই বৃত্তি থেকে আমি যেটুকু সঞ্চয় করেছিলাম তা আইন পড়তে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। আমি আইনের ছাত্রই ছিলাম। কিন্তু পরে আমাকে কাজ খুঁজতে হয়। স্যালেম হাউসে আমাদের সঙ্গে ইয়লার নামে একটি ছাত্র পড়ত। সে আমাকে একটার পর একটা চাকরি দেখে দিত। এই সূত্রেই ওয়াটারককের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়। এখন আমি একটা প্রকাশনা কোম্পানির অধীনে কাজ করছি। ঐ প্রকাশক এখন এনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোষ প্রকাশ করছে এবং আমি ভালভাবেই কাজ করছি।

স্ট্র্যাড্‌লস্-এর জীবনের সব কথা আমি শুনতে চাইছিলাম। আমার আগ্রহ দেখে সে বলে যেতে লাগল।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, তুমি ঠিক সেই আগের মতই আছ কপারফিল্ড। সেই খুশি খুশি শান্ত মুখ। তোমাকে আমি সব কথা বলব। কোন কিছুই গোপন করব না। জান কপারফিল্ড, আমি এখন প্রেমাবদ্ধ?

আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম, তাই নাকি?

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, মেয়েটি বড় ভাল, শুধু আমার থেকে কিছুটা বড়। আমাকে বড় ভালবাসে।

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডোরার কথা আমার মনে পড়ে গেল। মিঃ স্পেনলোর বাড়ির কথা মনে হলো। ট্র্যাড্‌লস্ আরও বলল, সে হচ্ছে আমার প্রিয়তমা। তাকে নিয়ে আমি ঘর বাঁধব! অবশ্য এখনো পর্যন্ত সংসার করিনি। তবে ধীরে ধীরে আমরা এই পথে এগিয়ে চলেছি। ঘর-সংসার করতে যে সব জিনিসের দরকার সেই সব জিনিসগুলো একটা একটা করে আমরা কিনে রাখছি।

এই বলে সাদা কাপড় ঢাকা একটা নতুন ফুলদানী আর একটা কাঠের পায়া দেখাল। একে এক সব দেখাল। মেয়েটি খুব ভাল, সত্যিই খুব ভালবাসার যোগ্য।

আমরা বেশ একটা ভাল জায়গাতেই ঘরভাড়া করেছি। সেখানে যে সব মানুষজন আছে তারা বেশ ভাল। বিশেষ করে মিঃ আর মিসেস মিকবারের মত প্রতিবেশী আছে আমাদের। জীবনে ওঁদের অভিজ্ঞতা অনেক। ওঁদের সাহায্য আর সহযোগিতা আমরা পাব।

কথাটা শুনেই আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। আমি বললাম, কি বলছ ট্র্যাড্‌লস্, আমি তো মিকবারদের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁরা আমার অনেকদিনের অন্তরঙ্গ।

এই ভাবে আমাদের দুজনের মধ্যে যখন মিকবারদের নিয়ে কথা হচ্ছিল, তখন সহসা দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো আর তা শুনে আমার উইগুসর টেরাসের বাসার কথা মনে পড়ল। আমি বুঝতে পারলাম নিশ্চয় মিঃ মিকবারই কড়া নাড়ছেন।

আমার অনুমানই সত্য। মিঃ মিকবার এসে বললেন, মাপ করবেন মিঃ ট্র্যাড্‌লস্।

মিঃ মিকবার আমাকে দেখেও দেখলেন না। শুধু মাথাটা একটু নোয়ালেন। আমি বললাম, কেমন আছেন মিঃ মিকবার?

মিঃ মিকবার তাঁর জামার কলারটা একটু নাড়া দিয়ে বললেন, স্যার আগে যেমন ছিলাম তেমনই আছি।

আমি তখন আবার জিজ্ঞাসা করলাম, মিসেস মিকবার আর ছেলেমেয়েরা কেমন আছে?

মিঃ মিকবার বললেন, স্যার আগের মতই আছে। আপনার অসীম দয়া।

এতক্ষণ ধরে আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থেকেও আমাকে চিনতে পারেননি। আমি তাঁর রকম দেখে হাসতেই তিনি আমাকে খুঁটিয়ে ভাল করে দেখে আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন, এও সম্ভব? কপারফিল্ডের সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেল আবার?

এই বলে দুহাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন; হা ভগবান, কি আশ্চর্যের কথা মিঃ ট্র্যাড্‌লস্, আপনি দেখছি আমার অতীত দিনের বন্ধু ও সঙ্গী কপারফিল্ডের সঙ্গেও পরিচিত!

আমি মিকবারদের কথা আগেই বলেছিলাম ট্র্যাড্‌লস্‌কে। তাই সে বিস্মিত হলো না মোটেই। মিঃ মিকবার এবার আমাকে মিসেস মিকবারের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, আমাদের পুরনো বন্ধু কপারফিল্ড তোমার সঙ্গে ওঁর পরিচয়টাকে আবার নতুন করে ঝালিয়ে নিতে চাইছেন।

কিন্তু আমি দেখলাম মিসেস মিকবারের শরীরের অবস্থা খুবই খারাপ। তিনি কথা বলতে পারছিলেন না। মিঃ মিকবার জল এনে তাঁর চোখে মুখে দিতে মিসেস মিকবার আমাকে দেখে আনন্দ প্রকাশ করলেন। আমার সঙ্গে দু'একটা কথা বললেন।

ওঁরা সবাই আমাকে ডিনার খেয়ে যেতে বলছিলেন। কিন্তু আমি কাজের অজুহাত দিয়ে ওঁদের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। মিঃ মিকবার সঙ্গে কিছুটা গিয়ে সোজা পথটা দেখিয়ে দিলেন। পথে যেতে যেতে বললেন, এখন আমি কমিশনে শস্য দানা বিক্রী করছি। এ সবই অস্থায়ী কাজ। একটা স্থায়ী কিছু হচ্ছে না। তবে অবশ্য হতাশ হবার কিছু নেই। যে কোন মুহূর্তে এমন একটা কিছু ঘটতে পারে যা আমাদের জীবনে আনবে একটা বিরাট পরিবর্তন। এখন আমরা ও মিঃ ট্র্যাড্‌লস্ যে পরিবেশে আছি তা বেশ ভাল। তবে মিসেস মিকবারের শরীরের যে অবস্থা তাতে তিনি আবার একটি সন্তান ধারণ করেছেন বলে মনে হয়। এটা এমন কিছু অসম্ভব নয়। তাঁর আত্মীয়-স্বজনেরা অবশ্য এ ব্যাপারে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন কিন্তু আমি সেসব গ্রাহ্য করি না। আমি ঘৃণার সঙ্গে তাদের এই অসন্তোষের জবাব দিতে চাই।

আমি তাঁদের কাছে বিদায় নেবার সময় আমার বাসায় তাঁদের সকলকে এক ডিনারপার্টিতে নিমন্ত্রণ করি। বলি ওঁদের সুবিধামত দিন ঠিক করে দিনটা যেন আমায় জানিয়ে দেন।

দিন ঠিক করে আমাকে জানাতেই আমি ডিনারের সব আয়োজন করে ফেললাম। মিসেস ক্রুপ এই সব ঝামেলা সহ্য করতে না চাইলেও আমার অনুরোধে সব ব্যবস্থা করল। নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে ট্র্যাড্‌লস্, মিঃ মিকবার ও মিসেস মিকবার এলেন সেই ডিনারপার্টিতে। খাওয়া দাওয়ায় সকলেই খুব খুশি হলেন। মিঃ মিকবারকে খুশীতে খুব উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল। মিসেস মিকবারও তখন বেশ সুস্থ ছিলেন। খাওয়ার পর তিনি নিজের হাতে চা তৈরি করলেন। আমি হাতের কাছে সব যুগিয়ে দিলাম। এক সময় তিনি নীচু গলায় আমার প্রেমাস্পদ ডোরার সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। তার গায়ের রং কালো না ফর্সা, সে বেঁটে না লম্বা-এই সব প্রশ্ন করলেন। কিন্তু সকলের সামনে একথা উত্থাপন করতে চাইলাম না আমি।

ডিনার খেয়ে সবাই চলে গেলে আমি আমার ঘরের আগুনের পাশে বসে নানা বিষয় নিয়ে চিন্তা করছিলাম, এমন সময় সিঁড়িতে কারো পদশব্দ শুনতে পেলাম। ভাবলাম, হয়ত ট্র্যাড্‌লস্ আসছে। তারপর দেখলাম স্টীয়ারফোর্থ। আমি তাকে হঠাৎ দেখে বেশ অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।

স্টীয়ারফোর্থ ঢুকে আমাকে দেখে বলল, তুমি যে অবাক হয়ে গেলে ডেইজি!

সত্যিই আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। অ্যাগনিসের সতর্কবাণী আমার মনে ছিল। আমার হিতৈষিণী দেবদূত অ্যাগনিস আমার মনের মণিকোঠায় আগের মতই অধিষ্ঠিত ছিল। তবু আমার পুরনো বন্ধু স্টীয়ারফোর্থকে আমার মন থেকে কোন মতেই দূরে সরিয়ে রাখতে পারলাম না। আনন্দের সঙ্গে তার হাত ধরে সোফায় বসালাম।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, তোমার ডিনার পার্টির লোকদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হলো। তারা তো তোমার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

আমি মিকবার দম্পতি আর টমি ট্র্যাড্‌লস্ এর কথা বললাম। স্টীয়ারফোর্থ বলল,মিঃ মিকবার ভদ্রলোকটিকে চেনা যায় না, মনে হয় উনি নিজেকে নিজেই জানেন না!

তারপর ট্র্যাড্‌লস্-এর কথা তুললে ও আনমনে বলল, ও কি সেই আগের মতই নরম প্রকৃতির আছে?

প্রথমটায় ও ভাল চিনতে পারেনি। পরে ওকে স্যালেম হাউসের কথা বলতে বুঝতে পারল।

ও বলল, ওর সঙ্গে তাহলে একবার দেখা করতে হবে।

স্টীয়ারফোর্থ এবার কিছু খেতে চাইলে আমি ওকে আমার যে খাবার অবশিষ্ট ছিল তা টেবিলে সাজিয়ে দিলাম। ও খুশি হয়ে বলল, এ যে দেখছি রাজার খাবার ডেইজি!

আমি বললাম, আমি মিকবারকে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করছিলাম। ভেবেছিলাম তুমি হয়ত অক্সফোর্ডে আছ।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, মিকবার কি জানবে, আমি ইয়ারমাউথ গিয়েছিলাম। প্রায় সপ্তাহখানেক ছিলাম।

আমি ওর সুন্দর মুখখানা দেখলাম। তাতে ছিল টাটকা সমুদ্রবায়ুর এক দুরন্ত সজীবতা। তবু ওকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বেশ। আমি জানতাম ওর প্রকৃতিটা বড় অদ্ভুত ধরনের। ওর বাসনা বড় উদ্দাম। ও যেটাকে ধরে, সেটাকে আয়ত্ত করার জন্য সংগ্রাম করতে ভালবাসে। ও কারো কোন নিষেধ শুনবে না। আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, এমিলির বিয়ে হয়েছে?

ও বলল, না, এখনো হয়নি।

এই বলে সে তার কোটের পকেট হাতড়ে একটা চিঠির খোঁজ করতে করতে বলল, তোমার ধাত্রী একটা চিঠি দিয়েছে তোমায়। আমি দেখলাম ওর স্বামীর অবস্থা খারাপ। ডাক্তার বলেছে আর বেশীদিন নয়। ও এখন জীবনের শেষ সীমানায় এসে পড়েছে।

আমি চিঠিটা পড়লাম। পেগটি অল্প কথায় লিখেছে তার স্বামীর জীবনের আর কোন আশা নেই। তবু ও সেবা করে যাচ্ছে অক্লান্ত ভাবে।

স্টীয়ারফোর্থ খেতে খেতে বলল, মৃত্যু ব্যাপারটা খারাপ। তবু দুঃখের কিছু নেই। সূর্য প্রতিদিনই অস্ত যায়, তেমনই মৃত্যুও সব মানুষের জীবনের দরজায় একদিন করাঘাত করবেই। সবাইকেই একদিন সব কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে, তবু মানবজীবনের এই সাধারণ পরিণতির উপর ক্ষোভ করলে চলবে না। হতাশ হয়ে কাজ-কর্ম ছাড়লে চলবে না। জীবনের সমুদ্র শান্তই হোক বা বিক্ষুব্ধই হোক, তাতে ঢেউ ভেঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যবস্তুকে পাবার জন্য।

আমি বললাম, শোন স্টীয়ারফোর্থ, আমার পুরনো ধাত্রীর কাছে আমাকে যেতে হবে। অবশ্য আমি গিয়ে যে তার কিছু ভাল করতে পারব বা তার কোন বিশেষ উপকার করতে পারব তা নয়। তবু তাকে এই সময় কিছু সান্ত্বনা দেওয়া দরকার। তুমি তো ভাই এই মাত্র এলে সেখান থেকে, সুতরাং তোমাকে আর যেতে বলতে পারি না। তাই আমি একাই যাব।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, আজ রাতেই আমাকে হাইগেটে পৌঁছতে হবে। দীর্ঘদিন মার সঙ্গে দেখা হয়নি। আমার বিবেকে বাধছে। বাইবেলের সেই বাঁধনছাড়া বাউণ্ডুলে অমিতব্যায়ী পুত্রের মত আমাকে আমার মা ভালবাসেন। ভালবাসার একটা দাম আছে তো।

এরপর সে আমার একটা হাত ধরে বলল, তুমি কি কালই যাচ্ছ?

আমি বললাম, হ্যাঁ, কালই যাব।

স্টীয়ারফোর্থ আমার হাতটা তেমনি ধরে থেকে বলল, কালকের দিনটা বাদ দাও। আমি চাইছিলাম তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে দিনকতক থাকবে। কাল গিয়ে অন্ততঃ একটা দিন

তোমাকে থাকতেই হবে। রোজা ডার্টল আর আমার মাঝখানে গিয়ে তোমাকে দাঁড়াতে হবে। আমাদের ছাড়াছাড়িটা যাতে পাকা হয় তার ব্যবস্থা করবে।

স্টীয়ারফোর্থ বারবার অনুরোধ করায় আমি কথা দিলাম, কাল যাব তাদের বাড়িতে।

তাকে বিদায় দিয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তার দিকে। তার একটা কথা আমার বারবার মনে পড়তে লাগল, সব বাধা ঠেলে এগিয়ে যাও। লক্ষ্যবস্তুকে লাভ করার জন্য সংগ্রাম করে যাও।

স্টীয়ারফোর্থ চলে যাবার পর আমি জামা কাপড় ছাড়ছিলাম, এমন সময় ডাক পিয়ন একটা চিঠি ফেলে দিয়ে গেল আমার ঘরে।

আমি দেখলাম চিঠিটা মিঃ মিকবারের। চিঠিটা বরাবর আলঙ্কারিক ভাষায় আবেগের সঙ্গে লেখা। ওঁর যত চিঠি সব এইভাবেই উনি লেখেন। চিঠিটার মমার্থ হলো এই যে, উনি আবার বিপদে পড়েছেন। উনি যে বাড়িটাতে ট্র্যাড্‌লস্‌-এর সঙ্গে ভাড়া থাকেন, সে বাড়ির ভাড়া সাড়ে তেইশ পাউণ্ডের মত বাকি পড়েছে। উর্ধ্বতন পক্ষে তিন মাসের মধ্যে তা মিটিয়ে দিতে হবে। টাকাটা দুজনেরই দেয়। কিন্তু ট্র্যাড্‌লস্‌কে টাকার কথা বললে সে দিতে পারেনি। এখন সব টাকার জন্য উনিই দায়ী। তাই উনি এখন দুর্ভাগ্যের দ্বারা নিষ্পেষিত। ওঁর আশার চাঁদ ক্রমেই দিগন্তে ডুবে যাচ্ছে। এখন সব অন্ধকার।

তখনি অফিসে গিয়ে আমি মিঃ স্পেনলোর কাছে দুটোর পর এক জায়গায় যাবার জন্য ছুটি চাইলাম। তারপর মিস স্পেনলোর কুশল জিজ্ঞাসা করলাম। উনি আমাকে বললেন ওরা ভালই আছে।

আমি একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপে দুটোর সময় যাত্রা করলাম। আমি সোজা হাইগেটে চলে গেলাম। স্টীয়ারফোর্থের মা ও মিস রোজা ডার্টল দুজনেই আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। দেখলাম স্টীয়ারফোর্থ সেখানে নেই। একটি মেয়ে আমাদের পরিচর্যা করছিল।

আমি একটি ঘরে গিয়ে স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে একান্তে কথা বলতে লাগলাম।

তারপর স্টীয়ারফোর্থ তার মার কাছে চলে গেলে মিস রোজা ডার্টল আমার সঙ্গে কথা বলতে এল। ডার্টল বলল, আপনি তো অনেকদিন আসেননি। আপনার কাজ এমনই যে, একেবারেই হয়ত সময় পান না। সব সময় ব্যস্ত থাকতে হয়। কাজটা বোধ হয় নীরসও।

আমি বললাম, কাজে তো ব্যস্ত থাকতেই হয়। তবে একেবারে নীরস নয়, কিছুটা নীরস।

মিস ডার্টল বলল, তাই মাঝে মাঝে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করে। তাই হয়ত মাঝে মাঝে পরিবর্তন চান।

স্টীয়ারফোর্থ তখন তার মার সঙ্গে পায়চারি করছিল। মিস ডার্টল আবার স্টীয়ারফোর্থের কথা বলল। বলল, আচ্ছা, আপনার বন্ধু কি করে বলুন তো। ওর চাকরিটা কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয়। ওর চোখের দৃষ্টিতে রাগ, না ঘৃণা, না অন্ধকার, নাকি নির্দয়তা না ভালবাসা—ঠিক কি আছে তা আমি বুঝতে পারি না। আমি যখন প্রথম ওকে এ বাড়িতে দেখি তারপর থেকে আজ পর্যন্ত ওর সম্বন্ধে এক চুলও বেশী জানতে পারিনি।

আমি মিস ডার্টল-এর মুখপানে তাকিয়ে তার উপর এক অব্যক্ত বেদনার একটা ছাপ দেখতে

পেলাম।

ডিনার খাবার সময় রোজা স্টিয়ারফোর্থের সামনে আবার কথাটা তুলল। বলল, আমি লক্ষ্য করে আসছি ছেলে ঘরে থাকলে মিসেস স্টীয়ারফোর্থ খুব আনন্দে থাকেন। আর স্টীয়ারফোর্থও বাবা মাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।

রোজা মিসেস স্টীয়ারফোর্থকে বলল, আমাকে বলুন সব কথা। আমি সারাদিন এই কথাই ভাবছি। আমি জানতে চাই।

মিসেস স্টীয়ারফোর্থ জিজ্ঞাসা করলেন, কি জানতে চাও আমায় বল তা? হেঁয়ালি করো না। রহস্যময়ীর মত কথা বলো না।

ডার্টল বলল, রহস্যময়ী! আপনি কি আমাকে তাই মনে করেন?

মিসেস স্টীয়ারফোর্থ বললেন, আমি বারবার তোমাকে কত অনুরোধ করি, সব কথা সরলভাবে খুলে বল। স্বাভাবিকভাবে চল।

রোজা বলল, এটা কি আমার স্বাভাবিক আচরণ নয়? আমরা এখনও পর্যন্ত পরস্পরকে জানতে পারলাম না। বুঝতে পারলাম না।

মিসেস স্টীয়ারফোর্থ বললেন, মানুষ কেমন নিজের অজ্ঞাতসারেই ধীরে ধীরে বদলে যায়। আমি কিন্তু আমার আগের স্বরূপেই থাকতে চাই, আমি চাই তুমি তা থাকবে রোজা।

রোজা বলল, আমি জেমস্ স্টীয়ারফোর্থের-এর কাছ থেকে এখন থেকে সরলতা শিখব?

মিসেস স্টীয়ারফোর্থ তাকে বললেন, হ্যাঁ তাই শিখবে। কারণ তুমি যা কিছু বল, তোমার সেসব কথার মধ্যে একটা হেঁয়ালি আর বিদ্রূপের ভাব থাকে।

এরপর মিসেস স্টীয়ারফোর্থ আবার তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি নিজে সন্তুষ্ট তো রোজা?

রোজা বলল, আমি চাই, যে সব মানুষের মধ্যে স্বভাবের দিক থেকে একটা মিল থাকবে, যারা আমাদের বন্ধু বলে, তাদের নীতিবোধও এক হবে।

স্টীয়ারফোর্থ তখন কথাটার প্রতিবাদ করে বলল, সবাই এক রকমের হবে সব দিক থেকে, এটা ঠিক নয়। এই পার্থক্য আছে বলেই মানুষ জীবন্ত মানুষ, পুতুল নয়।

ডিনারের পর রোজা যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালে স্টীয়ারফোর্থ তাকে অনুরোধ করল, যাবে পরে, আগে একটা আইরিশ গান গাও। তোমার বীণাটা বাজিয়ে গান কর।

রোজা বলল, আমার গান তুমি গ্রাহ্যই কর না।

স্টীয়ারফোর্থ বলল, আমি শুনব, তাছাড়া এখানে ডেভিড রয়েছে। ও অন্তরের সঙ্গে গান ভালবাসে। তুমি গান করবে বীণা বাজিয়ে আর আমি তোমার পাশে বসে শুনব ঠিক আগে যেমন শুনতাম।

ওর প্রথমে ইচ্ছা না থাকলেও পরে বীণাটা নিয়ে বাজাতে শুরু করল এবং গানও গাইল।

তার গান শুনে আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার গানের সুরঝঙ্কারের মধ্যে এমন একটা অপার্থিব মাধুর্য আর মূর্ছনা ছিল যা আমি কোথাও কারো গানের মধ্যে শুনিনি।

রাত্রিতে শুতে যাবার আগে স্টীয়ারফোর্থকে তার মা বললেন, রোজার সঙ্গে তোর কি হয়েছে বল? কেন ওকে রাগাস? ওর মেজাজটা তীক্ষ্ণ হয়ে আছে।

আমি শুতে যাবার সময় স্টীয়ারফোর্থের কাছে বিদায় নিয়ে বললাম, কাল সকালে তুমি ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমি চলে যাব।

স্টীয়ারফোর্থ আমার কাঁধে হাত রেখে অনেক করে থাকতে বলল। কিন্তু আমি রাজী হতে পারলাম না তাতে।

পরদিন সকালেই আমি ওদের বাড়ি থেকে রওনা হয়ে পড়লাম। আমি বেরোবার সময় একবার তার ঘরের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম হাতে মাথা রেখে শুয়ে আছে স্টীয়ারফোর্থ, ঠিক যেমন করে স্যালেম হাউসের স্কুল বাড়িতে শুত ও।

২৪

সেদিন সন্ধ্যাতেই আমি ইয়ারমাউথ পৌছালাম। আমি একটা হোটেলে ওঠার পর ঘর-টর ঠিক করে দশটা নাগাদ পেগটির বাড়ির কাছে পৌছালাম। প্রথমে সরাসরি না গিয়ে ওমেরের দোকানে গেলাম। দোকানের দরজাটা তখনো খোলা ছিল এবং হাঁপানির রোগী ওমের পাইপ খাচ্ছিল। আমি তার কাছে বার্কিসের খবরটা জানতে চাইলাম। ওমের আমাকে দেখে খুশি হয়ে আমাকে পাশে বসিয়ে তার মেয়ে মিলীকে পেগটিদের বাড়িতে পাঠাল। ওমের বলল, আমি ঠিক জানি না, তবে তার অবস্থা খুবই খারাপ। বার্কিসের এই অবস্থার জন্য হ্যামের সঙ্গে এমিলির বিয়েটা আটকে আছে।

এমন সময় ওমেরের মেয়ে মিলী ফিরে এসে জানাল, বার্কিসের জ্ঞান ফেরেনি। সেখানে মিঃ পেগটি, হ্যাম ও এমিলি আছে।

আমি পেগটির বাসায় গিয়ে কড়া নাড়তে মিঃ পেগটি দরজা খুলে দিয়ে এক নীরব নিরুচ্চারণ ভঙ্গিতে অভ্যর্থনা জানাল। বলল, আমার বোন মাস্টার ডেভিকে দেখে সান্ত্বনা পাবে।

আমি উপরতলায় গিয়ে দেখলাম বার্কিস বালিশ ছাড়াই অচেতনভাবে শুয়ে আছে। তার বেহুশ মাথাটা একটা বাহুর উপরে তেমনি আছে। পেগটি আমাকে তার বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর বার্কিসের উপর ঝুঁকে বলল, এই যে দেখ, কে এসেছে। মাস্টার ডেভির নাম প্রায়ই করত ও। বড় ভালবাসত তাকে।

বার্কিস একবার চোখ খুলল, কিন্তু কোন কথা বলতে পারল না। আমি বললাম, বার্কিস তুমি আমাকে চিনতে পারছ?

কিন্তু নিরুত্তর বার্কিসের মাথাটা তখনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল।

ব্লান্ডারস্টোনে আমাদের বাড়ির সমাধিপ্রাঙ্গনে বার্কিসের সমাধির জন্য এক টুকরো জমি কিনে রেখেছিল পেগটি। ঠিক হলো সেখানেই বার্কিসকে কবর দেওয়া হবে। পেগটি আমাকে থাকতে বলল।

শোকসূচক কালো পোশাক না পরেই আমি বার্কিসের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া দেখতে গেলাম। আমার মার সমাধির কাছে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। সমাধির কাছের একটা গাছ থেকে কিছু সবুজ পাতা ছিঁড়ে নিলাম। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ হলে আমরা পেগটির বাসায় ফিরে এলাম। পেগটি

বার্কিসের সেই বাক্সটা খুলে তার উইলটা বার করল। বাক্সের মধ্যে মোট সাতাশিটা গিনী পাওয়া গেল। উইলটা আমি পড়ে সবাইকে শোনালাম। বার্কিস সারাজীবন গাড়োয়ানি করে মোট তিন হাজার পাউণ্ড সঞ্চয় করে ব্যাঙ্কে জমিয়ে রেখেছে। বছরে তার সুদ হলো এক হাজার পাউণ্ড। সুদের টাকাটা মিঃ পেগটি যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পাবে। আসল টাকাটা পেগটি, এমিলি আর আমার মধ্যে ভাগ হবে, অর্থাৎ সমানভাগে আমরা পাব।

পরদিন পেগটি আমার সঙ্গে লণ্ডনে গিয়ে উইলের ব্যাপারটা উকিলের সঙ্গে আলোচনা করে এল। ঠিক হলো সন্ধ্যায় আমরা মিঃ পেগটিদের বাড়িতে ফিরে যাব।

লণ্ডনের কাজ সেরে আমাদের ফিরতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। তখন বৃষ্টি পড়ছিল। আকাশজোড়া ঘন কালো মেঘ। আমরা সোজা মিঃ পেগটির সেই নৌকাভবনে চলে গেলাম। মিঃ পেগটি আমাকে ভিজে কোটটা ছেড়ে একটা শুকনো কোট পরতে বলল। ঘরের ভিতরে ঢুকে বেশ গরম আর আরামবোধ হচ্ছিল। কিন্তু একটা ভয়ঙ্কর সংবাদ শুনে চমকে উঠলাম আমি। এমিলি পালিয়ে গেছে বাড়ি থেকে। একটা চিঠি লিখে রেখে গেছে। চিঠিখানি গতকাল রাত্রিতে লেখা। চিঠিটা সে হ্যামকে লিখেছে, আমার কথা ভুলে যেও। মনে কর আমি শৈশবেই মারা গেছি। তোমরা সবাই যে ভালবাসা দান করেছ তার জন্য কৃতজ্ঞ। কিন্তু তোমরা সেসব কথা ভুলে যাবে। কাকাকে আমি আজও তেমনি ভালবাসি। বলা যায় আরও বেশী ভালবাসি। তাঁকে সান্ত্বনা দেবে। যদি কোনদিন ভদ্রমহিলার মত ফিরতে পারি তবে ফিরব। তোমাদের সকলের জন্য আমি প্রার্থনা করি ঈশ্বরের কাছে।

মিঃ পেগটি পাথরের মত হয়ে গেল। হ্যাম বলল, এটা হলো শয়তান স্টীয়ারফোর্থের কাজ। সেই এখানে এসে এসে তার মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে।

আসলে আমিই স্টীয়ারফোর্থকে তাদের সংসারে এনেছিলাম। সেই পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে সে বারবার বন্ধুত্ব ও প্রীতির ভাব দেখিয়ে এসে অবশেষে এমিলিকে তার প্রতি আসক্ত করে তুলেছে। তাকে ভদ্রসমাজে নিয়ে যাবার লোভ দেখিয়েছে।

এসব সত্ত্বেও মিঃ পেগটি বা হ্যাম আমার প্রতি কিছুমাত্র বীতশ্রদ্ধ হলো না। কোন রাগও করল না।

মিঃ পেগটি একটা লণ্ঠন নিয়ে সেই রাত্রিতেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে চাইছিল। কিন্তু হ্যাম তাকে বাধা দিল। বলল, পরে যাবে।

মিঃ পেগটি বলল, জগতের যেখানেই থাক, আমি আমার ভাইঝিকে খুঁজে বার করে আনব।

যাইহোক, কোন রকমে নিবৃত্ত করা গেল মিঃ পেগটিকে। পরদিন সকালে উঠে আমি দেখলাম মিঃ পেগটি ও হ্যাম দুজনেই বাড়িতে নেই। শুধু মিসেস গামিজ আছে। এই ঘটনার পর মিসেস গামিজের জীবন যেন এক বিরাট ধাক্কায় একেবারে বদলে গেছে। সে যেন এখন একেবারে অন্য মানুষ। সে এখন ঘর সংসারের সব কাজ একাই করে। রাঁধা-বাড়া সব করে। তার মাঝে মিঃ পেগটিকে মার মত সান্ত্বনা দেয়।

আমি ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে দেখলাম মিঃ পেগটি ও আর হ্যাম দুজনে চুপচাপ বসে আছে। সারারাত ওদের একটুও ঘুম হয়নি। চোখ মুখ শুকিয়ে গেছে। শান্ত সমুদ্রের মতই

ওরা গম্ভীর। শোকে দুঃখে একেবারে স্তব্ধ।

মিঃ পেগটি আমাকে দেখতে পেয়ে উঠে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল, আপনি কি আজই চলে যাবেন, মাস্টার ডেভি?

আমি বললাম, যেতাম, কিন্তু যদি তোমাদের কোন কাজে লাগতে পারি,সেই ভেবে গেলাম না। আমি কাল সকালে চলে যাব।

মিঃ পেগটি বলল, তাহলে আমিও আপনার সঙ্গে যাব। আমি এমিলিকে খুঁজে বার না করে ফিরব না। আমি প্রথমে স্টীয়ারফোর্থের বাড়িতে একবার যাব। ওর মার সঙ্গে কথা বলব। হ্যামের মনের অবস্থা খুবই খারাপ। ও প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ। কোন কাজে ওর মন বসছে না।

এই বলে চুপ করে গেল মিঃ পেগটি। কিছুক্ষণ পর বলল, ও বাড়িতে আমার আর মন টিকবে না। তবু অন্য কোথাও না গিয়ে ও বাড়িতেই থাকতে হবে। যদি কোনদিন এমিলি ফিরে আসে, তার জন্যে আমাকে ওখানেই থাকতে হবে। রাত্রিতে ঘরের বাইরে একটা আলো জ্বালা থাকবে।

পরদিন আমি মিঃ পেগটিকে নিয়ে একটা ঘোড়ার গাড়িতে করে লণ্ডনের রাস্তা ধরলাম। লণ্ডনে যাবার আগে হাইগেটে নেমে প্রথমে ওকে স্টীয়ারফোর্থের বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আমার মনে হচ্ছিল স্টীয়ারফোর্থ মরে গেছে! মৃত মানুষের স্মৃতি হিসাবে ও আমার মনে বেঁচে থাকবে। ওকে আমি ভুলতে পারব না। তবে আমার কাছে সে এখন মৃত।

মিঃ পেগটি স্টীয়ারফোর্থের মার কাছে আবেদন করলেন, স্টীয়ারফোর্থ এমিলিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছে। সে যাতে বাইরে কষ্ট না পায় তার জন্য তাকে ও বাড়িতে এনে রাখতে পারে স্টীয়ারফোর্থ।

কিন্তু মিসেস স্টীয়ারফোর্থ তাঁর আভিজাত্যবোধের সঙ্গে আপোস করবেন না কোনমতে। উনি বললেন, স্টীয়ারফোর্থ এ কাজ করে অন্যায় করেছে। সে নিজেকে ও আমাদের বংশমর্যাদাকে অপমানিত করেছে। স্টীয়ারফোর্থ আমার একমাত্র সন্তান। তাকে আমি ছাড়তে পারব না। সে যে ভুল করেছে সে ভুল তার ভাঙতে হবে। সে যদি কোনদিন বাড়িতে আসে তবে তার মা বড় না তার প্রেমাস্পদ বড়—এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে তাকে। এই আমার শেষ কথা।

আমি অস্বস্তিতে পড়লাম। মিঃ পেগটি হতাশ হয়ে উঠে পড়ল। বলল, বড় আশা নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু সে আশা আমার ব্যর্থ হলো।

মিঃ পেগটি বাইরে এসে বলল, সে আর বাড়ি ফিরে যাবে না। সে বলল, আমি এমিলিকে খুঁজে বার করবই, না পেলে আমি বাড়ি ফিরব না। তাতে যদি আমার মৃত্যু হয় তো হবে! আমার সঙ্গে তার যদি আর দেখা না হয়, যদি আমার মৃত্যুর পর সে আসে তবে বলবে আজও তার প্রতি আমার ভালবাসা অপরিবর্তিত আছে এবং তাকে আমি ক্ষমা করেছি।

এই বলে পেগটি টুপিটা আমায় দিয়ে রাস্তায় নেমে গেল। ধীরে ধীরে, শহরের জনারণ্যে হারিয়ে গেল মিঃ পেগটি।

পেগটির মূর্তিটা আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমি তার শেষের কথাগুলো কখনো ভুলব না। তাকে বিদায় দিয়ে আমি আমার বাসায় চলে গেলাম।

David Copperfield, by Charles Dickens (Published 1850) Bengali Translation

২৫

পেগটি একটা বাসা নিয়েছিল শহরে। তাকে একটা বিলের ব্যাপারে মিঃ স্পেনলোর অফিসে আসতে হয়েছিল। আমি তাকে সাহায্য করতে লাগলাম। পেগটির এই সব কাজের ভার আমিই নিয়েছিলাম। আমি সব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে দিলাম। আমি তার উইলটা প্রমাণ করার ব্যবস্থা করলাম। কোর্টের অফিসে গিয়ে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারগুলো ঠিক করলাম। তারপর আমি তাকে ব্যাঙ্কে নিয়ে গেলাম।

এইসব কাজ সেরে পেগটির মনটাকে একটু আনন্দ দেবার জন্য তাকে ফ্লীট স্ট্রীটে মূর্তিশিল্পের এক প্রদর্শনী দেখালাম। প্রদর্শনীর নাম লিনউড-এর প্রদর্শনী। তারপর তাকে লণ্ডন টাওয়ার দেখালাম। তাকে নিয়ে সেন্ট পল গীর্জার মাথার উপরে উঠলাম। এই সব দেখে বেশ আনন্দ পেল পেগটি।

এরপর তাকে নিয়ে মিঃ স্পেনলোর অফিসে আইনগত পরামর্শের ফী জমা দিতে নিয়ে গেলাম। তাকে একটা বিল দেওয়া হয়েছিল। সেই বিলটা দেখিয়ে টাকা জমা দিলাম।

মিঃ স্পেনলো তখন অফিসঘরে ছিলেন না। প্রবীন কেরানীটি বলল, তিনি এক ভদ্রলোকের বিয়ের লাইসেন্সের ব্যাপারে ব্যস্ত আছেন। এখনই এসে পড়বেন।

কিছুক্ষণের মধ্যে আমি ও পেগটি দেখতে পেলাম মিঃ স্পেনলো মিঃ মার্ডস্টোনের সঙ্গে কথা বলছেন। আমরা দুজনেই মার্ডস্টোনকে এড়িয়ে যেতে চাইছিলাম। বুঝতে পারলাম মার্ডস্টোন আবার বিয়ে করছেন। তাঁকে দেখেও দেখছিলাম না আমরা।

কিন্তু মার্ডস্টোন আমাদের দেখতে পেয়েই এগিয়ে এলেন।

মার্ডস্টোনকে দেখে মনে হলো তাঁর চেহারার অতি অল্পই পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর চুল আর গালপাট্টা আগের মতই কালো আছে। মিঃ মার্ডস্টোন আমাকে বললেন, আশা করি তোমার কাজকর্ম এখন ভালই চলছে?

আমি বললাম, আপনার সেটা শুনতে খুব ভাল লাগবে না। এই প্রথম আমি নির্ভয়ে তাঁর মুখপানে তাকালাম। আবার তিনি পেগটিকে বললেন, পেগটি তোমার স্বামীর মৃত্যুসংবাদ শুনে দুঃখিত হলাম।

পেগটি বলল, এটাই আমার জীবনে মৃত্যুজনিত একমাত্র ক্ষতি নয় মিঃ মার্ডস্টোন। আর একটা বড় ক্ষতি আমাকে সহ্য করতে হয়েছে। তবে এই ক্ষতিটার জন্য কারো উপর দোষারোপ করা চলবে না। এতে কারো দোষ নেই।

মার্ডস্টোন বললেন, এটা একটা ভাল সান্ত্বনা। তুমি তোমার কর্তব্য পালন করেছ।

পেগটি বলল, আমি এটা ভেবে সান্ত্বনা পাই যে, আমি কারো জীবনকে তিলে তিলে ক্ষয় করিনি। একটি সুন্দর প্রাণীকে ভয় দেখিয়ে তার জীবনকে এক ভয়ঙ্কর উদ্বেগে পীড়িত করে নিতান্ত অকালে তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিইনি।

কথা বলতে বলতে আমার মার কথা ভেবে পেগটি রাগে কাঁপছিল। মিঃ মার্ডস্টোনও রেগে গিয়ে বলল, আমাদের আর দেখা না হওয়াই ভাল। সেটা উভয়পক্ষেরই স্বস্তির বিষয়। তোমরা

www.banglainternet.com

আগে নিজেদের স্বার্থে আমার ন্যায়সঙ্গত প্রভুত্ব ও কর্তৃত্বের উপর সব সময় বিদ্রোহ করে এসেছ। আজও তোমাদের মনে সেই বিদ্বেষ ও আক্রোশ রয়ে গেছে।

আমি তাঁকে বাধা দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, এটা পুরনো বিদ্বেষ। এটা বর্তমানের ব্যাপার নয়।

মিঃ মার্ডস্টোন মৃদু হেসে তাঁর কালো কুটিল চোখের দৃষ্টি দিয়ে আমার আপাদমস্তক একবার দেখে বললেন, এই বিদ্বেষের জন্ম হয়েছিল তোমার শিশু হৃদয়ে। এই বিদ্বেষই তোমার হতভাগিনী মায়ের জীবনকে তিক্ত করে তোলে। আশা করি তুমি এবার ভাল হবে। নিজেকে সংশোধন করবে।

এই বলে তিনি তাঁর কথা শেষ করলেন। আমরা অবশ্য সকলেই খুব নীচু গলায় কথা বলছিলাম—যাতে তা আর পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পারে।

মিঃ স্পেনলোর আইন ব্যবসার লোকেরা অনেক জটিল পারিবারিক সমস্যাজনিত মামলার সম্মুখীন হন। অনেক বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা আসে, আবার অনেকে আসে নতুন বিবাহের লাইসেন্স নিতে। মিঃ মার্ডস্টোন টাকা দিয়ে তার নতুন বিয়ের লাইসেন্সের কাগজটা হাতে নিয়ে ভাঁজ করে রাখল। মিঃ স্পেনলো এবার আমাদের সামনে বসলেন। তারপর বললেন, তুমি এই ভদ্রলোককে চেন?

আমি সংক্ষেপে বললাম হ্যাঁ, আগে চিনতাম।

তিনি আবার বললেন, এই বিয়েটা ভালই হলো।

আমি বললাম, এ বিষয়ে আমি বিন্দুবিসর্গ জানি না।

আমি আমাদের পারিবারিক ব্যাপারের কোন কথা মিঃ স্পেনলোকে জানাতে চাইলাম না এবং মিস মার্ডস্টোনকেও এবিষয়ে নিষেধ করে দিয়েছি।

মিঃ স্পেনলো আবার বললেন, মিঃ মার্ডস্টোন যা বলল আর মিস মার্ডস্টোন যা বলে তাতে তো ভালই মনে হচ্ছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি টাকা পয়সার দিক থেকে কথাটা বলছেন?

উনি বললেন, আমি যতদূর জেনেছি, শুধু টাকা কেন, সৌন্দর্যও এর মধ্যে আছে।

এরপর মিঃ স্পেনলোর সঙ্গে আমি কোর্টে গেলাম। সেখানে অদ্ভুত এক বিবাহবিচ্ছেদের মামলা চলছিল। একটা লোকের নাম টমাস বেঞ্জামিন। এই নামেই সে প্রায় দুবছর আগে বিয়ে করে। কিন্তু তখন তার নাম শুধু টমাস বলেছিল। এই নামেই সে বিয়ে করেছিল। এরপর সে তার স্ত্রীর আচরণে বিরক্ত হয়ে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করে বলছে তার নাম টমাস বেঞ্জামিন। সুতরাং তার বিচার হয়নি। কোর্ট তার কথাই মেনে নিয়ে রায় দেয়।

এরপর মিঃ স্পেনলোর সঙ্গে তাঁদের অফিস বাড়ির অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমি বললাম, এই শহর ও শহরতলির বহু লোকের কত দলিল ও উইল অনাদৃত অবস্থায় এখানকার অফিসঘরে পড়ে থাকে। অনেক হারিয়ে যায়। এখানে বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। এর জন্য এক নতুন বাড়ি চাই।

মিঃ স্পেনলো বললেন, যাদের দলিল বা উইল এখানে আছে, তারা যদি মনে করে এখানে তা নিরাপদেই আছে, তাহলে কারো কিছু বলার থাকতে পারে কি?

আরো কিছু কথাবার্তার পর মিঃ স্পেনলো আমাকে বললেন, আগামীকাল ডোরার জন্মদিন। একটা ছোটখাটো ভোজনসভার মত অনুষ্ঠান হবে। তুমি তাতে যোগদান করলে আমি খুশি হব।

পরদিন আমি নির্দিষ্ট সময়ে একটা বড় ও সুন্দর ফুলের তোড়া নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে মিঃ স্পেনলোর নরউডের বাড়িতে চলে গেলাম। মিলি নামে একটি মেয়ের সঙ্গে ডোরা তাদের বাগানে বসেছিল। আমি গিয়ে তাকে তোড়াটা দিতেই সে খুব খুশি হলো। মিঃ স্পেনলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে ডোরা ছুটে গিয়ে তাঁকে ফুলগুলো দেখিয়ে আনন্দের আবেগে বলল, দেখ বাবা, কি সুন্দর ফুল!

আমার উল্টোদিকের সীটে বসেছিল ডোরা। জিপ তার কোলে বসেছিল। মিলি আমাদের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতিশীল। ডোরার প্রতি আমার ভালবাসার ব্যাপারটা ও ভালভাবেই বোঝে। সে আমার ও ডোরার দুজনেরই প্রতি প্রীতির ভাব দেখালো। ভোজসভায় যারা যোগদান করেছিল তারা সব একে একে চলে যেতেই আমরা আবার নরউড-এর পথে যাত্রা করলাম।

মিঃ স্পেনলো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। আমাকে বললেন, আজ তুমি থেকে যাও।

একসময় ডোরাকে বাড়ির মধ্যে তার ঘরে একা পেয়ে নিজের দ্বিধা সত্ত্বেও তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম তাকে ছাড়া আমি বাঁচব না। আবেগের বশে আমি অনেক কথা বলে ফেললাম। এর পর আমরা দুজনে পাশাপাশি বসলাম। আমরা দুজনে পরস্পরের মায়ায় আবদ্ধ হলাম। আমাদের অব্যক্ত প্রেম ব্যক্ত হয়ে উঠল। আমি তাকে বিয়ে করব বলে প্রতিজ্ঞা করলাম। কিন্তু ডোরা বলল, তার বাবার অনুমতি ছাড়া কি করে হবে তা?

আমার কিন্তু অতশত চিন্তা করার মত মানসিক পরিস্থিতি ছিল না।

ডোরা এবার মিস মিলিকে দেখতে না পেয়ে ছুটে গিয়ে এক জায়গা থেকে ধরে নিয়ে এল। তাকে কেমন চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল। মিস মিলি ভালবেসে দুঃখ পেয়েছে। যাকে সে ভালবাসত তার কাছে দুঃখ পেয়ে হতাশায় ভুগছে সে। তবু তরুণ তরুণীদের ভালবাসা দেখে সে আনন্দ পায়। নিজে ভালবাসায় ঘা খেলেও পরের যে কোন ভালবাসাকে শ্রদ্ধার চোখে দেখে।

২৬

আমি একখানি দীর্ঘ চিঠি লিখে ডোরার সঙ্গে আমার প্রেমবন্ধনের কথাটা অ্যাগনিসকে লিখলাম। ইয়ারমাউথ থেকে এমিলির পালিয়ে যাওয়ার কথাটাও জানালাম। কিন্তু স্টীয়ারফোর্থের নাম উল্লেখ করলাম না।

অ্যাগনিসকে লেখা চিঠির উত্তরটা খুব তাড়াতাড়িই পেয়ে গেলাম। চিঠিটা এমনভাবে লেখা যাতে মনে হলো অ্যাগনিস যেন আমার সঙ্গে কথা বলছে।

পেগটি এখন আমার বাসাতেই থাকে। আমি তাকে ইয়ারমাউথ থেকে নিয়ে এসেছি।

আমি একদিন যখন বাড়িতে ছিলাম না, ট্যাড্‌লস্ আমার খোঁজে আমার বাসায় আসে।

পেগটির সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় হয়। পেগটি বলে, সে আমার পুরনো ধাত্রী—পরে আমি এসে পড়ি।

ট্যাড্‌লস্‌কে দেখে খুশি হয়ে অভ্যর্থনা জানাবার পরেই তার কাছে জানতে পারলাম, সে এখন আর মিকবারদের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে না। সে বলল, মিঃ মিকবার এখন পাওনাদারদের ভয়ে নাম পাল্টে মর্টিমার নাম ধারণ করেছেন। তিনি দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরোন না। রাত্রিতে বার হন। আমরা যখন একসঙ্গে থাকতাম তখন তাঁর পাওনাদার এসে টাকার দায়ে আমার ঘর থেকে সব জিনিসপত্র নিয়ে যায়।

আমি তা শুনে বললাম, এটা সত্যিই খুব দুঃখের কথা।

এর পর ট্যাড্‌লস্‌ আমাকে ডোরার কথা জিজ্ঞাসা করল। বলল, ওরা কি লণ্ডনেই থাকে?

আমি বললাম, লণ্ডনের নিকটেই।

ট্যাড্‌লস্‌ তখন বলল, আমরা থাকি ইয়ক্‌শায়ারে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পেগটি বাজারে গিয়ে একটা সুন্দর ফুলদানি কিনে আনল। তারপর ট্যাড্‌লস্‌কে বলল, এটা তোমার বাসায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

ট্যাড্‌লস্‌ খুশি হয়ে বলল, পাঠাতে হবে না, আমিই ওটা বয়ে নিয়ে যাব।

আমি বললাম, খুব ভাল হয়েছে।

আমি ট্যাড্‌লস্‌কে কিছুটা এগিয়ে দিতে গেলাম। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে বলতে কিছুটা দেরি হলো। আমি বাসায় ফিরে আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

দেখলাম পিসিমা মিঃ ডিককে নিয়ে এসে হাজির। আমার পিসী বারান্দায় একটা বাক্সের উপর বসে আছেন। তিনি তাঁর মালপত্র নিয়ে এসেছেন। এ অবস্থায় তাঁকে হঠাৎ দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম আমি। তবু তাতে আনন্দ পেলাম আমি। আমি তাঁকে ঘরে নিয়ে গিয়ে চেয়ার বা সোফায় বসতে বললাম। কিন্তু তিনি বললেন, না, আমি আমার এই সম্পত্তির উপরেই বসব।

পেগটির সঙ্গে পিসিমার পরিচয় করিয়ে দিলাম। ওর কথা তাঁকে আগেই বলেছিলাম। পেগটির বিয়ে ও তার স্বামী বার্কিসের মৃত্যুর কথা জানালাম।

সেই থেকে তিনি পেগটিকে উনি বার্কিস বলে ডাকতেন। পেগটিকে দেখে উনি খুশি হলেন। তার হাতে করা চা উনি তৃপ্তির সঙ্গে খেলেন।

চা খাওয়ার পর ঘরের ভিতরে গিয়ে পিসিমা বললেন, আমি সর্বস্বান্ত হয়েছি ট্রট। আর আমার কিছু নেই। জগতে থাকবার বলতে যা আছে তা হচ্ছে আমার সঙ্গের এই মালপত্র। অবশ্য আমার বাড়িটা আছে। আমি জেনেটকে সেটা ভাড়া দিতে বলেছি।

কথাটা শুনে আমি আরও আশ্চর্য হয়ে গেলাম। তার মত বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমতী মহিলা সর্বস্ব হারাতে পারেন! এটা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আমি আমার সারা জীবনের মধ্যে এত বিস্ময় আর কখনো অনুভব করিনি।

আমি তখন মিস বেটসির দিকে তাকিয়ে তাঁকে দেখছিলাম। সত্যিই আশ্চর্য চরিত্রের মহিলা। দেখলাম সর্বস্বান্ত হারালেও তাঁর মানসিক দৃঢ়তা একটুও শিথিল হয়নি। শান্ত ও আত্মস্থ ভাবটি

আগের মতই অটুট আছে তাঁর গম্ভীর চোখেমুখে। কিভাবে আত্মশক্তি অটুট রেখে অবিচলিত চিত্তে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, যত সব পার্থিব ক্ষয়ক্ষতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে হয়, তা নতুন করে শিখলাম পিসিমার কাছ থেকে। আজ নতুন করে শ্রদ্ধা জানালাম তাঁকে মনে মনে। তাঁর থেকে আমরা সকলেই শিক্ষা পেতে পারি।

তিনি বললেন, সাহসের সঙ্গে আমাদের সব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হওয়া উচিত। কোন বিপদ বা বিপর্যয়ে আমরা যেন ভয় না পাই। বিপর্যয়কে যেন আমরা জয় করতে পারি।

বড় রাস্তার ওপারে মিঃ পেগটি যে ঘরটায় শুত, সেইখানে মিঃ ডিক-এর শোয়ার ব্যবস্থা হলো। পেগটি তাকে সঙ্গে করে দিয়ে এল। আমার ঘরে আমার বিছানায় পিসিমা শুলেন। আমি বসার ঘরে শুলাম। কিন্তু আসলে আমার পিসী কিভাবে তাঁর সর্বস্ব হারিয়েছেন তা তখনো পর্যন্ত জানতে পারলাম না। তবে দেখলাম, কেন জানি না, পেগটিকে তাঁর খুব ভাল লেগে গেছে। তার সঙ্গে তিনি খুব ভাল ব্যবহার করছেন।

সে রাতে ভাল ঘুম হলো না আমার। আমার মন একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। আমার হাতে টাকা-পয়সা নেই। পিসীর কাছ থেকে আর কিছু পাওয়া যাবে না। এ অবস্থায় আমার পক্ষে প্রোমোটর হওয়ার বাসনা করা এবং স্পেনলোদের কোম্পানিতে শিক্ষানবিশি করা সম্ভব নয়। এখন কোন একটা চাকরি করে নিজের খরচ চালিয়ে পিসিকে কিছু করে সাহায্য করা উচিত। আমি ঠিক করলাম স্পেনলোদের কোম্পানিতে আমার জন্য যে এক হাজার পাউণ্ড দেওয়া আছে সেটা তোলার জন্য চেষ্টা করব। কিন্তু আমার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তা হলো ডোরাকে নিয়ে। আমি তাকে বিয়ে করব বলে কথা দিয়েছি। কিন্তু এই অবস্থায় আমি বিয়ে করব কি করে? তাছাড়া মিঃ স্পেনলোকে সব কথা বললে তিনি আমার সঙ্গে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন কেন?

পরদিন সকালে প্রাতরাশের টেবিলে পিসী আমাকে বললেন, আমি পেগটির কাছ থেকে তোমার কথা শুনেছি। তোমার ভালবাসার কথাও।

আমি দেখলাম ব্যাপারটা তিনি ভালভাবেই নিয়েছেন। আমি বললাম, হ্যাঁ, ডোরাকে আমি ভালবাসি, মেয়েটি বড় ভাল। সে আমাকে ভাল না বাসলে বা তাকে আমি না পেলে আমি যে কি করব তা জানিনা।

মিস বেটসি বললেন, তোমরা দুজনেই বয়সে তরুণ। তোমাদের প্রেমকে অস্বীকার করছি না আমি। কিন্তু দুজনেই তোমরা অনভিজ্ঞ। এত তাড়াতাড়ির কিছু নেই। পরে যা হয় হবে।

আমি প্রাতরাশের পর পিসীকে কিছু না বলেই অফিসে চলে গেলাম। আধ ঘণ্টা আগেই সেখানে পৌঁছে মিঃ স্পেনলোর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মিঃ স্পেনলো তাঁর ঘরে এসে বসলে আমি তাঁর কাছে গিয়ে সব কথা জানালাম। বললাম, আমার পিসী সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এখন আমার কোন রোজগার নেই। এ অবস্থায় আমার পক্ষে শিক্ষানবিশি করা আর সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম আমার নামে যে হাজার পাউণ্ড জমা আছে, সেটা যদি তুলে দিতে পারেন তো ভাল হয়।

মিঃ স্পেনলো আমার প্রতি তাঁর যথেষ্ট সহানুভূতি থাকলেও বললেন, এটা আমাদের কোম্পানির পক্ষে নীতিবিরুদ্ধ কাজ। এটা আইনসম্মত নয়। তাছাড়া আমার একজন অংশীদার

আছেন। তিনি আপত্তি করবেন।

আমি বললাম, আমি কি মিঃ জর্কিনস-এর সঙ্গে দেখা করব?

তিনি বললেন, আমি মিঃ জর্কিনসকে জানি। কোন লাভ হবে না। তবে একান্তই যেতে চাও তো যাও।

আমি মিঃ জর্কিনসকে গিয়ে সব কথা বলে একই অনুরোধ করলাম। কিন্তু তিনি কোনমতেই রাজী হলেন না।

অবশেষে আমি হতাশ হয়ে অফিস থেকে বার হলাম। আমি ভাবতে ভাবতে আমার বাসার পথে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ একটা ঘোড়ার গাড়ি থেকে হাত বাড়িয়ে অ্যাগনিস আমায় ডাকল। আমি তাকে দেখে আনন্দের আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলাম। এ মুহূর্তে তাকেই আমি চাইছিলাম। যার সাহচর্য, যার পরামর্শ একান্তভাবে কামনা করছিলাম সেই অ্যাগনিস অপ্রত্যাশিতভাবে এসে হাজির!

আমি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। অ্যাগনিস গাড়ি থামিয়ে নেমে এসে পথ চলতে লাগল আমার সঙ্গে। আমি বললাম, কোথায় যাচ্ছিলে?

অ্যাগনিস বলল, বাবা হীপকে নিয়ে ব্যবসার কাজে লণ্ডনে এসেছেন। আমি তোমার পিসীর চিঠি পেয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছি।

আমি বললাম, এই বিপদের দিনে আমি তোমাকেই কাছে পেতে চাইছিলাম অ্যাগনিস।

আমরা দুজনে একসঙ্গে আমার বাসায় চলে গেলাম। অ্যাগনিসকে দেখে আমার পিসি খুশি হলেন। তাকে কাছে বসিয়ে সব কথা খুলে বললেন, আমিও তার পাশে বসলাম।

পিসিমা অ্যাগনিসকে খুব ভালবাসতেন। তার বুদ্ধিমত্তার প্রশংসা করতেন। কারণ সে ধীর-স্থির, বুদ্ধিমতী। তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, আমি আগে আমার সব টাকা মিঃ উইকফিল্ডের পরামর্শক্রমে কিছু জমিতে লগ্নী করি। তার থেকে ভালই সুদ পেতাম। আমার এই কারবারে মিঃ উইকফিল্ড ছিলেন আমার পরামর্শদাতা। পরে আমার মনে হলো মিঃ উইকফিল্ড আগের মত ব্যবসার কাজে তেমন মন দিতে পারছেন না। তাই আমি আমার সব টাকা তুলে নিয়ে বিদেশী বাজারে লগ্নী করি। কিন্তু তার থেকে সব লোকসান হলো। ব্যাঙ্কে আমার শেয়ার কত আছে তা আমি জানি না, কারণ সে ব্যাঙ্ক আছে পৃথিবীর অপর প্রান্তে। এখন টাকা পয়সা বলতে আমার কিছু নেই। ডোভারে যে বড়ো বাড়িটা আছে সেটা ভাড়া খাটিয়ে বছরে সত্তর পাউণ্ড পেতে পারি। ডিককে মনে করছি ওর আত্মীয়দের কাছে পাঠিয়ে দেব। যদিও আমি ছাড়া তার প্রতি আর কেউই সহানুভূতিশীল নয়। আমি ছাড়া তার মর্ম কেউ বোঝে না। এখানে এই বাসাটা ছমাসের জন্য নেওয়া আছে।

এই বলে পিসিমা চুপ করলে অ্যাগনিস বলল, এই হলো আপনার ইতিহাস।

পিসিমা বললেন, হ্যাঁ, আমার যদি আরও টাকা থাকত তাহলে হয়ত তা কোথাও লগ্নী করে সব হারাতাম। কিন্তু যেহেতু আর টাকা নেই, আর হারানোরও কিছু নেই। আমার টাকাও নেই, ইতিহাসও শেষ। এখন সমস্যা হচ্ছে, আমার ও ট্রটের কিভাবে চলবে?

আমি তখন তাঁকে স্পেনলোর কোম্পানিতে আমার জন্যে জমা দেওয়ার টাকাটা তোলার জন্য আমি যে চেষ্টা করেছিলাম তা বললাম।

পিসিমা বললেন, ভাল কাজ করনি।

আমি বললাম, আমাকে এখন যা হোক একটা কিছু করতে হবে।

অ্যাগনিস আমাকে বলল, ইউরিয়া হীপ এখন তার মাকে নিয়ে আমাদের বাড়িতেই থাকে। তুমি যে ঘরটাতে শুতে সে এখন সেই ঘরেই শোয়। তার মা আমার কাছে কাছেই থাকে। সে সব সময় তার ছেলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এক একসময় বিরক্তিকর মনে হয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ইউরিয়া কি তোমার বাবার উপর সেইভাবেই প্রভাব বিস্তার করে চলে?

অ্যাগনিস বলল, হ্যাঁ। সে বাবাকে একেবারে হাত করে ফেলেছে। বাবার চেহারাটা তেমনি খারাপ। তবে মনের উদ্বেগটা কমেছে। ইউরিয়া হীপ এখন তাঁর ব্যবসার অংশীদার। ব্যবসার কাজেই তাঁরা লণ্ডনে এসেছেন।

এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হলো। অ্যাগনিস বলল, বাবা এসে গেছেন। আমি তাঁকে এখানে আসতে বলেছিলাম।

আমি নিজে দরজা খুলে দিলাম। দেখলাম মিঃ উইকফিল্ড দাঁড়িয়ে আছেন, সঙ্গে ইউরিয়া হীপ। আমি দেখলাম মিঃ উইকফিল্ডের পোশাক আশাক ধোপদুরস্ত থাকলেও তাঁর বয়স অনুপাতে তাঁকে অনেক বেশী বৃদ্ধ মনে হচ্ছে।

ইউরিয়া আমার সঙ্গে করমর্দন করে বলল, কেমন দেখছেন উইকফিল্ডকে. মাস্টার কপারফিল্ড? এখন আমি ও আমার মা দুজনে মিলে এঁদের সেবা করছি।

এই বলে ইউরিয়া এমনভাবে তার দেহটা কাঁপাল যা দেখে আমার পিসী রেগে গিয়ে বললেন, লোকটা ওরকম করছে কেন?

ইউরিয়া বলল, ক্ষমা করবেন মিস ট্রটউড। আমি জানি আপনি স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগছেন।

একথায় পিসিমা আরও রেগে গিয়ে বললেন, নিজের চরকায় তেল দাও। আমাকে অমন কথা বলতে এস না, আমি ও ধরনের মানুষ নই। যদি মানুষের মত মানুষ হতে চাও তাহলে মানুষের মত আচরণ কর। নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সংযত কর।

ইউরিয়া আমাকে বলল, আপনাদের এই দুর্দিনে যদি আমরা কোন কাজে লাগতে পারি তাই ভেবেই এলাম!

আমি চুপ করে রইলাম। অ্যাগনিসও চুপ করে বসেছিল। মিঃ উইফিল্ড বললেন, হ্যাঁ, ইউরিয়া হীপ এখন বেশ কাজের লোক হয়ে উঠেছে। এখন ও ব্যবসার কাজে খুব খাটছে। আমার বোঝাটা অনেক হালকা করে তুলেছে।

আমার মনে হল মিঃ উইকফিল্ড সব কথাগুলো জোর করে বলছেন। এগুলো তাঁর মনের কথা নয়। তাঁকে যেন কেউ শিখিয়েছে।

ইউরিয়া বিদায় নিয়ে চলে গেল। যাবার সময় আমাকে বলে গেল, আমি কিছু মনে করিনি। আমি মিস ট্রটউডকে বহুদিন আগে থেকেই জানি। উনি মানুষ হিসাবে খুবই ভাল। তবে চট করে রেগে যান।

অ্যাগনিস ও উইকফিল্ড আমাদের সঙ্গে ডিনার খেল। তারপর অ্যাগনিসকে এগিয়ে দিতে গেলাম পিসিমাকে বলে। অ্যাগনিস হঠাৎ আমাকে বলল, তুমি একজনের একান্ত সচিবের কাজ করবে?

আমি বললাম, পাই তো অবশ্যই করব। আমি তো কাজ খুঁজছি।

সে বলল, ডঃ স্ট্রং এখন স্কুল থেকে অবসর নিয়ে বাড়িতেই থাকেন। তাঁর লেখালেখির কাজে সহায়তার জন্য একটা লোকের খোঁজ করতে বলেছিলেন। তুমি তাঁর ছাত্র ছিলে। তোমাকে পেলে নিশ্চয় তিনি খুশি হয়ে তোমাকে নেবেন।

আমি আনন্দের আবেগে অ্যাগনিসের হাত ধরে বললাম, সত্যিই তুমি আমার প্রকৃত হিতৈষিনী, আমার অতি আদরের দেবদূত।

অ্যাগনিস হাসিমুখে বলল, তোমার দেবদূত আমি না ডোরা তা তুমি নিশ্চয় জান।

আমি তৎক্ষণাৎ একটা চিঠি লিখে ডঃ স্ট্রংকে আমার আবেদনের কথা জানিয়ে দিলাম। চিঠিটা লিখেই ডাকে ফেলে দিয়ে এলাম।

অ্যাগনিস বলল, উনি হাইগেটের কাছে ওনার বাড়িতেই থাকেন। তুমি ওঁর সঙ্গে দেখা করতে পার যেকোন দিন।

২৭

পরদিনই আমি হাইগেটে চলে গেলাম। এই বিপর্যয়ে প্রথমটায় খুব ঘাবড়ে গেলেও এখন আমি সেই বিস্ময়-ঘোর ভালই কাটিয়ে উঠেছি।

এখন আমার শুধু একটাই চিন্তা—আমি আমার পিসীকে দেখাতে চাই, তিনি একদিন আমার প্রতি যে করুণা, যে মমতা দেখিয়েছেন, আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যেভাবে অকাতরে আমাকে সাহায্য করে এসেছেন, সে করুণা, সে মমতা ও সাহায্য যে একজন অকৃতজ্ঞ লোকের উপর বর্ষিত হয়নি, সেই সব কিছুই আমি ভুলে যাইনি, তিনি যে অপাত্রে দান করেননি, — এটা আমি দেখাতে চাই।

আমি ডঃস্ট্রং-এর সঙ্গে দেখা করার জন্য হাইগেটের পথে রওনা হলাম। পথে শুধু ডোরার কথা ভাবতে লাগলাম। এত দুর্দশার মধ্যে পড়েও তাঁর প্রতি ভালবাসা আমার একটুও কমল না। তার সঙ্গে বিয়েটা হয়ে গেলে সংসার চালাতে হবে আমায়। তার জন্য আমাকে একটা ভাল কাজ করতে হবে। স্ট্রং-এর কাছে কাজ ছাড়া যদি অন্য কোন কাজ পাই আর একটা চাকরি করব।

পথে দেখলাম একটা লোক হাতুড়ী দিয়ে পাথর ভাঙ্গছে এক জায়গায়। শ্রমের কি কষ্ট,

কিভাবে মানুষ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রুজি রোজগার করে তা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে জানবার জন্য আমি লোকটার কাছ থেকে কিছুক্ষণের জন্য হাতুড়ীটা চেয়ে নিয়ে কয়েকটা পাথর ভাঙ্গলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি ক্লান্ত হয়ে গেলাম। ঘামে ভিজে গেল আমার সারাটা শরীর।

পথের ধারে আর এক জায়গায় দেখলাম অল্প টাকায় একটা বাড়ি ভাড়া পাওয়া যায়। আমি বাড়িটা দেখে নিলাম ভিতরের দিকে গিয়ে। মনে হলো, আমাকেও হয়ত এই বাড়ীর মধ্যেই একটা ঘর নিতে হবে।

হাইগেটে ডঃ স্ট্রং-এর বাড়িটা হলো স্টীয়ারফোর্থদের বাড়িটার উল্টো দিকে। ওদের বাড়িটা আমি এড়িয়ে গেলাম।

বাড়ির কাছে গিয়ে দেখলাম, ডঃ স্ট্রং বাগানে পায়চারি করছিলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই উনি দুহাত বাড়িয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, বললেন, গতকালই তোমার চিঠি পেয়েছি। আর আমার কাজ ছাড়াও তোমাকে অন্য কিছু একটা করতে হবে। বছরে সত্তর পাউণ্ড—এতে কখনো চলতে পারে?

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করে বললাম, হ্যাঁ আমাকে আর কিছু একটা করতেই হবে।

ডঃ স্ট্রং বললেন, হ্যাঁ করবে। আমার ডিকশনারির কাজ সকালে ছ'ঘন্টা আর সন্ধ্যের সময় ছ'ঘন্টা করলেই হবে। আমি বছরে সত্তর পাউণ্ড ছাড়াও বছরে দু'বার ভাল উপহার দেব।

আমি বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে বললাম, ডিকশনারির কাজ করতে আমার খুব ভাল লাগবে।

এরপর তিনি আমাকে বাড়ির ভিতর তাঁর স্ত্রী অ্যানীর কাছে নিয়ে গেলেন। আমরা একসঙ্গে প্রাতরাশ খেলাম। অ্যানীর ভাই জ্যাক মেলডন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এল। কিন্তু সে প্রাতরাশ খেল না। বলল, খেয়ে এসেছে।

ডঃ স্ট্রং-এর বাড়ি থেকে আমি সোজা ট্র্যাড্‌লস্ এর কাছে চলে গেলাম। যদি তার কাছে বাড়তি একটা কাজের সন্ধান পাই—এই আশাতেই গেলাম।

ট্র্যাড্‌লস্ আমায় পরামর্শ দিল, পার্লামেন্টে বিভিন্ন দলের সদস্যদের মধ্যে যে বিতর্ক হয়, সেই বিতর্কের বিবরণ লিখে খবরের কাগজে দিলে তা প্রকাশিত হবে। এর জন্যে দু তিনটে খবরের কাগজের নাম করল সে। তবে রিপোর্ট লেখার জন্য শর্টহ্যাণ্ড শিখতে হবে। তাছাড়া একাজ ভাল করে শিখতে হলে বা দক্ষতা অর্জন করতে হলে ছয়টি ভাষা শিখতে হবে।

আমি উৎসাহিত হয়ে ট্র্যাড্‌লস্‌কে বললাম, আমি কাল থেকেই শিখব।

আমার এই উদ্যম দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল সে। বললাম, আমি একটা বই কিনে নেব। অফিসে অবসর পেলেই পড়ব। কোর্টের উকিলদের তর্ক-বিতর্কের বিবরণ লেখার চেষ্টা করব। তাতে একটা অভিজ্ঞতা হবে।

এর পর মিঃ মিকবারের কথা উঠল। আমি ইতিমধ্যে মিঃ মিকবারের কাছ থেকে একখানি চিঠি পেয়েছিলাম। তিনি বিশেষ আনন্দের সঙ্গে লিখেছেন তিনি নাকি খুব ভাল একটা কাজ পেয়েছেন। তিনি আর কোন একটা প্রাদেশিক শহরে গিয়ে বাস করবেন এবং সেখানেই প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন। আর তাঁর কোন অভাব থাকবে না। যত সব ধুলো আর ছাই ভস্মের স্তূপ থেকে

বরিয়ে এসে এক নতুন জীবন লাভ করবেন।

ট্র্যাড্‌লস্‌ বলল, তোমার আমার নিমন্ত্রণ আছে আজ সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে।

আমি বললাম, তাহলে তো যেতেই হবে।

এরপর আমরা দুজনেই সেই বাড়িটাতে গেলাম, যে বাড়িটা মিঃ মিকবার মর্টিমার নাম ধারণ করে ভাড়া নিয়েছেন।

আমরা সেই বাসায় গিয়ে দেখলাম একখানা মাত্র বসার ঘর, সেটাই শোবার ঘর হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আমি মিঃ মিকবারের আট বছরের ছেলেটা আর তার বোনের সঙ্গে নতুন করে পরিচয় শুরু করলাম।

মিঃ মিকবার আমাদের প্রায়ই বলতেন, তাঁর মা নাকি তাঁর এই মেয়ের মধ্যে ফিনিক্স পাখির মত নতুন রূপে জন্মগ্রহণ করেছেন!

মিঃ মিকবার আবেগের সঙ্গে আমাদের বললেন, হে আমার প্রিয় কপারফিল্ড, তুমি আর মিঃ ট্র্যাড্‌লস্‌—তোমরা আমাদের বিদেশ যাত্রার প্রাক্কালে এসে পড়েছ। সুতরাং তোমাদের আদর আপ্যায়নে যদি কোন ত্রুটি হয় তাহলে মার্জনা করবে।

আমি বললাম, আপনাদের মালপত্র তো বাঁধা হয়ে গেছে। আর মালপত্রও তো খুব একটা বেশী নয়।

আমি মিঃ মিকবারকে তাঁদের দুঃসহ জীবনের আসন্ন ও আকাঙ্খিত পরিবর্তনে শুভেচ্ছা জানালাম।

মিসেস মিকবার বললেন, কি করব, আমাকে যেতেই হবে। আমার বাপের বাড়ির আত্মীয়স্বজনেরা যাই বলুক, আমি তো আমার স্বামীকে ছাড়তে পারব না। আমি আমার স্বামীর স্ত্রী, তাঁর সন্তানের মা। অবশ্য এই রাজধানী বা প্রধান নগরী ছেড়ে আমরা যে ক্যাথিড্রাল টাউনটায় যাচ্ছি তা আমার ও মিঃ মিকবারের মত উচ্চাভিলাষী লোকের পক্ষে যথেষ্ট নয়।

আমি ভেবেছিলাম ওরা এক নতুন সৌভাগ্যের সন্ধান পেয়ে কোন দূর দেশে যাচ্ছেন।

আমি তাই আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, ক্যাথিড্রাল টাউনে!

এবার মিঃ মিকবার উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, তার মানে ক্যান্টারবেরিতে যাচ্ছি আমরা। আমার বন্ধু হীপ আমাদের জন্যে সব ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আমি তাঁর একান্ত ও বিশ্বস্ত সচিবের পদে যোগদান করতে যাচ্ছি। হীপ যদিও আমার মাইনে খুব একটা বেশী দিতে পারবেন না, তবু যা দেবেন তাতে আমাদের আর্থিক অভাব অনটন আর থাকবে না। আমি তাঁকে আইনগত ব্যাপারে পরামর্শ দেব। দরকার হলে বিচারপতি ব্ল্যাকস্টোনের সাহায্য নেব।

মিসেস মিকবার বললেন, মিঃ মিকবারের আইনে যে জ্ঞান আছে তাতে উনি লিখিতভাবে সলিসিটারের কাজ করতে পারেন।

আমি চুপ করে থাকলেও ট্র্যাড্‌লস্‌ থাকতে পারল না। সে প্রতিবাদের স্বরে বলল, সলিসিটার হতে হলে ব্যারিস্টার হতে হবে। আর ব্যারিস্টার হতে হলে মিঃ মিকবারকে কোন এক হাইকোর্টে পাঁচ বছর আইন পড়তে হবে।

মিসেস মিকবারও ছাড়বেন না। তিনি বললেন, তাহলে মিঃ মিকবার পাঁচ বছর পর তো

David Copperfield, by Charles Dickens (Published 1850) Bengali Translation

একজন বিচারপতি বা চ্যান্সেলারের পদ লাভ করতে পারবেন।

মিঃ মিকবার আমাদের বিদায় দিয়ে বললেন, তাহলে মিঃ কপারফিল্ড, মিঃ ট্রাড্‌লস্‌, আমি তোমাদের শুভেচ্ছা নিয়ে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছি। আমি নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছি, একটি নতুন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের সদস্য হতে চলেছি।

আমরা তাঁর শুভেচ্ছা কামনা করে চলে এলাম।

২৮

এরপর আমি সোজা আমার বাসায় চলে গেলাম। গিয়ে দেখলাম পেগটি তার ভাইপো হ্যাম-এর কাছে যাবার জন্য ইয়ারমাউথ রওনা হচ্ছে। সে আমারই জন্য অপেক্ষা করছিল।

তাকে আমি সঙ্গে করে গাড়ি ভাড়ার অফিসে নিয়ে গেলাম।

পেগটি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে বলল, তুমি এখন শিক্ষানবিশ, রোজগার নেই। হাতখরচ দরকার। যখন যা দরকার হবে আমাকে বলবে।

আমি বললাম, যদি কারো কাছে কখনো টাকা ধার করার প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই তোমার কাছ থেকে নেব।

পেগটিকে বিদায় দিয়ে ডোরার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তাকে আমার প্রকৃত আর্থিক অবস্থার কথা জানিয়ে তার মনকে আগে থেকে প্রস্তুত করে তোলা উচিত। পরে যেন সে হতাশ না হয়।

ডোরা বসার ঘরে এসে বসতেই বিশেষ ভণিতা না করে আমি বলে ফেললাম, আচ্ছা ডোরা, তুমি একজন পথের ভিখারিকে ভালবাসতে পারবে?

ডোরা আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি এ ধরনের বোকার মত কথা বলছ কেন? ভিখারিকে ভালবাসা!

আমি তখন গম্ভীরভাবে বললাম, আমার প্রিয়তমা, বিশ্বাস কর, আমি এখন পথের ভিখারি।

কিন্তু ডোরা আমার কথা কিছুতেই বিশ্বাস করবে না! দেখলাম তার বাস্তবজ্ঞান একেবারেই নেই। সে জন্ম থেকেই ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয়েছে। দারিদ্র্য বা অভাব অনটন কাকে বলে তা সে জানে না। ডোরা বলল, ওসব ভয়ঙ্কর কথা আমায় বোলো না। এমন কথা বললে আমি আমার জিপকে দিয়ে তোমাকে কামড়ে দেওয়াব।

আমার মুখপানে তাকিয়ে ডোরা হয়ত কিছুটা বুঝতে পারল যে আমি সত্যি কথা বলছি। আমি আবার তাকে বোঝাবার জন্য বললাম, বিশ্বাস কর ডোরা, এখন আমার হাতে কিছু নেই। আমার পিসীর যা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, সব ব্যবসায় লগ্নী করে তা হারিয়েছেন। এখন আমাকে আমাদের ভরণপোষণ চালাবার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হচ্ছে। এসব সত্ত্বেও তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারবে? ভাল করে ভেবে দেখ।

কিন্তু ডোরার ভাব দেখে বুঝলাম সে এসব কিছু বুঝবে না। সে আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে বলল, এসব মোটেই বলবে না। বললে আমি জিপকে তোমায় কামড়ে দিতে বলব।

www.banglainternet.com

David Copperfield, by Charles Dickens (Published 1850) Bengali Translation

আমার এই সব দুঃখের কথা ডোরা বুঝতে পেরেছে কি না আমি জানি না, তবে দেখলাম সে অনেকটাই শান্ত হয়ে উঠল। সেদিন আর খেলাধূলা বা নাচগান করল না।

কথায় কথায় আমি বলেছিলাম, আমাকে এখন রোজ ভোর পাঁচটার সময় উঠতে হয়। ডোরা তাই যাবার সময় আমাকে বলল, না, ভোর পাঁচটার সময় উঠবে না। দুষ্টু ছেলে কোথাকার।

আমি বললাম, কি করব প্রিয়তমা, আমাকে যে অনেক কাজ করতে হয়।

ডোরা বলল, না, উঠবে না, কেন অত সকালে কাজ করবে?

আমি বুঝলাম, ডোরাকে কিছুতেই আমার দুরবস্থার কথাটা বোঝানো যাবে না। সে বুঝবে না। তার মতন অন্তঃকরণের নির্মল আকাশে কখনই কোন দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগের মেঘকে আনা যাবে না। আমি এরপর কিছু বলার আগে ডোরা একটি চুম্বন দিয়ে আমার সব কথা বন্ধ করে দিল। আমার সব দুঃখকষ্টের উপর এক শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিল ও।

২৯

এদিকে পার্লামেন্টের বিতর্কের রিপোর্ট লেখার অনুশীলনের কথাটা আমার মনে ছিল। কমন্স-এর কাজ সেরে বাসায় ফেরার পর রাত্রিতে রোজ আমার ঘরে পার্লামেন্টের নকল অধিবেশন বসত। তাতে ট্র্যাড্‌লস্ এসে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করত। আমার পিসিমা ও ডিক হতেন সরকার পক্ষের মন্ত্রী আর ট্র্যাড্‌লস্ হত বিরোধীপক্ষের নেতা ও প্রধান বক্তা। আমি আমার নোটবই খুলে তার বক্তৃতার কথাগুলো ঠিকমত লেখার চেষ্টা করতাম। ট্র্যাড্‌লস্ বক্তা হিসাবে ভালই ছিল। সে তীব্রভাবে সরকারপক্ষকে আক্রমণ করত। আমার পিসিমা মাঝে মাঝে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলতেন। এইভাবে দিনের পর দিন অনুশীলন করে যেতাম।

প্রথম প্রথম কিছু অসুবিধা হলেও ক্রমে আমি ট্র্যাড্‌লস্-এর বক্তৃতার বিবরণ ভালভাবে লিখতে পারতাম।

একদিন আমি কমন্স-এ গিয়ে মিঃ স্পেনলোকে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম। তাঁর মুখখানা গম্ভীর দেখলাম। আমি তাঁকে নমস্কার করলে তিনি প্রতি নমস্কার না করেই আমাকে কাছাকাছি একটা কফি হাউসের দোতলায় নিয়ে গেলেন। সেখানে দেখলাম মিস মার্ডস্টোন একটা ফাইল হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। আমার ভয় হলো, নিশ্চয় স্পেনলো ডোরার ব্যাপারে আমাকে কিছু বলবেন।

মিঃ স্পেনলো আমাকে একটা চেয়ারে ইঙ্গিতে বসতে বলে নিজে চুল্লীর ধারে বসলেন। মিস মার্ডস্টোন ভয়ঙ্কর গাম্ভীর্যের সঙ্গে একটা চেয়ারে বসলেন।

মিঃ স্পেনলো মিস মার্ডস্টোনকে বললেন, চিঠিটা দয়া করে দেখান।

মিস মার্ডস্টোন ফাইল থেকে একটা চিঠি বার করে আমার হাতে দিলেন। মিঃ স্পেনলো বললেন, এটা তোমার হাতের লেখা?

আমি উত্তর করলাম, হ্যাঁ, স্যার।

আমি আবেগের সঙ্গে প্রেম নিবেদন করেছিলাম এই চিঠিতে। এইটি আমার ডোরাকে লেখা

www.banglainternet.com

শেষ চিঠি।

মিঃ স্পেনলোর নির্দেশে মিস মার্ডস্টোন আরও কয়েকটা চিঠি আমাকে দিলেন। আমি চিঠিগুলো দেখলাম। সবই আমার লেখা।

মিঃ স্পেনলো গম্ভীরভাবে বললেন, তোমার এই চিঠিগুলো এবং ডোরা তোমাকে যে সব চিঠি লিখেছে সেগুলো আগুনে পুড়িয়ে ফেলবে। আর তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কমন্স-এর এই অফিসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি আমি কোনো যুবক কিম্বা কোন বৃদ্ধকে বিশ্বাস করে বাড়িতে নিয়ে যাই, এবং যদি সে বিশ্বাস ভঙ্গ করে তাহলে কি করা উচিৎ—

আমি বিপন্নবোধ করে বললাম, আমি তখন অত কিছু ভাবিনি বা বুঝতে পারিনি স্যার।

মিঃ স্পেনলো বললেন, আসল কথা, তোমরা দুজনেই এ বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিছুই বোঝ না। তুমি জান, আমার কিছু সম্পত্তি আছে এবং ডোরা আমার একমাত্র কন্যা। কেউ যদি সে সম্পত্তির লোভে তাকে বিয়েতে মজাবার চেষ্টা করে তবে আমি তা কিছুতেই মেনে নেব না। আমি আমার কন্যাকে যোগ্য পাত্রে দান করতে চাই।

আমি বললাম, আমি ডোরাকে ভালবাসি—

মিঃ স্পেনলো আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললেন, ডোরা নয়, বল মিস স্পেনলো।

আমি আবার আমার কথার জের টেনে বললাম, আমি তাকে আমার এই পরিবর্তিত আর্থিক অবস্থার কথাটা বোঝাতে চেয়েছিলাম। আমি আমার এই আর্থিক অবস্থার উন্নতির জন্য যথাসাধ্য পরিশ্রম করছি।

মিঃ স্পেনলো বললেন, ভাল কথা। তুমি এক সপ্তাহ ধরে এ বিষয়ে ভেবে দেখ। মিস ট্রটউডকে বল। এক সপ্তাহ পর আমাকে বলবে।

আমি সেখান থেকে এসে আমার ঘরে ঢুকে মিঃ স্পেনলোকে একখানি চিঠি লিখলাম নরম ভাষায়। আমি তখন ভাবছিলাম ডোরার কথা। আমার শেষ চিঠিখানি ডোরার কুকুর জিপের মুখে দেখে সেটা মিস মার্ডস্টোন নিয়ে দেখে। তারপর ডোরার কাছ থেকে আমার অন্য চিঠিগুলি নিয়ে নেয়। এইভাবে চিঠির ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় ডোরাকে নিশ্চয় বকাবকি করা হয়েছে এবং সে সারা সকালটা কেঁদেছে। আমার জন্য কত কষ্ট সে পেয়েছে!

এই ভেবে আমি মিঃ স্পেনলোকে চিঠিতে লিখলাম, এ বিষয়ে যা কিছু দোষ সব আমার। দয়া করে ডোরাকে এমন কিছু বলবেন না যাতে তার কোমল প্রাণে ব্যথা লাগে। ফুলের মতই তার অন্তর সরল ও কোমল। সে ফুলকে পিষ্ট করবেন না নির্মমভাবে।

তারপর আমি চিঠিখানি স্পেনলোর ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে পড়ে শোনালাম। তিনি বললেন, আমি আমার মেয়েকে জানি। তাকে কি বলব না বলব সেটা আমার ব্যাপার। তবে তুমি বাড়াবাড়ি করলে অর্থাৎ সংযত না হলে আমি বাধ্য হব আমার মেয়েকে আবার বিদেশে পাঠিয়ে দিতে। আমি চাই মিঃ কপারফিল্ড, তুমি সব কিছু ভুলে যাও। ভাববে কিছুই ঘটেনি।

মিস মার্ডস্টোন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সব কিছু লক্ষ্য করেন। তোমাদের দুজনের মধ্যে যেদিন প্রথম দেখা হয় সেইদিনই তিনি সন্দেহ করেছিলেন। আমি ডোরার উপর সন্তুষ্ট।

আমি সেদিন রাত্রিতে ডোরার বান্ধবী মিস মিলির বাড়িতে গিয়ে দেখা করলাম তার

সঙ্গে। আমার প্রেমের কথা তাকে সব জানালাম। আমি তাকে ডোরার কাছে গিয়ে আমার অবস্থার কথাটা জানাতে বললাম পরদিন সকালে। কিন্তু মিস মিলি আমাকে কোন আশ্বাস দিতে পারল না। শুধু কিছু উপদেশ দিল। প্রেমের ব্যাপারে এমনিই হয়ে থাকে এবং হবে। প্রেমকে এইভাবে বাধা ঠেলে এগোতে হবে।

রাত্রিতে হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আমি আমার পিসীকে সব কথা জানালাম। কিন্তু তিনি বিশেষ কিছু বললেন না। তিনি শুতে চলে গেলেন।

পরদিন সকালে আমি বুকে নিবিড় হতাশা নিয়ে জেগে উঠলাম। নির্দিষ্ট সময়ে আমি সোজা কমন্স-এর অফিসে চলে গেলাম। দেখলাম, অফিসের কোন বেয়ারাই কোন কাজ করছে না। সকলেই মনমরা হয়ে চুপচাপ বসে আছে।

অবশেষে প্রধান কর্মচারী টিক প্রথমে কথা বললেন। বললেন, আবার এক বিপদ ঘটে গেছে। তুমি জান না?

আমি বিস্ময়ে অবাক হয়ে বললাম, না, কি বিপদ?

টিক বললেন, মিঃ স্পেনলো মারা গেছেন।

এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। আমার মাথা ঘুরছিল। আমি তখন দাঁড়িয়ে ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমি পড়ে যাব। আমাকে ওরা একটা চেয়ারে বসিয়ে জল এনে চোখে মুখে জল দিল।

তারপর টিক মৃত্যুর ব্যাপারটা সব বললেন। বললেন, গতকাল সন্ধ্যায় মিঃ স্পেনলো তাঁর ফীটন গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলেন অফিস থেকে। বাড়ি ফেরার আগে শহরের এক জায়গা থেকে তাঁর নৈশ আহার সেরে নেন। তারপর গাড়ির কোচোয়ানকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই ফীটন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গাড়িটি যথাসময়ে বাড়ির গেটে গিয়ে দাঁড়ায়। ভৃত্য আলো নিয়ে ছুটে আসে। কিন্তু সে গাড়িতে মিঃ স্পেনলো ছিলেন না। বাড়ির লোকেরা তখন তাঁর খোঁজে বার হয়। অবশেষে বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে পথের ধারে মিঃ স্পেনলোকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। তাঁকে বাড়িতে তুলে এনে ডাক্তার ডাকা হয়। কিন্তু ডাক্তার তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। তিনি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে গাড়ি থেকে পড়ে যান অথবা গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তারপর হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হন-এ বিষয়ে সঠিক জানা যায়নি।

আমাদের প্রেমের ব্যাপারে যতই তিনি কঠোর মনোভাব গ্রহণ করুন না কেন, মিঃ স্পেনলোর জন্য আমার সত্যিই খুব কষ্ট হচ্ছিল। মনের মধ্যে কেমন যেন একটা শূন্যতা অনুভব করছিলাম। ডোরার কথা ভেবে আমার আরও দুঃখ হচ্ছিল। সে নিশ্চয় খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। খুব কাঁদছে। কে তার অভিভাবক হবে? তাকে এই সময়ে সান্ত্বনা দেবার জন্য তার কাছে যাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। কিন্তু এখন তা সম্ভব নয়। তার সঙ্গে আমার কোন সামাজিক সম্পর্ক নেই।

আমি নিজে না গিয়ে ডোরাকে একখানি চিঠি লিখে মিলির হাত দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। আমি তাতে লিখলাম, গতকাল তোমার বাবার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এবং আমাদের প্রেমের ব্যাপারে কথা বলেছেন। তিনি মোটেই আমার উপর রাগ করেননি। তিনি আমার সঙ্গে খুবই সদয় ব্যবহার করেছেন। তুমি কোন চিন্তা করবে না।

মিঃ জর্কিনস ঘটনার কথা শুনেই তাঁর অংশীদার মিঃ স্পেনলোর বাড়িতে গিয়েছিলেন। ক'দিন অফিসে আসতে পারেননি তিনি।

দিনকতক পরে তিনি অফিসে এলেন। আমি সেদিন অফিসে গিয়ে দেখলাম মিঃ জর্কিনস আর টিক স্পেনলোর ঘরে বসে কথা বলছেন। কিছুক্ষণ পর তাঁরা আমায় ডাকলেন। আমি সে ঘরে গেলে মিঃ জর্কিনস বললেন, মিঃ স্পেনলো কোন উইল করে গেছেন কিনা সেটা খুঁজে দেখতে হবে। তাঁর ব্যক্তিগত কাগজপত্রগুলো খুঁজে দেখ।

মিঃ স্পেনলোর ব্যক্তিগত ড্রয়ার খুলে আমি সব কাগজ-পত্র বার করলাম। অফিস-সংক্রান্ত কাগজগুলি আলাদা করে রাখলাম। কিন্তু তাঁর কোন উইল পাওয়া গেল না।

তখন মিঃ জর্কিনস্ ও টিক দুজনেই বললেন, তাহলে মনে হয় মিঃ স্পেনলো কোন উইল করেননি।

আমি বললাম, উইল নিশ্চয় করেছেন তা যেখানেই থাক। তিনি নিজের মুখে আমাকে বলেছেন, তিনি তাঁর সম্পত্তির ব্যাপারে সব স্থির করে ফেলেছেন।

কিন্তু কোন উইল পাওয়া গেল না। মিঃ স্পেনলোর বিষয় সম্পত্তি বা টাকা পয়সা কি জমা আছে তাও জানা গেল না। টিক বলল, তাঁর যে সব ধার-দেনা আছে তা সব মিটিয়ে কোম্পানি থেকে তাঁকে হাজার পাউণ্ডও দেওয়া যায় না। তার মানে ডোরার ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

আমি মিস মিলির কাছে খোঁজ নিয়ে জানলাম, ডোরার দুই পিসি আছে পুটনেতে। তাঁরা হলেন মিঃ স্পেনলোর দুই অবিবাহিত কুমারী বোন। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে মিঃ স্পেনলোর সম্পর্ক ভাল ছিল না। ডোরার নামকরণ অনুষ্ঠানে তাঁদের শুধু চায়ের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, ডিনারের নিমন্ত্রণ করা হয়নি বলে তাঁরা ভাইয়ের উপর দারুণ রেগে যান এবং তাঁরা আর ভাইয়ের বাড়ি আসতেন না। সেই থেকে কোন খোঁজখবরও রাখতেন না ভাইয়ের।

মিঃ স্পেনলোর মৃত্যুসংবাদ তাঁদের জানানো হলে তাঁরা জানিয়ে দেন ডোরা এসে তাঁদের কাছে থাকতে পারে। তাঁরা ছাড়া ডোরার নিজের লোক বা আত্মীয়-স্বজন বলতে আর কোথাও কেউ নেই। ডোরা বলে, তার বান্ধবী মিস মিলি আর তার প্রিয় কুকুর জিপকে তার সঙ্গে থাকতে দিতে হবে।

যাইহোক, শেষে ডোরা জিপকে নিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পরই সেখানে চলে যায়। মিস মিলিও তার কাছেই থাকে।

আমি মিলির কাছ থেকে আরও জানতে পারলাম, মিলি ডোরার কাছে দু একবার আমার নাম করেছিল, কিন্তু সে শুধু 'বাবা, বাবা' বলে কেঁদে উঠেছিল। আর কোন কথাই বলেনি আমার সম্বন্ধে। মিলি তার প্রতিদিনকার ডায়েরীতে ডোরার কাজকর্ম সব লিখে রাখে। তাতে জানা গেল যে, শুধু জিপকে কোলে নিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে থাকে আর সেই ভাবেই ঘুমিয়ে পড়ে। পুটনেতে তার কাছে যাবার খুব ইচ্ছা হচ্ছিল আমার। কিন্তু সেখানে যাওয়ার কোন উপায় বা অবকাশ খুঁজে পেলাম না।

এদিকে আমার পিসি আমাকে একবার ডোভারে যেতে বললেন। সেখানে তাঁর যে কটেজে

একজন ভাড়াটে আছে, সেই ভাড়াটের থাকার সময়সীমা আরও বাড়িয়ে দিয়ে একটা নতুন চুক্তি করতে হবে।

আমি এই সুযোগে অ্যাগনিসের সঙ্গে দেখা করে আসব। আমি তাই ডোভার যাবার জন্য প্রস্তুত হয়ে উঠলাম। এদিকে মিঃ স্পেনলোর মৃত্যুর পর অফিসের অবস্থা রীতিমত খারাপ হয়ে উঠল। মিঃ জর্কিনস ঠিকমত কোম্পানির কাজকর্ম চালাতে পারছিলেন না। আমি সেখানে এখন কি করব তা খুঁজে পেলাম না। প্রোমটার হওয়ার জন্য আমার যে হাজার পাউণ্ড জমা ছিল তা প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছে। আমি বেশ হতাশ হয়ে পড়লাম। আমি অবশ্য ডঃ স্ট্রং-এর কাছে একান্ত সচিব হিসাবে তাঁর কাজে সহায়তা করতে যেতাম। আমি তাঁর কাছে তিনদিনের ছুটি চাইলাম। তিনি বললেন, তিনদিন কেন, দিনকতকের জন্য ঘুরে আসতে পার।

৩০

আমি ডোভারে গিয়ে পিসিমার কথামত কাজকর্ম সব সারলাম। আমার একদিন কেটে গেল সেখানে। রাতটা সেখানেই রইলাম। দেখলাম বর্তমান ভাড়াটে পিসিমার গাধা তাড়ানোর কাজটা ঠিকই বজায় রেখেছে।

পরদিন সকালে আমি অ্যাগনিসের সঙ্গে দেখা করার জন্য ক্যান্টারবেরিতে মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতে চলে গেলাম। ক্যান্টারবেরি শহরটা একটু ঘুরে দেখলাম। আমার ছাত্রজীবনের কথা মনে পড়তে লাগল। তার পথঘাট, দোকান বাজার সব একই রকম আছে।

উইকফিল্ডের বাড়িতে পৌঁছতেই নীচের তলায় অফিসঘরে মিঃ মিকবারের সঙ্গে দেখা হলো। উনি কি সব লিখছিলেন।

উনি আমাকে দেখে খুশি হলেন, কিন্তু সে খুশির কোন আবেগ প্রকাশ করলেন না। আমি তাঁর কাজকর্ম কেমন চলছে তা জিজ্ঞাসা করতে উনি কৌশলে তা এড়িয়ে গেলেন। হীপ কেমন লোক সে বিষয়েও স্পষ্ট করে কিছু বললেন না। উনি শুধু বললেন, যে কাজ আমি করি মাস্টার ডেভি, সে কাজে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতে হয়। সে কাজের ব্যাপারে সব কিছু বলার স্বাধীনতা আমার নেই।

মিঃ উইকফিল্ডের নাম করতে উনি বললেন, মিঃ উইকফিল্ড লোক হিসাবে ভাল, তবে আজকালকার এই সব ব্যবসার ব্যাপারে একেবারে অচল। একেবারে সেকেলে। তবে মিস উইকফিল্ড খুবই বুদ্ধিমতী।

মিঃ মিকবার আমার কথাটা হীপকে জানাতে বললেন।

আমি বললাম, এ বাড়ির সব কিছুই জানি। আমি উপরতলায় অ্যাগনিসের সঙ্গে দেখা করতে যাব।

আমি মিঃ মিকবারের কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় উনি বললেন, আমরা এখন হীপরা আগে যে বাড়িতে থাকত সেইখানে থাকি। তুমি একবার সেখানে গেলে মিসেস মিকবার খুশি হবেন।

আমি লক্ষ্য করলাম, মিঃ মিকবারের স্বভাবটা আগের থেকে কেমন যেন পাল্টে গেছে। সেই আবেগের উচ্ছ্বাস আর নেই। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্কের প্রকৃতিটাও বদলে গেছে।

এরপর আমি সোজা উপরতলায় চলে গেলাম। বাড়িতে তখন উইকফিল্ড, ইউরিয়া হীপ ও তার মা ছিল না। অ্যাগনিস চুল্লীর কাছে বসেছিল। আমাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। আমি বললাম, ওঃ অ্যাগনিস, হে আমার দেবদূত, আমি তোমার অভাবটা খুব বেশী করে অনুভব করছি।

অ্যাগনিস বলল, তাই নাকি? এত তাড়াতাড়ি?

আমি উত্তরে বললাম, কেন তা জানি না অ্যাগনিস। তবে এটা জানি যে, মনের যে শক্তি থাকা দরকার—তা আমার নেই। আগে তোমার কাছে কত উপদেশ পেতাম। কিন্তু এখন তা পাওয়ার সুযোগ নেই। আমি একটুকু দুঃখেই বড় বিচলিত হয়ে যাই। আমার ধৈর্য বা স্থিরতা বলতে কিছু নেই। তুমি লণ্ডনে গেলে বেশ একটা আনন্দ পেলাম, কাজের উদ্যম পেলাম। তারপর তুমি সেখান থেকে চলে এলেই যত সব বাধা বিপত্তি এসে বিব্রত করতে লাগল আমাকে। আবার আমি অসহায় বোধ করি এখন।

আমি এবার অ্যাগনিসকে তার ব্যক্তিজীবনের কথা জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, আমার যা কষ্ট তাতো রয়েই গেছে, বরং এখন তা বেড়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও তার মুখের উপর দেখলাম দেবদূতের প্রশান্তি। আমি আবার নিজের কথা বলতে লাগলাম। আমি বললাম কেন জানি না অ্যাগনিস, তোমার এই ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আমি বড় শান্তি পাই, আমার সব জ্বালা-যন্ত্রণা মুহূর্তে জুড়িয়ে যায়। মনে হয় এক ক্লান্ত পাখি বহু পথ ঘুরে ঘুরে অবশেষে খুঁজে পেয়েছে তার আকাঙ্খিত এক মধুর বিশ্রাম, অবিমিশ্র শান্তির এক নীড়। ধীর তার মমতাপূর্ণ শান্ত অবয়ব, তার আয়ত চোখের স্নিগ্ধ উজ্জ্বল দৃষ্টি। তার মধুর কণ্ঠস্বর স্বর্গ করে তুলেছে তার এই ছোট ঘরটাকে আমার কাছে!

এর পর আমি আমার দুঃখের সব কথা খুলে বললাম তাকে। বললাম, এখন আমি নিজেকে তোমার উপর ছেড়ে দিলাম। যা বলবে করব।

অ্যাগনিস মৃদু হেসে বলল, আমার উপর নয়।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে ডোরার উপর?

অ্যাগনিস বলল, অবশ্যই।

আমি বললাম, স্বীকার করি ডোরা সত্য ও পবিত্রতার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কোন জ্ঞানই যে নেই তার। সে সম্পূর্ণ অন্যভাবে মানুষ হয়েছে। তার প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ অন্য। একটুতেই সে বিচলিত হয়ে পড়ে, একটুতেই সে ভয় পেয়ে যায়। তার বাবার মৃত্যুর আগে আমি একবার বর্তমান অবস্থার কথা বোঝাতে যাই। আমার দারিদ্রের কথা বলে কিভাবে কম খরচে সংসার চালাতে হয় তা বলি। কিন্তু সে সব কথা সে শুনলো না, বুঝলো না। আমার মুখে হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিল।

অ্যাগনিস তেমনি মৃদুমধুর হাসি হেসে বলল, তোমার সেই পুরনো স্বভাবটা গেল না। তুমি আগের মতই আবেগপ্রবণ রয়ে গেছ। জগতে দাঁড়াবার জন্য জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার চেষ্টা না

www.banglainternet.com

করে কেন তুমি এক অনভিজ্ঞা, জীবনবিমুখ প্রেমিকার চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছ? মেয়েটার মধ্যে আছে শিশুসুলভ সরলতা। জগৎ ও জীবনের কোন জটিলতায় নিজেকে জড়াতে ভয় পায়।

আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম ডোরার প্রতি অ্যাগনিসের সহানুভূতি দেখে। আমার মনে হচ্ছিল ডোরাকে আলিঙ্গন করে সে আমাকে ভর্ৎসনা করছে! আমি তাকে তা বললাম।

অ্যাগনিস বলল, আমার মতে তোমার পক্ষে সবচেয়ে সম্মানজনক কাজ হলো ডোরার পিসী—সেই দুজন ভদ্রমহিলার কাছে সব কথা জানিয়ে চিঠি লেখা। গোপনে কিছু করা উচিত হবে না। তুমি ওঁদের ওখানে গিয়ে ডোরার সঙ্গে দেখা করার আবেদন জানাবে। তুমি একজন তরুণ যুবক, জীবনে প্রতিষ্ঠা চাইছ। ওঁরা যদি কোন শর্ত আরোপ করেন তোমার উপর তা হলেও তা মেনে নেবে।

আমি অ্যাগনিসের কথা মেনে নিয়ে বললাম, আমি তাই করব।

আমি অ্যাগনিসের টেবিলে বসে চিঠির একটা খসড়া করলাম। তারপর আমি নীচে গিয়ে মিঃ উইকফিল্ড ও ইউরিয়া হীপের সঙ্গে দেখা করলাম। দেখলাম বাড়ির মধ্যে যে বাগান ছিল সেখানে দুটো ঘর করা হয়েছে। উইকফিল্ড একটা ঘরে বসেন আর হীপ তার পাশের ঘরে বসে।

ইউরিয়া হীপ আমাকে বলল, মাস্টার কপারফিল্ড, আমাদের কারবার ভালই চলছে। আমি হীন ব্যক্তি হতে পারি, কিন্তু মিঃ উইকফিল্ডকে আমি যথেষ্ট সাহায্য করছি।

মিঃ উইকফিল্ড আমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হলেন। আমাকে দুদিন থেকে যেতে বললেন। বললেন, যদি তুমি ক্যান্টারবেরিতে থাক তাহলে এই বাড়িতেই থাকবে কপারফিল্ড।

আমি বললাম, থাকবতো, কিন্তু ঘর কোথায়?

ইউরিয়া হীপ বলল, আমি মাস্টার কপারফিল্ডের জন্য আমাদের ঘর ছেড়ে দেব।

মিঃ উইকফিল্ড বললেন, তোমাকে ঘর ছাড়তে হবে না। পাশে তো একটা ঘর আছে।

সেই ঘরেই আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। আমি ঠিক করলাম আজ এবং কালকের দিনটা কাটিয়ে পরশু লণ্ডন চলে যাব।

রইলাম বটে। কিন্তু অ্যাগনিসের সঙ্গে একান্তে কথা বলার সুযোগ পেলাম না। আমি নীচের তলায় এদের সঙ্গে দেখা করে উপর তলায় গিয়ে দেখলাম ইউরিয়ার মা সব সময় অ্যাগনিসের কাছে বসে উল বুনছে। বুঝলাম সে ওকে পাহারা দিচ্ছে। বিকেলে আমি একাই শহরের দিকে বেড়াতে গেলাম। আমি অ্যাগনিসকে আমার সঙ্গে যেতে বললে হীপের মা অসুস্থতার ভান করার জন্য যেতে পারল না সে।

সন্ধ্যের সময় আমি শহরের এক জায়গা দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম তখন হঠাৎ ইউরিয়া হীপ আমাকে ডাকল পিছন থেকে।

ইউরিয়া এসেই আমাকে বলল, একা একা যাচ্ছেন মাস্টার কপারফিল্ড?

আমি বিরক্তির সঙ্গে বললাম, আমি একা একাই বেড়াতে চাই। বাড়িতে সব সময় এত বেশী মানুষের সঙ্গে থাকি যে এখন আমি নিঃসঙ্গতাই চাই। তোমার মা সব সময় অ্যাগনিসের ঘরে বসে পাহারা দিচ্ছে কেন?

হীপ হাতদুটো কচলে বলল, কথাটা যখন তুললেন তখন বলতে বাধা নেই। মিস উইকফিল্ডের মত নারীরত্নকে লাভ করার পথে আপনিই একমাত্র বাধা, মাস্টার কপারফিল্ড। আমার প্রথম প্রতিদ্বন্দ্বী আপনিই।

আমি বললাম, তুমি বড়ই নির্বোধ হীপ। প্রথম কথা আমি অ্যাগনিসকে বোনের মত দেখি। তার কাছে যত পরামর্শ নিই। তাছাড়া আমি অন্য একটি মেয়ের প্রতি অনুরক্ত।

হীপ খুশি হয়ে বলল, এই কথা? তা যদি আমি জানতাম, তা হলে এত কাণ্ড করতে হত না।

আমি বললাম, একটা কথা মনে রাখবে হীপ, রূপ গুণ ইত্যাদি সব দিক দিয়েই অ্যাগনিস তোমার থেকে এত উঁচু যে, ঐ আকাশে যে চাঁদ দেখছ সেই চাঁদের মতই তাকে লাভ করা অসম্ভব তোমার পক্ষে।

হীপ বলল, আমি তার বাবাকে যেভাবে নানা সাহায্য করছি, তাঁর ব্যবসাটা বাঁচিয়ে রেখেছি—তার জন্য আমার প্রতি তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।

সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরেই হীপ তার মাকে অ্যাগনিসের ঘর থেকে সরিয়ে নিল।

ডিনার খাবার পর হীপ মিঃ উইকফিল্ডকে একটু একটু বেশী মদ খাইয়ে দিতে মিঃ উইকফিল্ড নেশার ঘোরে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হীপকে ভর্ৎসনা করতে লাগলেন, হীপও নেশার ঘোরে অ্যাগনিসকে বিয়ে করতে চাওয়ায় সঙ্গে সঙ্গে রাগের আগুনে জ্বলে উঠলেন মিঃ উইকফিল্ড। তিনি বললেন, আমি দুর্বলতাবশতঃ ওকে প্রশ্রয় দিয়ে ওকে এতখানি বাড়িয়ে তুলেছি। ও একে একে আমার যথাসর্বস্ব গ্রাস করে শেষে আমার একমাত্র স্নেহের ধন আমার মেয়ের উপর লোভ করতে শুরু করেছে।

ইউরিয়া হীপ স্বাভাবিকভাবেই বলল, সত্যিই ও কথা বলা আমার উচিত হয়নি। আমি বলছি আর এমন হবে না।

হীপ আমাকে বারবার বলল, আপনি ওঁকে চুপ করান।

কিন্তু মিঃ উইকফিল্ড অবদমিত সব কথা অনর্গলভাবে বলে যেতে লাগলেন। শেষে অ্যাগনিস এক সময় তার ঘর থেকে এসে তার বাবাকে ধরে ধরে অন্য ঘরে নিয়ে গেল।

আমি পরদিনই অ্যাগনিসের কাছে বিদায় নিয়ে লণ্ডনে চলে গেলাম।

আমি ডোরার পিসীদের কাছে চিঠি পাঠিয়ে দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

৩১

অবশেষে ডোরার পিসীদের কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর এসে গেল। তাঁরা আমার চিঠির উত্তরে জানিয়েছেন, তাঁরা আমার কথাগুলি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করেছেন। সেই সঙ্গে একথাও জানিয়েছেন যে, আমি যদি আমার কোন এক বিশ্বস্ত বন্ধুর সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গিয়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে পারি, তাহলে আমাদের উভয়ের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য তাঁরা আলোচনা করবেন তখন।

আমি ভাবলাম ট্র্যাড্‌লস্‌কে সঙ্গে নিয়ে দেরি না করে একদিন পুটনি চলে যাব। এক অধীর আগ্রহ ও আশঙ্কার সঙ্গে দুঃসহ প্রতীক্ষায় স্তব্ধ হয়ে রইলাম। ট্র্যাড্‌লস্‌কে বলে দিন ধার্য করে ফেললাম।

নির্ধারিত দিনে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়লাম পুটনির পথে। মিস স্পেনলোদের বাড়ি ঢোকার আগে ট্র্যাড্‌লস্‌ আমার ভয়-ভয় ভাবটা কাটানোর জন্য একপাত্র মদ খাওয়াল ।

আমরা তাঁদের বাড়িতে গেলে আমাদের একটা হলঘরে নিয়ে গিয়ে বসানো হলো। ডোরার দুই পিসীর নাম হলো মিস ল্যাভিনিয়া আর মিস ক্ল্যারিসা। দুজনেই চিরকুমারী। বুঝলাম মিস ল্যাভিনিয়া বড় বোন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই বলবৎ হবে। আরও বুঝলাম মিস ল্যাভিনিয়া ডোরাকে সত্যিই স্নেহ করেন এবং আমাদের এই পারস্পরিক ভালবাসার ব্যাপারে সহানুভূতিশীলা। ক্ল্যারিসা তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রেমের ব্যাপারে ব্যর্থ হয়ে যে কোন প্রেমের ব্যাপারে স্বাভাবিকভাবেই সন্দিহান হয়ে ওঠেন।

ক্ল্যারিসা আমার চিঠিটা হাতে নিয়ে বললেন, আমরা মিঃ কপারফিল্ডের চিঠিখানি বিশেষ গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করে দেখেছি। এরপর যা বলার আমার বড় বোন মিস ল্যাভিনিয়া বলবেন।

মিস ল্যাভিনিয়া বললেন, আমাদের ভাই ফ্রান্সিস যেহেতু এখন নেই, আমাদের ভাইঝি যাতে সুখী হয় সেটা আমাদের দেখা দরকার।

আমি তখন ডোরার প্রতি আমার সততা বোঝাবার জন্য আমি আবেগের সঙ্গে বললাম, আমি ডোরাকে কত ভালবাসি, তা আমি মুখে প্রকাশ করতে পারব না। আমার এই বন্ধু ট্র্যাড্‌লস্‌ ও আত্মীয়-বান্ধবেরা সকলেই জানে।

ট্র্যাড্‌লস্‌ও বিশেষ বাগ্মিতার সঙ্গে জোরাল ভাষায় আমায় সমর্থন করল। মিস ক্ল্যারিসা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, প্রকৃত প্রেম বেশী কথা বলে না। প্রকৃত প্রেম অদৃশ্য ফলের মত গাছের ডালে পাতার আড়ালে নীরবে পাকতে থাকে।

অবশেষে মিস ল্যাভিনিয়া আমার চিঠিখানি হাতে করে কাজের কথা বলতে শুরু করলেন। তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ডোরার সঙ্গে আমার দেখা করার ও প্রেমের ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার জন্য কতকগুলি শর্ত আরোপ করলেন। তিনি বললেন, প্রতি রবিবার আমি তাঁদের বাড়িতে গিয়ে ডিনারে যোগ দিতে পারব। তাঁদের ডিনার হবে বেলা তিনটেয়। আর সপ্তাহে যে কোন দুদিন আমি সকালে তাঁদের চায়ের আসরে যোগ দিতে পারব। তাঁরা চা পান করেন প্রতিদিন সকাল সাড়ে ছটায়।

আমি খুবই আনন্দিত হয়ে তাঁদের এ প্রস্তাব শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মেনে নিলাম। আমার কাছে এটা তাদের অসীম দয়া বলে মনে হলো।

অবশেষে আমরা যাওয়ার জন্য উঠে পড়লে মিস ল্যাভিনিয়া আমাকে ডোরার ঘরে নিয়ে গেলেন। আমি দেখলাম আমার প্রতি ডোরার ভালবাসা ঠিকই আছে। পিতৃশোকে মাঝে তা কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেও আবার তা উচ্ছল হয়ে উঠেছে।

আমি ডোরাকে একা পেয়ে আমাদের বিয়ের পর কিভাবে তাকে ঘরকন্না করতে হবে, বাজার

ও রান্না করতে হবে তা সব বোঝাতে লাগলাম। ডোরা হেসে সব উড়িয়ে দিতে লাগল। এর পর মিস ল্যাভিনিয়া এসে পড়লে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে ট্র্যাড্‌লস্‌কে নিয়ে চলে গেলাম।

এর পর আমি মিস ল্যাভিনিয়াকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিলাম আমি সপ্তাহে একবারই, শনিবার বিকালে ডোরার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চাই। তাহলে আমার পক্ষে সুবিধা হয়।

অ্যাগনিসকে একখানি চিঠি দিয়ে সব কথা জানিয়ে দিলাম।

অ্যাগনিসের একবার ডঃ স্ট্রং-এর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। ডঃ স্ট্রং ছিলেন মিঃ উইকফিল্ডের বন্ধু। ডাক্তার তাঁর বন্ধু উইকফিল্ডের সঙ্গে একবার কোন বিষয়ে কথা বলতে চেয়েছিলেন। তাই অ্যাগনিস তার বাবাকে নিয়ে একদিন ডঃ-এর কাছে এল। আমি আগে থাকতেই সেকথা জানতে পেরে ডঃ স্ট্রং এর বাড়িতে ছিলাম।

অ্যাগনিস একসময় বলল, এই অঞ্চলে সে ইউরিয়া হীপের মায়ের জন্য একটা ঘরভাড়ার ব্যবস্থা করেছে। কারণ তার মায়ের বাতরোগ বেড়েছে। জল হাওয়ার ও পরিবেশের পরিবর্তনে তার রোগের কিছুটা উপশম হতে পারে।

পরদিনই ইউরিয়া হীপ তার মাকে নিয়ে এল সেই ভাড়া করা বাসাতে। ডঃ স্ট্রং-এর বাগানবাড়িতে ইউরিয়ার সঙ্গে দেখা হলো। দেখলাম ইউরিয়ার সন্দেহবাতিকটা বেড়েছে। সে কথায় কথায় আমাকে কটাক্ষ করে বলল, অ্যাগনিস কারো সঙ্গে মেলামেশা করে এটা সে চায় না। সে অ্যাগনিসের কাছে কাউকে যেতে দেবে না। সে বলল সে আগে ছিল এক সামান্য বেয়ারা, এখন সে উকিল হয়েছে। তবু সে অ্যাগনিসের বন্ধু হয়ে উঠতে পারেনি। তার বিরুদ্ধে কোন চক্রান্তকে বরদাস্ত করবে না সে।

আমি বললাম, তুমি নিজেই চক্রান্ত করে চলেছ আর মনে করছ সবাই তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। এটা তোমার নিজের মনেরই প্রতিফলন।

আমি সেখানে আর না দাঁড়িয়ে তাকে একা নিঃসঙ্গ অবস্থায় রেখে চলে গেলাম ওখান থেকে।

এরপর অ্যাগনিসকে একবার ডোরার সঙ্গে দেখা করার জন্য পুটনিতে নিয়ে যাবার জন্য দিন ধার্য করলাম তার সঙ্গে দেখা করে। এর জন্য মিস ল্যাভিনিয়ার অনুমতি নিলাম।

পরদিন বিকালের দিকে আমি গাড়িতে করে অ্যাগনিসকে পুটনির বাড়িতে নিয়ে গেলাম। বাড়িতে যেতেই মিস ল্যাভিনিয়া আমাদের ডোরার ঘরে নিয়ে গেলেন। ডোরা প্রথমে অ্যাগনিসের কাছে আসতে লজ্জা পাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমে তার প্রতি অ্যাগনিসের আগ্রহ আর স্নেহভালবাসার পরিচয় পেয়ে তার মন ঘুরে গেল। সে এসে দুহাত বাড়িয়ে অ্যাগনিসের গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর সে অ্যাগনিসের পাশে সোফাতে বসল। অ্যাগনিস জিপকে আদর করল।

তাদের দুজনের ভাব ভালবাসা দেখে আমি বড় আনন্দ পেলাম। অ্যাগনিস ডোরাকে পাশে বসিয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। আমরা চায়ের টেবিলে বসে একসঙ্গে চা খেলাম। মিস ল্যাভিনিয়া আমাদের সঙ্গে বসে বেশ আনন্দ উপভোগ করছিলেন। তিনি হাসিমুখে আমাদের ভালবাসার কথাবার্তা শুনছিলেন।

ডোরা অ্যাগনিসকে ছাড়তে চাইছিল না। আমাদের যাবার সময় সে অ্যাগনিসের সঙ্গে গাড়ির কাছ পর্যন্ত এগিয়ে এল। বারবার আমাদের আসতে বলল।

অ্যাগনিসকে আমি ওদের লণ্ডনের বাসায় দিয়ে এলাম। অ্যাগনিস ডোরার খুব প্রশংসা করল। বলল, মেয়েটা সত্যিই বড় ভাল আর সরল প্রকৃতির। পরে ডোরার কাছে যেতে ডোরা আমাকে জিজ্ঞাসা করল, অ্যাগনিস তোমার কে হয়? ও তো তোমার কোন আত্মীয়া নয়।

আমি বললাম, ছাত্রজীবনে আমি ওর সঙ্গে এক বাড়িতে ভাই বোনের মত মানুষ হয়েছি। রক্তের সূত্রে আত্মীয় না হলেও প্রকৃত অর্থে ও আমার আত্মীয়—আমার সুখে সুখী, আমার দুঃখে দুঃখী।

৩২

এবার আমার জীবনে শুরু হলো এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। স্টেনোগ্রাফি নামে কঠোর দৈত্যটাকে খুব ভালভাবেই আয়ত্ত ও একেবারে বশীভূত করে ফেললাম। কুশলী স্টেনোগ্রাফার হিসাবে আমার যথেষ্ট নাম হলো। আমি অন্যান্য রিপোর্টারদের সঙ্গে পার্লামেন্টের বক্তব্যগুলো রিপোর্টের আকারে লিখে একটা খবরের কাগজে দিলাম। পরদিন সকালে তা প্রকাশিত হল। আমার আয় বেড়ে গেল। এবার আমি যা পেতে লাগলাম তাতে ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা যায়।

এবার আমি একুশ বছরে পদার্পন করে প্রাপ্তবয়স্কের মর্যাদা লাভ করেছি। ট্র্যাড্‌লস্‌ও ওকালতি পাশ করে আইনব্যবসা শুরু করে দিয়েছে।

এত কাজের মাঝেও লেখালেখির একটা ঝোঁক ছিল আমার। একবার আমি কিছু একটা লিখে এক সাময়িক পত্রে পাঠিয়ে দিলাম। সেটা প্রকাশিত হলো। তার জন্য কিছু টাকা দিল আমায়। এর পর আমি বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় লেখা পাঠাতে লাগলাম। তার জন্য নিয়মিত টাকা পেতে লাগলাম। আমি বার্মিংহাম স্ট্রীটের বাসাটা ছেড়ে দিলাম। তার কিছু দূরে একটা কটেজ টাইপের বাড়ি ভাড়া নিলাম। আমার পিসিমা ডোভারের বাড়িটা ভাল টাকা পেয়ে বিক্রী করে দিলেন। আমার বিয়ের কথা শুনে তিনি আলাদা একটা ছোট কটেজ ভাড়া নিলেন। আমার বিয়ে হলে তিনি আর আমার সঙ্গে একবাড়িতে থাকবেন না।

ডোরার সঙ্গে আমার বিয়ের সব ঠিক হয়ে গেল। মিস ল্যাভিনিয়া ও মিস ক্ল্যারিসা দুজনেই তাঁদের মত দিয়েছেন। এ ব্যাপারে আমার পিসিমা ডোরার পিসিমাদের বাড়িতে গিয়ে যোগাযোগ করেন। তাঁদের সঙ্গে আমার পিসিমা ক্রমে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। তিনি মাঝে মাঝে ওঁদের বাড়ি যেতেন। ডোরাকেও আমার পিসীর ভাল লেগে গেল। বললেন, বয়সটা খুব কম হলেও মেয়েটা একটা টাটকা ফোটা ফুলের মতই সুন্দর আর সজীব।

ট্র্যাড্‌লস্‌ আমাকে কমন্স-এ নিয়ে গিয়ে বিয়ের লাইসেন্সটা বার করে দিল। সে নিজেও এবার তার প্রেমিকা সোফিকে বিয়ে করবে। বিয়ের দিন ঠিক হলো। আমি আমার ধাত্রী পেগটিকে খবর দিলাম। পেগটি এলে আমি তার হাতে সব ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলাম। যা করার সে-ই করতে লাগল।

অবশেষে আমাদের বিয়েটা হয়ে গেল। ডোরার দুজন পিসিই এসেছিলেন। আমার পিসিমা আর বান্ধবী অ্যাগনিস, বন্ধু ট্র্যাড্‌লস্‌, আর তার প্রেমিকা সোফি, আমার পুরনো ধাত্রী পেগটি

সবাই এ বিয়েতে যোগদান করল। আমার সুন্দরী বালিকা বধূ ডোরাকে দেখে সবাই খুশি হলো। বিয়ের সময় ডোরা সব সময় অ্যাগনিসের একটা হাত ধরেছিল। তার কাছ ছাড়তে চাইছিল না।

বিয়ের পর ভোজসভায় আমরা সবাই একসঙ্গে খেলাম। নানারকমের সুখাদ্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। আমি কিন্তু কোন খাদ্যেরই আস্বাদ পাচ্ছিলাম না। আমার সমস্ত মন জুড়ে ছিল শুধু বিয়ে আর আমার প্রেমের কথা।

অবশেষে আমরা দুজনে সকলের কাছে বিদায় নিয়ে আমাদের নতুন বাসায় যাবার জন্য গাড়িতে চাপলাম। ডোরা আমাকে এক সময় বলল, কি গো বোকা ছেলে, এখন সুখী তো? মনে কোন অনুশোচনা নেই তো?

আমি শুধু তার হাতটা আবেগের সঙ্গে নিয়ে বললাম, আমার স্বপ্ন এতদিনে সার্থক হলো ডোরা। আমি কতখানি সুখী তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা। মধুচন্দ্রিমার পর আমাদের ছোট্ট বাড়িতে ছোট্ট সংসারে মন দিলাম। যার ভালবাসা লাভের জন্য আমি এতদিন ধরে কত চেষ্টা করেছি, যাকে একবার দেখার জন্য কত ছোটাছুটি করেছি, কত লোকের কাছে অনুনয় বিনয় করেছি, আজ সেই ডোরা আমার বাড়িতে আমার পাশে বসে আছে! আজ আমি তার প্রেম লাভে ধন্য।

শহরের সব কাজ সেরে যখন বাড়ি ফিরতাম তখন আমার ভাবতে কত ভাল লাগত যে বাড়িতে ডোরা আছে আমার পথ চেয়ে।

আমরা দুজনেই সংসার সম্বন্ধে দুটি বন্য পাখির মতই অনভিজ্ঞ ছিলাম। অবশ্য ঘরসংসারের কাজকর্ম করার জন্য প্যারাগন নামে একটি মেয়েকে রেখেছিলাম।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার বালিকাবধূ ডোরা সংসারের সব কাজকর্মে পাকা গৃহিনীর মত হয়ে উঠল। যখন যা কিছু দরকার তা সব ঠিক করে রাখত। আমার কাজ থেকে ফিরতে রাত হত। কিন্তু আমি আসার আগে ডোরা ঘুমোত না। আমার পায়ের শব্দ শুনেই ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিত।

রাত্রিতে খাওয়ার পর লিখতে বসলে ডোরা সর্বক্ষণ আমার পাশে বসে আমার লেখা দেখত।

একদিন রাত্রিকালে আমার লেখার সময়ে ডোরাকে সমানে বসে থাকতে দেখে আমি তাকে বললাম, তুমি শুতে যাও ডোরা। আমার জন্য তুমি জেগে থেকে কেন কষ্ট করবে?

ডোরা বলল, না আমি শুতে যাব না। তোমার হলে তবে একসঙ্গে যাব।

তারপর আমি একমনে লিখে যেতে লাগলাম। হঠাৎ একসময় দেখলাম, ডোরা আমার পিছনে ঘাড়ের কাছে ঝুঁকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললাম, কি হলো প্রিয়তমা? তোমার দুঃখটা কিসের?

ডোরা বলল, আমার দুঃখ কিছু নেই, তুমি আমাকে শুতে যেতে বলতে পারবে না।

আমি তখন বললাম, বেশ তো, ভাল কথা। তুমি তোমার আয়ত উজ্জ্বল দু'চোখের দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকবে আমার পানে—এতো ভাল কথা।

ডোরা বলল, আমার চোখ উজ্জ্বল, একথা সত্যি বলছ? শুনে খুশি হলাম।

আমি আবার বললাম, তবে সে চোখে অহঙ্কারের একটু ভাব আছে।

ডোরা বলল, না অহঙ্কার নয়, আমাকে প্রশংসার জন্য একটা নির্মল আনন্দ।

অবশেষে আমাদের মধ্যে একট সন্ধি হলো। আমি যতক্ষণ লিখব ডোরা আমার কাছ থেকে একটু দূরে ঘরের মধ্যে এক জায়গায় বসে থাকবে। আমার কলমগুলো আর লেখার কাগজগুলো ওর কাছে থাকবে। আমার যখন যা দরকার আমি চেয়ে নেব ওর কাছে।

এর পর থেকে তাই করতে লাগল সে। আমি তার কাছে কলম বা কাগজ চাইলে সে খুব খুশি হত। সে দিতে এসে আমাকে তা দিয়ে যেত আর পিছন থেকে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরত।

দিনে দিনে ঘর সংসারের সব দায়িত্ব সব বুঝে নিলা ডোরা। দেখলাম ঘরের গৃহিনীরূপে সে খুব খুশি। সে আমার ছোট্ট সংসারটিতে নিজেকে সম্পূর্ণ মানিয়ে নিয়েছে। সে এখন সুখী। তার সুখেই আমার সুখ।

একটা জিনিস আমার খুব ভাল লাগল। ডোরা আমাকে যেমন ভালবাসে তেমনি আমার পিসিমাকেও ভালবাসে। আমার পিসিমা আলাদা বাড়িতে থাকলেও প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। ডোরাকেও তিনি ভালবাসতেন। তিনি এসেই বলতেন, কই, সেই ছোট্ট ফুলের কুড়িটা কই।

তার গলার আওয়াজে ডোরাও ছুটে যেত তাঁর কাছে। ডোরা আমার পিসিমাকে তার নিজের মার মত দেখত। তাঁকে জড়িয়ে ধরত দুহাত দিয়ে। দুজনে একসঙ্গে বাগানে বেড়াত। পিসিমা গান ভাল না বাসলেও ডোরা যখন গান গাইত গীটার বাজিয়ে, তখন তিনি নীরবে শুনতেন। এতটুকু বিরক্ত হতেন না। এইভাবে ডোরা তার ভালবাসা আর সততা দিয়ে পিসিমার জমাটবাঁধা সব গাম্ভীর্য আর কঠোরতাকে ভেঙ্গে ভেঙ্গে খান খান করে দেয়। তাঁর ভিতর থেকে তার স্নেহের সব দাবিটুকু আদায় করে নিত সে।

আমি ডক্টর স্ট্রং-এর সেই কাজ ছেড়ে দিয়েছি। তবু এখন আমি তাঁর বাড়ির কাছে থাকি বলে এখন আমি তাঁর প্রতিবেশী। আমি, ডোরা, পিসিমা—আমার মাঝে মাঝে তাঁর বাড়িতে যাই। ডাক্তার ও তাঁর স্ত্রী মাঝে মাঝে তাঁদের বাড়িতে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেন।

একদিন সন্ধ্যার পর আমি একা আমার ঘরে বসে একমনে লিখছিলাম। ডোরা পিসিমার সঙ্গে কোথাও গিয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ মিঃ ডিক এসে ঘরে ঢুকলেন। মিঃ ডিক-এর হাব ভাবের মধ্যে কেমন যেন একটা পরিবর্তন দেখলাম। আগের মত তিনি আর উদাসীন বা আত্মভোলা নেই।

মিঃ ডিক ঘরে ঢুকলে আমি তাঁকে সসম্মানে বসতে বললাম। তিনি বসে গম্ভীরভাবে বললেন, এখন তুমি লেখক ও সাংবাদিক হয়েছ। তুমি জ্ঞানী ও চিন্তাবিদ্‌দের অন্যতম। এখন তোমার সময়ের অনেক দাম। আমি তোমার বেশী সময় নষ্ট করব না।

এরপর মিঃ ডিক ডঃ স্ট্রংদের পারিবারিক ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর আমার পিসিমা মিস বেটসির প্রশংসা করলেন।

একথা সেকথা বলার পর মিঃ ডিক একবার বললেন, মিস বেটসি জগতের মধ্যে এক আশ্চর্যজনক ও অদ্বিতীয় মহিলা। আর্থিক অসুবিধের মধ্যেও তিনি কর্তব্যবোধ হারাননি। তাঁর

শুভবুদ্ধি একটুও কমেনি। আমাকে ট্র্যাড্‌লস্‌ যে লেখা কপি করার কাজ দিয়েছে তার পারিশ্রমিক স্বরূপ যে টাকা আমি পাই তা সব আমি জমিয়ে রাখি। তা একসঙ্গে আমি সব মিস বেটসিকে দেব।

আমি মিঃ ডিক-এর দায়িত্বজ্ঞান ও কৃতজ্ঞতাবোধ দেখে বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলাম।

৩৩

আমি যখন বাড়ি ফিরলাম তখন রাত্রি প্রায় গভীর। আকাশে তখনো চাঁদ থাকলেও মেঘ আর কুয়াশার জন্য তার আলোটা ম্লান দেখাচ্ছিল। আমি আমার বাড়ির সদর দরজায় পা দিয়েই দেখলাম, আমার পিসিমার বাড়ির দরজাটা খোলা। সেই খোলা দরজা দিয়ে আলোর একটি রশ্মি বাইরে এসে পড়েছিল। দেখলাম সেই খোলা দরজার সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে একটা মদের বোতল আর গ্লাস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মদ্যপান করছিল।

আমি বুঝতে পারলাম এই লোকটা মাঝে মাঝে পিসিমার কাছ থেকে কিছু করে টাকা নিয়ে যায়। আমি জানি পিসিমা তাকে টাকা না দিলে সে যাবে না, কারণ লোকটা ডিক এর বড় ভাই অথবা কোন আত্মীয়। ডিককে নিয়ে যাবার তার অধিকার আছে। কারণ ডিক অপ্রকৃতিস্থ। ডিককে নিয়ে তারা পীড়ন করবে, এই ভয়ে ডিককে ছাড়বেন না পিসিমা। ডিক-এর প্রতি মাতৃসুলভ দয়া আর মমতার জন্যই মাঝে মাঝে কিছু করে খরচ করতে হয় পিসিমাকে।

আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখলাম পিসিমা কয়েকটা রূপোর টাকা এনে লোকটার হাতে দিলেন। লোকটা তা গুনে দেখে বলল, মাত্র এই কটা টাকা নিয়ে আমি কি করব?

পিসিমা বলল, আমার কারবারে লোকসান হওয়ার জন্য এখন আর্থিক অবস্থা খারাপ যাচ্ছে। আমি আর তোমাকে টাকা দিতে পারব না। তুমি সারা জগতের প্রতি আমার মনটাকে বিষিয়ে দিয়েছ। তুমি অকৃতজ্ঞ, নিষ্ঠুর প্রকৃতির। নতুন করে আর আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না। যাও, নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করগে যাও।

লোকটা বলল, বাঃ বেশ চমৎকার। ঠিক আছে, আমি যা পারি করব।

আমার পিসিমার চোখে ঘৃণামিশ্রিত ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে জল ঝরে পড়ছিল। তা দেখে লোকটা রেগে গেলেও কিছুটা লজ্জিতও হয়ে পড়েছিল। সে তাই অনিচ্ছাসত্ত্বেও কয়েক পা পিছিয়ে বাগানের গেটের কাছে চলে এসেছিল।

আমি আর তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আমি এগিয়ে গিয়ে গেটের কাছে লোকটার পাশ কাটিয়ে ভিতরে চলে গেলাম। লোকটার চোখে আমার চোখ পড়ল। কিন্তু কোন কথা বললাম না। আমি সোজা গিয়ে বললাম, পিসিমা, এই লোকটা আবার তোমাকে ভয় দেখাতে এসেছিল? লোকটা কে? ওর সঙ্গে আমাকে কথা বলতে দাও।

আমার পিসিমা আমার হাত ধরে বললেন, ভিতরে এস ট্রট। কিন্তু এখন দশ মিনিট কোন কথা বলো না।

আমি তাঁর ছোট্ট বসার ঘরটাতে এক জায়গায় বসলাম চুপ করে। পিসিমা ভিতরে গিয়ে

চোখে মুখে জল দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হলেন। প্রায় পনের মিনিট পরে উনি আমার কাছে ফিরে এসে শান্তভাবে আমাকে বললেন, ট্রট, লোকটা আমার স্বামী।

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, তোমার স্বামী পিসিমা? আমি ভেবেছিলাম তিনি মারা গেছেন।

পিসিমা বললেন হ্যাঁ, আমার কাছে মৃত। কিন্তু ও বেঁচে আছে। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর অতীতের অবহৃত স্মৃতিচারণ করে তিনি বলতে লাগলেন, লোকটা একদিন ভাল ছিল, দেখতে ছিল খুবই সুন্দর। আমি তাকে বিশ্বাস করে বিয়ে করেছিলাম। পরে দেখলাম লোকটা অপদার্থ। কোন আয়, কোন রোজগারের চেষ্টা নেই। শুধু টাকা চায়, আমার সম্পত্তি নষ্ট করে। আসলে লোকটা নিষ্ঠুর প্রকৃতির। আমি ওকে ছেড়ে চলে এলাম। কোন ঝগড়া বিবাদ না করেই। ওর নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রমাণ দেখিয়ে আমি সহজেই বিবাহ বিচ্ছেদ করতে পারতাম। কিন্তু তা করিনি। ও তার সুযোগ নিয়ে মাঝে মাঝে এসে টাকা চায়। আমি আমার সাধ্যের অতীত হলেও কিছু কিছু করে টাকা ওকে দিয়েছি। কিন্তু লোকটা ক্রমশই নিচে নেমে গেছে। ও আবার একটা মেয়েকে বিয়ে করেছে। ও মদ খায়, জুয়ো খেলে। অবনতির শেষ ধাপে নেমে গেছে। কিন্তু আগে যেমন বোকার মত না বুঝে সুঝে ওকে বিয়ে করেছিলাম, তেমনি আজও এ ব্যাপারে বোকাই রয়ে গেছি।

এই বলে এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে চাইলেন না পিসিমা। শুধু বললেন, এই হচ্ছে আমার দাম্পত্য জীবনকাহিনীর আদি, মধ্য ও অন্ত। এ ব্যাপারে আর আমি কোন কথা বলতে চাই না। তুমিও আর বেশী কিছু জানতে চেও না। কিন্তু তুমি এসব কথা আর কাউকে বলবে না। এটা অন্য কেউ জানে না, জানবেও না।

৩৪

সংবাদপত্রের সঙ্গে জড়িত এক সাংবাদিক হিসাবে আমার প্রচুর কাজকর্ম থাকা সত্ত্বেও আমি যে বইটা লিখছিলাম সেটা শেষ করার জন্য কঠোরভাবে পরিশ্রম করে যেতে লাগলাম। অবশেষে বইটা প্রকাশিতও হলো। বইটা আশাতীতভাবে খ্যাতি লাভ করল। আমি এতটা আশা করতে পারিনি। আমি প্রচুর প্রশংসা পেতে লাগলাম। কিন্তু সে প্রশংসা আমার শুনতে ভাল লাগলেও তাতে আমি বিচলিত হলাম না বা আত্মপ্রসাদে গলে গেলাম না। কি করে আমি এর থেকে আরও ভাল বই লিখে আরও বেশী কৃতিত্ব অর্জন করব সেই চিন্তাই আমার সাফল্যের সকল আনন্দকে ছাড়িয়ে দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল আমার মনে।

যতই আমি প্রশংসা পেতে লাগলাম ততই আমি নিজেকে সে প্রশংসার যোগ্য করে তোলার জন্যে চেষ্টা করে যেতে লাগলাম। আমি আর একখানা বই লেখার কাজে হাত দিলাম। সংবাদপত্রে ও সাময়িক পত্রেও লিখতে লাগলাম যথারীতি। কিন্তু পার্লামেণ্টের রিপোর্টারের কাজ আমি ছেড়ে দিলাম। তবে ডক্টর অফ্ কমন্স-এ যেতাম।

আমার বিয়ের পর বছর দেড়েক কেটে গেছে। ঘরকন্যা নিয়ে আর আমি মাথা ঘামাই না। সংসার তার নিজের পথে যান্ত্রিকভাবে চলতে লাগল।

ডোরার স্বভাবটা কিন্তু তেমনিই রয়েছে। জগৎ ও জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গিটা আগের মতই একেবারে অবাস্তব রয়ে গেছে! কোন জিনিষটাকেই ভাল করে বুঝতে চায় না ও। কথায় কথায় অভিমানে ফুলে ওঠে। কথায় কথায় চোখে জল আনে।

এর মধ্যে একটা দুঃস্থ দশ বারো বছরের ছেলে একটা কাজের জন্য আমার কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করতে থাকে। তার কেউ কোথাও নেই। খাওয়া পরা জোটে না। আমি দয়া করে তাকে বাড়িতে এনে ফাই ফরমাস খাটার কাজ দিলাম। প্রথম প্রথম ছেলেটা আমাদের প্রতি খুবই আনুগত্য ও ভক্তি দেখাল। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই সে ডোরার সোনার হাত ঘড়িটা চুরি করে সেটা কোথায় বিক্রি করে দিল। অবশ্য ডোরারও কিছুটা দোষ ছিল। সে তার কোন জিনিস ঠিক জায়গায় রাখে না। এখানে সেখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখে। কোন জিনিষের প্রতিই তার যত্ন নেই। পরে জানলাম ছেলেটার চুরির স্বভাব আগে থেকেই ছিল। সে এর আগে ঐ এলাকায় এখানে সেখানে দু-একটা জিনিস চুরি করেছে। সে ছিল ছিঁচকে চোর।

যাইহোক এ নিয়ে আমাকে আর তেমন মাথা ঘামাতে হলো না। পুলিশ ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেল। পরে তার জেল ও দ্বীপান্তর হয়।

এরপর থেকে ডোরাকে কোন কথা বোঝাতে গেলে বা তার কোন কাজের প্রতিবাদ করতে গেলেই সে অভিমানে ফুলে উঠত বলত, তুমি বলতে চাইছ, আমার দোষেই ঘড়িটা গেছে!

আমি তখন অপরাধীর মত মুখ করে বলতাম, আমি তো ঘড়িটার কথা মুখেই আনিনি।

ডোরা বলত, মুখে না আনলেও মন থেকে কথাটা দূর করতেও তো পারনি।

দাম্পত্য জীবনে সুখের মূল মন্ত্র হচ্ছে সমতা। দুজনের মন মিলে মিশে হবে এক, দুজনের উদ্দেশ্য হবে এক। দুটি মনের মধ্যে সমতা না থাকলে সুখ বা শান্তি আসবে না দাম্পত্য জীবনে। একথা আমি জানতাম বলেই আমি আমার বিয়ের পর থেকেই ডোরাকে আমার মনের মত করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলাম। তার মনটাকে আমার মনের স্তরে তুলে আনতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তা পারিনি। ক্রমে দেখলাম এ কাজ আমার পক্ষে অসাধ্য। তখন বাধ্য হয়েই আমি নিজেকে ডোরার সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টা করতে লাগলাম। যতদূর সম্ভব আমার মনটাকে তার মনের সঙ্গে মেশাতে চাইলাম। এই ভাবে এক অঘোষিত সন্ধি ও নীরব আত্মসমর্পনের বিনিময়ে সংসারে শান্তি আনার চেষ্টা করতে লাগলাম। তবে মাঝে মাঝে ভাবতাম ডোরার কোলে কোন সন্তান না আসা পর্যন্ত তার এই মনোভঙ্গির হয়ত কোন পরিবর্তন হবে না। তবু আমার এই অনুমানটা সত্যি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহও ছিল প্রচুর।

একদিন সকালের ডাকে মিঃ মিকবারের একখানা চিঠি পেলাম। তাঁর চিঠিটা চিরাচরিত রীতিতে বাগাড়ম্বরপূর্ণ ভাষায় লেখা। অতিশয়োক্তিতে ভরা। চিঠিটা একবার নয়, দু-তিনবার পড়েও তার প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারলাম না। কেবল একটা জিনিস বুঝলাম, তিনি তাঁর বর্তমান কর্মস্থানে সুখে নেই। তিনি মনে মনে বিব্রত ও অস্বস্তি বোধ করছেন। অথচ স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পারছেন না সেটা। শেষের দিকে জানিয়েছেন, তিনি আগামী পরশু সন্ধ্যা সাতটার সময় কিংস বেঞ্চ গ্রিমনের দক্ষিণ দিকের প্রাচীরের কাছে তার পুরনো বন্ধু ডেভিড কপারফিল্ড আর টমাস ট্র্যাড্‌লস্ এর সঙ্গে দেখা করবেন। অতএব আমরা দুজনে অর্থাৎ আমি আর ট্র্যাড্‌লস্

www.banglainternet.com

যেন সেখানে নির্দিষ্ট সময়ে অপেক্ষা করি।

আমি যখন এই চিঠিটা হাতে নিয়ে এই সম্বন্ধেই আকাশ পাতাল ভাবছিলাম তখন হঠাৎ ট্র্যাড্‌লস্ এসে হাজির হলো।

মনে মনে তখন আমি তাকেই চাইছিলাম। তাকে দেখে তাই আমি খুব খুশি হলাম। আমি চিঠিটা দেখিয়ে বললাম, এই দেখ আমি এইমাত্র মিঃ মিকবারের এই চিঠিখানা পেলাম।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, তুমি একা পাওনি, আমিও মিকবারের চিঠি পেয়েছি। তার সঙ্গে মিসেস মিকবারেরও একখানি চিঠি পেয়েছি।

আমি ট্র্যাড্‌লস্‌কে মিঃ মিকবারের চিঠির মূল বক্তব্য বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু ট্র্যাড্‌লস্ বলল, "বজ্রদ্বারা অগ্রপ্রসারী প্রতিহিংসার জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে গ্রাস করা"—এমন ভাষার কোন অর্থই বোঝা যাচ্ছে না। তবে সাধারণতঃ উনি মামুলী যে সব বিষয় নিয়ে চিঠি লেখেন, এ চিঠি তা নিয়ে নয়, এর বক্তব্য বিষয় সম্পূর্ণ অন্য।

আমি বললাম, মিঃ মিকবার ইউরিয়া হীপের অফিসে কেরাণীর কাজে ঢোকার পর থেকে আমার সঙ্গে বিশেষ কোন কথাই বলেননি। আমার সব প্রশ্ন এড়িয়ে গেছেন। যেন কোন এক গোপন বিষয়কে তিনি সযত্নে রক্ষা করে চলেছেন মনের মধ্যে। তবে ক্যান্টারবেরীতে ওরা যাওয়ার পর ওঁদের আর্থিক অবস্থা কেমন চলছে, কোন দেনায় পড়েছেন কিনা তার কিছুই জানি না।

আমি মিসেস মিকবারকে জানিয়ে দিলাম, আমরা দুজনে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে নির্দিষ্ট জায়গায় দেখা করব মিঃ মিকবারের সঙ্গে। চিঠিতে আমি ও ট্র্যাড্‌লস্ দুজনেই সই করলাম।

আমি আমার পিসিমাকেও এ বিষয়ে জানালাম। তিনিও বললেন নির্দিষ্ট সময়ে আমরা যেন সেখানে গিয়ে দেখা করি তাঁর সঙ্গে। নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ের আধ ঘন্টা আগেই আমরা গেলাম। গিয়ে দেখলাম মিঃ মিকবার সেই প্রাচীরের ধারে দাঁড়িয়ে আছেন।

আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে আবেগের সাথে আমাদের সঙ্গে করমর্দন করলেন। বললেন, অতীত জীবনের সেই আনন্দময় মুহূর্তগুলি আবার যেন কিছুক্ষণের জন্য ফিরে পেলেন তিনি। এরপর ট্র্যাড্‌লস্ বলল, আপনার মনটা কেমন বিষাদে ভরা মনে হচ্ছে।

মিঃ মিকবার বললেন, ঠিকই তাই। আমার মালিকের সঙ্গে আমার সম্পর্কটা আর তেমন গৌরবজনক নেই।

ট্র্যাড্‌লস্ জিজ্ঞাসা করল, তবে আইনের প্রতি আপনার কোন বিতৃষ্ণা জাগেনি তো? আমি নিজেও এখন একজন উকিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আমাদের বন্ধু হীপ কেমন আছেন মিঃ মিকবার?

প্রশ্নটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে পড়লেন মিঃ মিকবার। তিনি বললেন, আমার মালিক মিঃ হীপ আপনার বন্ধুও নন, আমার বন্ধুও নন, তিনি শয়তান কি না জানি না এবং তা না হলেও খেঁকশিয়ালের মতই ধূর্ত।

আমি তখন বললাম, ঠিক আছে ও প্রশ্নের কথা থাক। মিঃ উইকফিল্ড ও মিস উইকফিল্ড কেমন আছেন বলুন।

মিঃ মিকবার বললেন, মিস উইকফিল্ডের তুলনা হয়না। তিনি আদর্শ নারীর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তিনি সত্য, সরলতা ও সততার পথে ঠিক আগের মতই একাই এগিয়ে চলেছেন। বর্তমানে আমার যে অবস্থা তাতে তাঁর ধারে কাছে যাবারও সাধ্য নেই আমার। তিনি আমাদের মত সাধারণ মানুষ নন। তাঁকে দেখে মনে হয় এই জগৎ সংসারের ছায়াময় অস্তিত্বের অন্ধকারে চির আলোকিত ভাস্বর এক নক্ষত্র।

আমি দেখলাম এভাবে পথের উপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না। আমাদের অনেক কিছু জানার আছে মিঃ মিকবারের কাছে। আমি তাই তাঁকে ও ট্র্যাড্‌লস্‌কে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমার পিসিমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম। আমার বাড়িতে গেলাম না, কারণ ডোরার শরীরটা ভাল ছিল না।

আমি বললাম, অতীতের সেই আনন্দময় পূর্বস্মৃতির কথা মনে করে মন থেকে সব বিষাদ ঝেড়ে ফেলুন মিঃ মিকবার।

ট্র্যাড্‌লস্‌ বলল, মনের মধ্যে কিছু গোপন কথার বোঝা থাকলে আমাদের মত বন্ধুর কাছে তা অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করে মনটাকে হালকা করতে পারেন আপনি।

ট্র্যাড্‌লস্‌ বিচক্ষণের মতই কথাটা বলল। মিঃ মিকবার বললেন, হে ভদ্রমহোদয়গণ, তোমরা যা ভাল বোঝ কর। আমি এখন সমুদ্রে তাড়িত তৃণখণ্ডের মত যেদিকে তরঙ্গ আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সেইদিকেই যাচ্ছি।

আমার পিসিমা মিঃ মিকবারকে আন্তরিকতার সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালেন। মিঃ মিকবার তাঁর হাতটা চুম্বন করে জানালার ধারে গিয়ে বসলেন। পিসিমা বললেন, আশা করি আপনি ও আপনার পরিবারবর্গ কুশলে আছে মিঃ মিকবার। আপনি আমার ভাইপোর এক পুরনো বন্ধু।

আমি লক্ষ্য করলাম, মিঃ মিকবার এক প্রচণ্ড অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছেন। তিনি কিছু একটা গোপন কথা প্রকাশ করতে চাইছেন। আবার তা প্রকাশ করতে চাইছেন নাও বটে। ট্র্যাড্‌লস্‌ও সেটা লক্ষ্য করল।

মিঃ মিকবারকে চিন্তান্বিত ও বিষন্ন দেখে মিঃ ডিক তাঁর কাছে গিয়ে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে তাঁর করমর্দন করলেন। তাঁর সঙ্গে কোন পরিচয় না থাকলেও তিনি যেন তাঁর কতদিনের চেনা! লোকচরিত্র বোঝার অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত কোন মানুষকে দেখে তার মনের ভাব বোঝার অদ্ভুত এক ক্ষমতা ছিল ডিক-এর। ডিকের আন্তরিকতায় অভিভূত হয়ে পড়লেন মিঃ মিকবার। তিনি স্বীকার করলেন, পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষের জটিল অস্তিত্বের অরণ্য মাঝে এমন সবুজ, সজীব ও সরল মানুষ আমি কোথাও দেখিনি।

আমার পিসিমা বললেন, আমার বন্ধু ডিক একজন সাধারণ মানুষ নয়। মিঃ ডিক মিকবারকে বললেন, যাই হোক মনোবল হারাবেন না। যতদূর সম্ভব সহজ হবার চেষ্টা করুন।

মিঃ মিকবার এবার আমার পিসিমার কুশল জিজ্ঞাসার উত্তরে বললেন, আমার অবস্থা আগে এতটা খারাপ ছিল না। এখন আমি যেন এক বিশাল ভগ্নস্তূপ। আমার পরিবার খুবই দুরবস্থার মধ্যে আছে। পিসিমা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, একথা বলছেন কেন মিঃ মিকবার?

মিঃ মিকবার বললেন, আমার পরিবারের অস্তিত্ব দাঁড়িপাল্লার সুতোর মত এক ভয়ঙ্কর

অনিশ্চয়তার মধ্যে কাঁপছে। আমার মালিক—এই বলে কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলেন মিকবার। তিনি তাঁর সামনে রাখা একটা কমলালেবুর খোসা ছাড়াতে লাগলেন।

মিঃ ডিক হঠাৎ মিকবারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, আপনার মালিক সম্বন্ধে কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন?

মিঃ মিকবার বললেন, কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে খুব ভাল করেছেন স্যার। আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ এজন্য। হ্যাঁ, আমার মালিক মিঃ হীপ আমাকে তার ওখানে চাকরিতে নিযুক্ত করার সময় আমাকে বলেছিল আমি যদি লিখিত ভাবে তার কাছ থেকে বেতন স্বরূপ কোন টাকা পয়সা বা কোন বৃত্তি না নিই তাহলে আমি দেশের মধ্যে একজন ধনকুবের হয়ে উঠব এবং তরবারি গেলার মত অসাধ্য সাধন করতে পারব। কিন্তু দেখছি সব মিথ্যা। এখন আমার স্ত্রী ও শিশু সন্তানদের নিজেদেরকেই খেটে জীবিকার্জন করতে হবে।

এই বলে তিনি লেবু ছাড়িয়ে চিনি ও গরম জল দিয়ে সরবৎ বানানোর কাজে মগ্ন হয়ে গেলেন। আর কোন কথাই বললেন না। তারপর তাঁর হাত থেকে কাজের জিনিসগুলো পড়ে যেতেই হতাশ হয়ে উঠে পকেট থেকে রুমাল বার করে কাঁদ-কাঁদ ভাবে বললেন, এসব কাজ আমার দ্বারা হবে না। এর জন্য চাই নিশ্চিন্ত মন।

আমি বললাম, মিঃ মিকবার, কি ব্যাপার সব কথা খুলে বলুন। এখানে আপনি এখন আপনার বন্ধুদের মধ্যে আছেন। আমরা সবাই আপনার হিতাকাঙ্খী বন্ধু।

মিঃ মিকবার বলল, হ্যাঁ, আমি বন্ধুদের মধ্যেই আছি। আপনারা জানতে চাইছেন ব্যাপারটা কি, তাই তো? কিন্তু ব্যাপারটা কি নয় তা বলুন তো। ব্যাপার হচ্ছে শয়তানি, ব্যাপার হচ্ছে নীচতা, প্রতারণা, জুয়াচুরি, ষড়যন্ত্র। এই সবই হচ্ছে ব্যাপার আর এই সব কিছুর নাম হচ্ছে হীপ।

কথাটা শুনে আমরা সবাই বিস্ময়ে অভিভূত হয়েগেলাম। আমার পিসিমা আবেগের সঙ্গে হাততালি দিলেন।

মিঃ মিকবার হাতে রুমালটা ধরে হাতদুটো এমনভাব নাড়তে লাগলেন উত্তেজনার সঙ্গে, যাতে মনে হচ্ছিল তিনি যেন এক বিরাট সঙ্কটের সমুদ্রে সাঁতার কাটছেন! আমি তাঁকে এমন উত্তেজিত হতে আগে আর কখনো দেখিনি। তিনি গর্জন করে বললেন, সংগ্রাম শেষ। আমি আর এমন অসহনীয় অবস্থায় থাকতে চাই না পৃথিবীর সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে।

মিঃ মিকবার আরও বলে যেতে লাগলেন, তোমরা আমার স্ত্রী ও পরিবারকে ফিরিয়ে দাও। আমি আর ঐ নারকীয় শয়তানটার অধীনে চাকরি করব না। আমাকে যে কোন একটা কাজ দাও—তা সে কাজ তরবারি গেলার মত যত অসাধ্যই হোক না কেন?

মিঃ মিকবার হাঁপাতে হাঁপাতে বলে চললেন, যতদিন না আমি মাউন্ট ভিসুভিয়াসের মধ্যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাতে পারি, যতদিন না আমি মিথ্যাবাদী, ভণ্ড, প্রতারক ঐ হীপের মাথা থেকে তার চোখদুটোকে উপড়ে ফেলতে পারি, ততদিন আমি কারো হাতে হাত দেবনা। কারো আতিথ্য গ্রহণ করব না।

মিঃ মিকবার যেভাবে হীপের নামটা করার সঙ্গে সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর উত্তেজনায় ফেটে পড়ছিলেন এবং লড়াইয়ের ভঙ্গিতে হাত পা নাড়ছিলেন তাতে আমার ভয় হচ্ছিল হয়ত বা তিনি

www.banglainternet.com

এখানে এই মুহূর্তেই মারা যাবেন। মনে হচ্ছিল তিনি সহনশীলতার শেষ সীমায় চলে গেছেন। আমি তাঁকে সান্ত্বনা দেবার জন্য তাঁর কাছ উঠে যেতে চাইলে মিঃ মিকবার হাত নেড়ে আমাকে নিষেধ করে বললেন, না কপারফিল্ড, যতক্ষণ না আমি ক্যান্টারবেরির হোটেলে মিস উইকফিল্ড, মিসেস মিকবার, মিস বেটসিসহ আমার সমস্ত বন্ধুদের কাছে বিশ্বাসঘাতক হীপ-এর সমস্ত কুকীর্তির কথা প্রকাশ করতে পারি ততক্ষণ কোন কথা নয়।

এই কথাগুলি বলেই মিঃ মিকবার সহসা ঝড়ের বেগে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। তখন আশা, উত্তেজনা ও এক চরম বিস্ময়ের ঘোরে আমাদের অবস্থাটাও তাঁর মতই হয়ে উঠল।

কিন্তু এই অবস্থার মধ্যেও মিঃ মিকবারের চিঠি লেখার ঝোঁক যায় নি। তিনি আমাদের কাছ থেকে চলে যাওয়ার পরে একটি ছোট্ট চিঠি পাঠান আমার কাছে। সে চিঠিতে তিনি তাঁর এই আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তিনি আমাকে লেখেন, প্রিয় মহাশয়, আমার উত্তেজনাময় আচরণের জন্য আমি আপনার সদাশয়া পিসির কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। ধুমায়িত আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারের মত আমার অবদমিত অন্তর্দ্বন্দ্বই অকস্মাৎ বিস্ফোরণে ফেটে পড়ে। তার ফলেই এমন হয়! যাই হোক্ আমার কর্তব্য শেষ করে আমি পৃথিবীর জনারণ্যে হারিয়ে যাব। আমাকে আর কেউ দেখতে পাবে না। এক একটি ক্ষুদ্র সমাধিগহ্বরের মধ্যে শায়িত অচেনা অজানা মৃতদের মতই আমি চিরবিশ্রাম লাভ করব।

৩৫

মিঃ পেগটি এখনো তার আশা ছাড়েনি। সে এমিলিকে খুঁজে বার করবেই। সে লণ্ডনেই একটা ঘর ভাড়া করে থাকে আর ঘুরে বেড়ায় এখানে সেখানে। মাঝে মাঝে সে আমার বাড়িতে আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে। ডোরাও তাকে চিনে গেছে। অবাক বিস্ময়ে সে পেগটির কথা শোনে।

একদিন মুখ-আঁধারি সন্ধ্যার সময় আমার বাগানে আমি একা একা পায়চারি করছিলাম। সারাদিন বৃষ্টি হওয়ার জন্য ভারী বাতাসে একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব ছিল। স্তব্ধ ভিজে ভিজে গাছগুলোতে কোন পাখির ডাক শোনা যায়নি। এমন সময় সহসা মার্থা এসে বাগানের বাইরে থেকে আমাকে ডাকল। আমি কাছে গেলে মার্থা বলল, তাকে পাওয়া গেছে। আমি এইমাত্র মিঃ পেগটির বাসায় গিয়েছিলাম। কিন্তু দেখা পেলাম না। তুমি আমার সঙ্গে এখনি চল এক জায়গায়।

মার্থা আমাকে নিয়ে গেল গোল্ডেন স্কোয়ারের এক বাড়িতে। একটা বাড়ির তিনতলায় উঠে একটা রুদ্ধদ্বার ঘরের বাইরে আমরা চুপিসারে দাঁড়ালাম। ঘরের দরজাটায় অল্প একটু ফাঁক ছিল। মনে হলো ভিতরে দুজন মহিলা কথা বলছে। তাদের মধ্যে একজন মিস রোজা ডার্টল।

মিস রোজা ডার্টল একসময় বলল, আমি তোমাকে দেখতে এসেছি। জেমস স্টীয়ারফোর্থের মানসপ্রতিমাকে স্বচক্ষে দেখতে এসেছি। যে মেয়ে তার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে সারা শহরে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে ওঠে, যে মেয়ে স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গ লাভ করে ধন্য হয়েছে, সে মেয়ে

কেমন তা দেখতে এসেছি আমি।

এবার বুঝতে পারলাম রোজা ডার্টল এমিলির সঙ্গে কথা বলছে। এমিলি একা সেখানে কি করে এল তা বুঝতে পারলাম না। সে কথা এখন মার্থাকে জিজ্ঞাসা করারও কোন অবকাশ নেই। ঘরের ভিতর এমিলির কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। এমিলি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, সেজন্য শাস্তিও প্রচুর পেয়েছি। আমাকে অনেক কষ্টভোগ করতে হয়েছে। এখন আমি আর কোথাও যাব না। আমি আমার বাড়িতে কাকার কাছে ফিরে যেতে চাই।

মিস ডার্টল বলল, বাড়িটাকে তো ধ্বংস করে দিয়েছ। আবার বাড়ির কথা বলছ? তাছাড়া তোমার বাড়িও তেমনি। হয়ত তোমার বাড়ির লোকেরাই টাকা নিয়ে বিক্রি করেছে তোমাকে।

এমিলি একথার ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে বলল, আমাকে যত খুশি অপমান করতে পারেন, আমি দোষ করেছি। কিন্তু আমার বাড়ির সম্বন্ধে অপমানজনক কোন কথা বলবেন না দয়া করে।

রোজা ডার্টল বলল, তুমি জান না এই বাড়ির কি সর্বনাশ তুমি করেছ। যে বাড়ির তুমি ঝি বা রাঁধুনি হবারও যোগ্য নও, সেই সম্ভ্রান্ত পরিবারের এক বিধবা মহিলার একমাত্র সন্তানকে তুমি ছিনিয়ে নিয়ে এসেছ। একটা ভদ্র সম্ভ্রান্ত পরিবারের সব সুখশান্তি ছারখার করে দিয়েছ। আজ স্টীয়ারফোর্থের মত ছেলে তার মার সঙ্গে দেখা করতে পারে না! তোমার মত নীচ জাতের জেলে মেয়েদের আবার ভালবাসা কি? তাদের কি মর্যাদা আছে কোন? তাদের জলের ধার থেকে তুলে এনে এক ঘন্টা তাদের সঙ্গ উপভোগ করেই তো ছেড়ে দেওয়া যায়।

এমিলি বলল, আমাদের পরিবার গরীব হলেও ভদ্র। আমি আপনাদের মতই ভদ্রভাবে ভদ্র পরিবেশে মানুষ হয়েছি। আপনাদের ভদ্র পরিবারের ছেলেই আমাকে ভুল বুঝিয়ে আমাকে ঠকিয়ে এনেছে। তার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই ভাল হত। সে যেন এক অপমানজনক মৃত্যুর দূত হয়ে এসেছিল আমার জীবনে। আপনি জানেন না, পরকে কথার দ্বারা প্রভাবিত করার কি অসাধারণ ক্ষমতা তার আছে? সে আমাকে যা যা বলেছিল আমি তার সব কথা বিশ্বাস করেছিলাম। সে আমার সঙ্গে প্রতারণা করেই আমাকে বার করে আনে আমার বাড়ি থেকে। আমি তাকে না চিনেই বিশ্বাস করে ভালবেসেছিলাম।

কথাটা শুনেই এক তীব্র প্রতিহিংসার আগুনে জ্বলে উঠল রোজা ডার্টল। স্টীয়ারফোর্থের সঙ্গে তার বয়সের ফারাক সত্ত্বেও তার প্রতি এটা চাপা আসক্তি ছিল রোজার। এমিলিকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার ফলে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় সে আসক্তি। তাই সে এমিলির উপর এত ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তার প্রতিহিংসা এত দুঃসহ হয়ে ওঠে।

এমিলির কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে রোজা ডার্টল উঠে তাকে মারতে গেল। কিন্তু ঘুঁষিটা তার গায়ে পড়ল না। সে মেঝের উপর দাঁড়িয়ে রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল, তোর এত বড় স্পর্ধা! তুই কিনা বলিস তুই তাকে ভালবাসিস? তুই আবার সেই কথাটা নির্লজ্জের মত আমাকে বলছিস?

এই কথাগুলো বলেই আবার পাগলের মত হাসতে লাগল ডার্টল। আপন মনে বিড় বিড় করে বলতে লাগল, ও বলছে ও ভালবাসে এবং আমাকে বলছে সেকথা।

এমিলি এবার কাতরকণ্ঠে বলল, আমাকে যেতে দিন। এই বলে সে দরজার কাছে এগিয়ে

যেতেই রোজা ডার্টল তাকে ধরে এনে সেইখানে বসিয়ে দিল।

এমিলির উপর রোজা ডার্টল এর এই পীড়ন দেখে আমি স্থির থাকতে পারছিলাম না। ওকে মুক্ত করতেই হবে। কিন্তু নানাদিক ভেবে আমি ঘরের মধ্যে ঢুকতে পারছিলাম না। তাতে রোজা ডার্টল আমার উপর বিষোদ্‌গার করতে থাকবে। নানাভাবে আমার উপর প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে। আমি তাই তখন কেবল মিঃ পেগটির কথা ভাবছিলাম। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র মিঃ পেগটিই এসে এমিলিকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারে। রোজা ডার্টল তাকে ভর্ৎসনা করে অনেক কথা বলার পর এমিলি কাতরকণ্ঠে বলল, তাহলে আমি এখন কি করব?

রোজা বলল, কি করবে? জেমস স্টীয়ারফোর্থের প্রেমের স্মৃতিটাকে আঁকড়ে ধরে তার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে সুখে বেঁচে থাকবে। সে তোমাকে তার কোন পেটোয়া বা প্রিয় লোককে স্ত্রী হিসাবে তোমাকে উপহারই তো দিত। তুমি অতীতের কিছু গুণের স্মৃতি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করে বেঁচে থাকবে। আর তা যদি না পার তবে মরবে। তোমার মত এক হীন জীবের মৃতদেহ আবর্জনাস্তূপের মধ্যে পড়ে থাকবে।

এমন সময় সিঁড়ির নীচের ধাপে কার পদশব্দ শুনতে পেলাম। আমি জানতাম এ পদশব্দ কার।

রোজা ডার্টল এমিলিকে তার ঘর থেকে চলে যেতে বললে সে খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় মিঃ পেগটি মার্থার কাছ থেকে খবর পেয়ে রেগে এসে ঘরে ঢুকল। তখন 'কাকা!' বলে চিৎকার করে উঠল এমিলি। পেগটি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে যেতেই অচৈতন্য হয়ে পড়ল এমিলি। আমি তখনো পর্যন্ত ঘরের বাইরে সিঁড়ির উপর চাতালে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

পেগটি এমিলির অচেতন দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়েই আমাকে দেখতে পেয়ে বলল, মাস্টার ডেভি, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এতদিনে তিনি আমার ডাকে সাড়া দিয়েছেন। আমার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে। তিনি আমার স্নেহের ধনকে অবশেষে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

এই বলে এমিলিকে কাঁধে নিয়ে নিঃশব্দে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল পেগটি। সে বলে গেল, সে তার লণ্ডনের বাসায় নিয়ে যাচ্ছে এমিলিকে।

পরদিন খুব সকালে আমি আমার পিসিমার সঙ্গে ছোট্ট বাগানটায় বেড়াচ্ছিলাম। এমন সময় আমি খবর পেলাম মিঃ পেগটি আমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। আমি তাকে ডাকলে মিঃ পেগটি বাগানে আমার কাছ এল। আমার পিসিমা তখন বললেন, আমি এখন ডোরার কাছে যাই।

কিন্তু মিঃ পেগটি তাঁকে থাকতে বলল। আমরা তিনজন এক জায়গায় বসলাম। গতরাতে যা যা ঘটেছিল আমি পিসিমাকে তা আগেই বলেছিলাম।

মিঃ পেগটি এবার তার কথা বলতে শুরু করল। সে বলতে লাগল এমিলি এতদিন কোথায় কিভাবে ছিল—তার সেই অভিজ্ঞতার মর্মন্তুদ কাহিনী। সে বলল, গতরাতে আমি এমিলিকে আমার সেই বাসায় নিয়ে আসি যেখানে আমি তার জন্য কতদিন ধরে প্রতীক্ষায় আছি। তাকে আমি অচেতন অবস্থায় নিয়ে আসি। কয়েক ঘন্টা পরে তার জ্ঞান ফেরে। চেতনা ফিরে পেলেই সে নতজানু হয়ে হাত জোড় করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে বসে আমার কাছে ক্ষমা চায়। সে একে

একে তার এতদিনের সকরুণ অভিজ্ঞতার কথা সব বলে। তার সে সব কথা শুনে অন্তর আমার ব্যথায় বিদীর্ণ হয়ে যেতে থাকে।

আমাদের বাড়ি থেকে প্রথম পালিয়ে যাওয়ার পর সাপের মত ক্রূর সেই লোকটা অর্থাৎ যে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল, এমিলির সরল মন যাকে বিশ্বাস করে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল—সেই লোকটা তাকে নিয়ে গিয়ে একটা বাড়িতে বন্দী করে রাখে। তার মূল উদ্দেশ্যের কথা বুঝতে পেরে এমিলি কোন এক রাত্রিতে সেই বাড়ি থেকে কোনরকমে পালিয়ে যায়। সমুদ্রকূলে গিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাবার জন্য নৌকার সন্ধান করে। কিন্তু কোন নৌকা না পেয়ে সে সেই অন্ধকার সমুদ্রকূলে কতকগুলো পাথরখণ্ডের মাঝে শীতে কাঁপতে কাঁপতে মূর্ছিত হয়ে পড়ে থাকে। পরদিন সকালে কোন ভদ্রমহিলা সেখানে তাকে দেখে তার জ্ঞান ফিরিয়ে তার সঙ্গে কথা বলেন। তিনি তাকে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দেন। তিনি এমিলিকে খুবই ভালবাসতেন। তাঁর স্বামী দূরে কোথাও কাজ করতেন, তাই মহিলাটি এমিলিকে নিয়ে বাড়িতে থাকতেন। কিন্তু সেখানে এমিলির একটা বড় অসুবিধা ছিল। সে তাদের ভাষা বুঝতে পারত না। সে শুধু ইশারা আর অঙ্গভঙ্গির দ্বারা তার সব কথা বোঝাত। একবার এমিলির জ্বর ও খুব অসুখ করে। তাতে তার ভাষাগত অসুবিধাটা বেড়ে যায়। ভদ্রমহিলার স্বামী তখন বাড়ি আসেন। তাঁরা দুজনে মিলে এমিলির রোগ সারিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলেন। তারপর তাঁরা এমিলিকে সামান্য কিছু টাকা দিয়ে একটা জাহাজে করে প্রথমে লেহর্ন ও পরে ফ্রান্সে পাঠিয়ে দেন। ফ্রান্সে একটা হোটেলে মেয়েদের দেখাশোনা করার একটা কাজ পায় এমিলি। কিন্তু হঠাৎ সেখানে একদিন সাপের মত ক্রূর সেই লোকটাকে দেখতে পেয়ে ভয় পেয়ে যায় এমিলি। লোকটা অবশ্য তাকে দেখতে পায়নি। সেই সুযোগে সে তৎক্ষণাৎ হোটেল ছেড়ে পালিয়ে আসে। তারপর সে ফ্রান্স থেকে লেহর্ন চলে আসে। তারপর ডোভার হয়ে লণ্ডনে। লণ্ডন শহর সে আগে কখনো দেখেনি। তাই একা অসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় বড় বিপদে পড়ে। এমন সময় মার্থা নামে এক মহিলার সঙ্গে তার পরিচয় হয়। সে তাকে বাড়ি ফিরে যাবার কথা বলে। কিন্তু এমিলি তা চায়নি। কারণ তার ভয় হচ্ছিল, আমি হয়ত তাকে ক্ষমা করব না, হয়ত বাড়িতে সবাই তাকে বকবে। লজ্জা ও অপমানের ভয়ে সে তাই বাড়ি ফেরার কথা ভাবতে পারেনি। এই মার্থাই শেষে তাকে উদ্ধার করে। অবশ্য সবার উপরে আছেন ঈশ্বর।

এই কাহিনী শুনতে শুনতে আমার পিসিমার চোখে জল এসেছিল। তিনি চোখের জল মুছে মিঃ পেগটিকে বললেন, তুমি একজন আত্মত্যাগী মানুষ। তুমি তোমার অকৃত্রিম স্নেহভালবাসা আর আত্মত্যাগের পুরস্কার পেয়েছ।

কথাটা শুনে খুশি হলো মিঃ পেগটি। এমিলিও শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়ায় আমিও আনন্দের আবেগ আর চেপে রাখতে পারছিলাম না।

মিঃ পেগটি আমার আগের কথার জের টেনে বলতে লাগল, এই মহিলার কথা আগে আমাকে মাস্টার ডেভি বলেছিল। মার্থাই এমিলি বাড়ি ফিরতে না চাওয়ায় তাকে না জানিয়েই আমার খোঁজ করতে থাকে। অবশেষে আমার বাসা খুঁজে পেয়ে আমাকে খবর দিয়ে একটা বাড়িতে যেতে বলে। এদিকে অনাহারে অনিদ্রায় ও নিবিড় পথক্লান্তিতে এমিলির অবস্থা তখন

খুবই শোচনীয়। সে সব সময় কাঁপতে থাকে। প্রায়ই মূর্ছিত হয়ে পড়ত ও। মার্থা তাকে সেই অবস্থায় একটা বাড়ির উপরতলায় একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে রেখে আমাকে খবর দেয়। কিন্তু সেই নিষ্ঠুর মহিলা রোজা ডার্টল কোথায় কিভাবে যেন খবর পেয়ে সেখানে গিয়ে এমিলিকে অকারণে পীড়ন করতে থাকে। কিন্তু কেন, তা আমি বুঝতে পারিনি। যাই হোক, আমি আমার মেয়েকে পেয়ে গেছি এটাই যথেষ্ট।

আমি তখন মিঃ পেগটিকে জিজ্ঞাসা করলাম, ভবিষ্যতে আবার কিভাবে জীবন শুরু করবে মিঃ পেগটি?

মিঃ পেগটি বলল, আমি ঠিক করেছি আমি এমিলিকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় চলে যাব। সেখানে গিয়েই আমরা বসবাস করব। সেখানে কেউ তাকে চেনে না। কেউ কোন অপমানজনক কথা বলতে পারবে না। আমি ডকে গিয়ে খবর নিয়েছি, ছয় সপ্তাহ পর পর সেখানে যাবার জাহাজ ছাড়ে। এরপর অস্ট্রেলিয়া যাবার জন্য যে জাহাজ ছাড়বে আমরা সেই জাহাজে করেই সেখানে যাব। সেখানে বিশ্রাম আর শান্তি পাবে এমিলি—এখন ওর যেটা দরকার।

আমার পিসিমা মিঃ পেগটির এই সংকল্প সমর্থন করে বললেন, ঠিক আছে, তাই তুমি যাও।

এরপর মিঃ পেগটি তার পকেট থেকে দুটো ব্যাঙ্ক নোট বার করল। একটা পঞ্চাশ পাউণ্ড, আর একটা দশ পাউণ্ডের। তারপর আমাকে বলল, এই টাকাটা এমিলি স্টীয়ারফোর্থের কাছ থেকে নিয়ে চলে এসেছিল। আমি সেটা তাকে জিজ্ঞাসা করে জেনেছি। এখন আমি ঠিক করেছি, এই টাকাটা আমি স্টীয়ারফোর্থকে আর ঐ সমান পরিমাণ টাকা তার মার নামে পাঠিয়ে দেব। আমি ঠিক যাবার আগেই পাঠাব যাতে তারা ফিরিয়ে দিলেও আমার হাতে আসার আর কোন সুযোগ থাকবে না। এমিলি ফিরে এসেছে বলেই আমি তা পাঠাব। এইটা হবে তার দাম। তুমি কি বল মাস্টার ডেভি?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তুমি তাই পাঠিয়ে দিও মিঃ পেগটি। এটা ঠিকই হবে। ওদের তাতে করে উচিত শিক্ষা দেওয়া হবে।

এরপর পেগটি বলল, আর একটা কাজ বাকি আছে মাস্টার ডেভি। আমি যাবার আগে হ্যামকে একটা চিঠি লিখে যেতে চাই। ওকে আমি নিজে গিয়ে সব কথা বলতে পারছি না। আমার বোন পেগটি ইয়ারমাউথে হ্যামকে দেখবে। মিসেস গামিজকে নিয়ে সে ঠিক চালাতে পারবে না। তার অসুবিধা হবে। আমি তাই ঠিক করেছি, মিসেস গামিজ যাতে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে পারে তার জন্য একটা বৃত্তির ব্যবস্থা করে যাব। সে খুবই বিশ্বস্ত ও সৎ। সে আমার আশ্রিতা।

আমি বললাম, আমি যদি তোমার সঙ্গে যাই তাহলে কি তুমি ইয়ারমাউথে যাবে?

মিঃ পেগটি বলল, আমি যাব না। যদি দয়া করে আমার চিঠিটা নিয়ে যাও মাস্টার ডেভি তাহলে বড় উপকার হয়। তুমি গেলে তারা খুশি হবে। এমিলির কথা বলবে না এখন।

ডোরা তখন ভাল মনেই ছিল। আমি ডোরাকে সব কথা বললে সে আমাকে যেতে বলল।

আমি পরদিনই মিঃ পেগটির চিঠি নিয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করে ইয়ারমাউথ চলে গেলাম। সেখানে গাড়ি থেকে নেমে প্রথমে ওমেরের সঙ্গে দেখা করলাম। পুরনো দিনের কত স্মৃতি জড়িয়ে

এই হাঁপের রোগী ওমেরের সঙ্গে! পেগটি এখন তাদের পাড়ায় বার্কিসের বাড়িটা চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়ে হ্যামদের বাড়িতে চলে গেছে। বার্কিসের মৃত্যুর পর তার জায়গায় নতুন একজন লোক গাড়ি-ভাড়ার ব্যবসা করতে এসেছে। বার্কিসের বাড়িটা তাকেই ভাড়া দিয়েছে পেগটি। বার্কিসের গাড়ি আর ঘোড়াটাও সে ভাল টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছে পেগটির কাছ থেকে।

আমি শহরটা একটু ঘুরে বেড়িয়ে হ্যামদের সেই বোট হাউসে গেলাম। তখন সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। হ্যাম সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিল। তখনি এসে ঘর ঢুকল সে। ঘরে ছিল পেগটি আর মিসেস গামিজ। ওরা সবাই আমাকে হঠাৎ দেখে খুব খুশি হলো। হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল হ্যাম।

আমি বললাম: মিঃ পেগটি নতুন দেশে যাবে ব্যবসা করতে। অনেক ধনী হবে। কিন্তু এমিলির কথাটা বললাম না।

পেগটি সন্ধ্যার পর আমাকে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দিয়ে বলল, উপর থেকে কিছু বোঝা যাবে না, কিন্তু আমি জানি ওর অন্তরটা একেবারে ভেঙ্গে গেছে। ও একটা কারখানায় নৌকা নির্মানের কাজ করে। দক্ষ মিস্ত্রী। সারাদিন প্রচুর খেটে কাজ করে সন্ধ্যের দিকে ফেরে। কিন্তু সব সময় মনমরা হয়ে থাকে। আমরা সকলে মিলে গল্প করার সময় এমিলির নামটা দু-একবার করলেন, হ্যাম সে প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল।

পরদিন বিকালে হ্যাম কাজ থেকে ফিরে এলে তাকে নিয়ে আমি বেড়াতে গেলাম সমুদ্রের ধার দিয়ে। হঠাৎ একসময় হ্যাম আমাকে বলল, ওকে তুমি দেখেছ মাস্টার ডেভি?

আমি তাকে দেখেছি মূর্ছিত অবস্থায়।

হ্যাম বলল, পরে কি আবার তার সঙ্গে দেখা হবে বলে মন হয় তোমার?

আমি বললাম, তা ঠিক জানি না। তবে তোমার যদি কিছু বলার থাকে তা তাকে কোনভাবে জানাতে পারি।

হ্যাম তখন বলল, আমার বিশ্বাস, তুমি তাকে আমার কথা জানাতে পারবে। তুমি তাকে জানাবে, তার কাছে আমার একমাত্র প্রার্থনা সে যেন আমাকে ক্ষমা করে, কারণ আমি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার ভালবাসা পাবার চেষ্টা করেছিলাম। তার কাছ থেকে আমাকে বিয়ে করার প্রতিশ্রুতি আদায় করেছিলাম। আমার মনে হয় আমার্ জন্যই সে চলে গেছে। আমি এসব না করলে সে যেত না।

আমি তাকে বললাম, শুধু এই কথা তো?

হ্যাম বলল, আমি তাকে একদিন ভালবাসতাম। আজ তার স্মৃতিটাকে ভালবাসি। এখন আমি শুধু তার স্মৃতিটাকে ভালবেসেই সুখী।

হ্যাম একটু চুপ করে থাকার পর বলল, তোমাকে ধন্যবাদ মাস্টার ডেভি, তুমি কষ্ট করে এসে আমার সঙ্গে দেখা করলে। আমার পিসী লণ্ডনে গিয়ে কাকার সঙ্গে দেখা করবে। কাকা বিদেশে যাবার আগে ওরা মিলিত হবে। কিন্তু আমি আর কখনো তার সঙ্গে দেখা করব না। তবে আমি যখন অবোধ শিশু ছিলাম তখন সে আমাকে যত্ন করে লালন পালন করেছে। সে আমার বাবার থেকে বড়। তাকে আমার অকুণ্ঠ অশেষ ধন্যবাদ জানাবে।

এই বলে চলে গেল সে।

আমি এরপর আদের সেই ছোট হাউসে ফিরে গেলাম। আমার ধাত্রী পেগটি আগেই লণ্ডন শহরে চলে গেছে। গিয়ে দেখলাম মিঃ পেগটি এসেছে তার মালপত্র নিয়ে যেতে।

মিসেস গামিজের বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাকে অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে বলল। কিন্তু মিসেস গামিজ বলল, আমি বৃত্তি নেব না। আমি তোমার সঙ্গে যাব। তুমি যে দেশে যাবে আমি যেখানে তোমার ও এমিলির সঙ্গে থাকব। আমি তোমাদের সংসারে দাসীর মত সব কাজ করব। আমি আর আগের মত নেই। দেখবে আমার সেই বিষণ্ণ ভাব আর থাকবে না। দেখবে আমি কত কাজের মানুষ।

মিঃ পেগটি বলল, বুঝতে পারছ না, দূর সমুদ্রে জাহাজে অনেকদিন ধরে যেতে হবে অনেক দূর।

মিসেস গামিজ বলল, তা হোক, আমি তোমার সঙ্গে যাবই। আমাকে একা রেখে এভাবে চলে যেও না। আমি তোমার আশ্রয়েই এতদিন আছি।

এরপর মিসেস গামিজ আমাকে বলল, মাস্টার ডেভি, তুমি ওকে বলে রাজী করাও। আমাকে নিয়ে যেত বল।

আমি দেখলাম, মিসেস গামিজ আর আগের মত পাগলাটে ধরনের নেই। এখন যেন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এই ক'দিনের মধ্যেই জীবন সম্বন্ধে অনেক কিছু যেন শিখে ফেলেছে।

তার কাতর প্রার্থনা শুনে আমার করুণা হচ্ছিল। আমি মিঃ পেগটিকে তার জন্য অনুরোধ করলাম। পেগটির মনটাও অবশেষে নরম হলো। ঠিক হলো সেও মিঃ পেগটি ও এমিলির সঙ্গে যাবে।

মিঃ পেগটি ও আমি মালপত্র ও মিসেস গামিজকে নিয়ে বাড়ির দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে বেরিয়ে পড়লাম।

সেই অন্ধকার মেঘলা রাতে পেগটিদের নিঃসঙ্গ বোট হাউসটা একটা কালো স্তূপের মত দাঁড়িয়ে রইল। একদিন এই বাড়িটা রাত্রিকালে আলোয় ঝলমল করত। কত আনন্দ চঞ্চলতার স্রোত বয়ে যেত সে বাড়ির মধ্যে!

৩৬

মিঃ মিকবার আগে থেকে কখন কোথায় সবার সামনে ইউরিয়া হীপের শয়তানির ও চক্রান্তের সব কথা ফাঁস করে দেবেন, তার দিন তারিখ নির্ধারিত করে দিয়েছিলেন। সে সময় আসতে আর মাত্র চব্বিশ ঘন্টা বাকি। আমাকে ও আমার পিসিমাকে যেতে হবে ক্যান্টারবেরিতে। পিসিমা বললেন, আমি যাব না। ডোরার কাছে আমাকে থাকতে হবে। আমার প্রতিনিধি হিসাবে মিঃ ডিক যাবে আর তুমি থাকবে।

কিন্তু ডোরা জেদ ধরল। বলল, না পিসী, তোমাকেও যেতে হবে। তুমি ফিরে এসে আমাকে অনেক কথা বলবে। তুমি না গেলে আমি তোমার কোন কথা শুনব না। তোমার পিছনে জিপকে

David Copperfield, by Charles Dickens (Published 1850) Bengali Translation

লেলিয়ে দেব। আসলে ডোরা সুস্থই ছিল। মাঝে মাঝে সে দুষ্টুমি করে আদর পাবার জন্য অসুস্থতার ভান করত। অসুস্থ বললেই আমার পিসিমা গিয়ে তার কাছে থাকতেন। তাকে আদর করতেন এবং অনেক গল্প শোনাতেন। এসব ডোরার খুব ভাল লাগত।

যাই হোক, আমরা দুজনেই যাব বলে স্থির করলাম। সেদিন রাতেই মিঃ মিকবারের এক চিঠি পেলাম, পরদিন সাড়ে ন'টায় ক্যান্টারবেরির সেই হোটেলে আমাদের যেতে হবে।

আমরা নির্দিষ্ট সময়ের অনেক আগেই গিয়ে পৌঁছলাম। মিঃ মিকবারের কথা শোনার জন্য আমরা ক্রমশই উদ্বিগ্ন ও অধৈর্য হয়ে উঠছিলাম। আমরা প্রাতরাশ খেয়ে দেখলাম, সাড়ে ন'টা বাজতে আর দেরি নেই। আমরা সবাই অধীর আগ্রহে মিঃ মিকবারের আসার জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। আমার পিসিমা ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন। ট্র্যাড্‌লস্‌ সোফায় বসে একটা কাগজ নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। আমি জানালা দিয়ে মিকবারের পথ পানে চেয়েছিলাম যাতে তাঁর আসার খবরটা সবাইকে আগেই দিতে পারি। মিঃ ডিকও আমাদের সঙ্গে ছিলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি মিঃ মিকবারকে দেখতে পেলাম। ফাইল হাতে ব্যস্ত হয়ে আসছেন। আমি খবরটা সকলকে দিলাম। সকলেই তাঁর জন্য অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

মিঃ মিকবার ঘরে ঢুকতেই মিঃ ডিক এগিয়ে গিয়ে তাঁর করমর্দন করলেন। মিঃ মিকবার খুশি হয়ে বললেন, ধন্যবাদ মিঃ ডিঅন।

এই নতুন নামে অভিহিত হয় মিঃ ডিক বেশ আনন্দিত হয়ে আবার করমর্দন করলেন মিঃ মিকবারের সঙ্গে। পিসিমা একটা ধমক দিতেই চুপ করে বসলেন ডিক। কিন্তু একটু পরেই মিঃ মিকবারের প্রতি দরদবশতঃ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, একটা চপ খাবেন স্যার?

মিঃ মিকবার বললেন, ক্ষুধা আমাকে অনেক আগেই ছেড়ে গেছে মিঃ ডিঅন।

মিঃ মিকবার বললেন, ছোটখাটো অন্যায় ও কারচুপিগুলোর কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। মিঃ উইকফিল্ডের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাঁর কারবারের অংশীদার হয়ে ইউরিয়া হীপ তাঁর প্রতি যে সব বড় রকমের অন্যায় করে তাঁর ক্ষতি করে, আমি সেগুলোকেই আপনাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করব।

এই বলে মিঃ মিকবার কাঠের রুলারটা বগলে চেপে রেখে তাঁর অভিযোগগুলো পড়ে যেতে লাগলেন। উপস্থিত আর সকলের মত ইউরিয়া হীপও তাঁর দিকে এক প্রবল অসন্তোষ ও বিহ্বলতা চেপে রেখে তাকিয়ে রইল। এর আগে একসময় মিকবারকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তিনি রুলার দিয়ে তার হাতটা সরিয়ে দেন। ইউরিয়া ও ট্র্যাড্‌লস্‌ও আমার ভয়ে চুপ করে যায়।

মিঃ মিকবার বললেন, আমি যখন হীপের কাছে কাজে যোগ দিই তখন মাইনে হিসাবে আমাকে সপ্তায় আটাশ শিলিং করে দেওয়া হতে থাকে। এই সামান্য বেতনে আমি স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্য ও অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ি। তার জন্য প্রায়ই আমাকে হীপ-এর কাছে টাকা ধার চাইতে হত আর তারই সুযোগ নিয়ে হীপ আমাকে দিয়ে যত সব অপকর্ম করিয়ে নিত। যাই হোক, এসব কথা এখন না বলে মূল অভিযোগে আসি।

মিঃ উইকফিল্ডের দৈহিক শক্তি ও স্মৃতিশক্তি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে কারবার চালাবার পক্ষে, তখন হীপ তার সুযোগ নিয়ে কুউদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিজের লোভ আর স্বার্থ চরিতার্থ করার

www.banglainternet.com

জন্য তাকে অংশীদার হিসাবে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। হীপ অংশীদার হিসাবে কারবারে ঢুকেই যত সব গুরুত্বপূর্ণ বা গুরুত্বহীন সব কাগজপত্রেই মিঃ উইকফিল্ডের স্বাক্ষর জোর করে আদায় করে নেয়। ব্যাঙ্ক থেকে টাকাও তুলতে থাকে ইচ্ছামত। একবার কারবারে মূলধন হিসাবে লগ্নীকৃত ফাণ্ড থেকে চৌত্রিশ পাউণ্ড ও এগার পাউণ্ড তুলে কারবারের বিভিন্ন খাতে খরচ চালাবার কথা বলে। সে বলে মিঃ উইকফিল্ডের আমলে যে সব দেনা হয় তা শোধ করতে হবে এবং তাঁর দোষে যে সব ঘাটতি হয় তা পূরণ করতে হবে।

এই সময় ইউরিয়া হাত নেড়ে বলল, কপারফিল্ড ওকে বল, এটা ও প্রমাণ করতে পারবে?

মিঃ মিকবার তখন ট্র্যাড্‌লস্‌কে বললেন, হীপকে বল ও আগে যে বাড়িতে থাকত আমি সেই বাড়িতেই থাকি এবং সেখানেই তার একটা পকেট বই পাই। ওকে জিজ্ঞাসা কর, ও একটা পকেট বই নিজের হাতে পুড়িয়ে দিয়েছে কিনা এবং যদি সে তোমাকে বলে তার ছাই কোথায় তাহলে আমার নাম করে বলবে আমি তা জানি এবং আমি তখন এমন কথা বলব যাতে তার মোটেই সুবিধা হবে না।

এমন সময় ইউরিয়া হীপের মা চিৎকার করে তার ছেলেকে বলল, ইউরি, ইউরি, চুপ করে থাক, নত হয়ে থাক, মিটমাট করে নে বাছা।

ইউরিয়া তার মাকে ধমক দিয়ে বলল, তুমি চুপ করতো। আমি তো এতদিন নত হয়েই থেকে এসেছি।

মিঃ মিকবার বললেন, এবার দ্বিতীয় অভিযোগ, হীপ পর পর কয়েকবার অফিসের খাতা, বই ও ফাইলে উইকফিল্ডের সই জাল করেছে এবং এর একটি ঘটনা আমি প্রমাণ করতে পারি।

মিঃ উইকফিল্ড অক্ষম হয়ে পড়ায় হীপ তাঁর বাড়িতে এসে বাস করতে থাকে এবং সকল বিষয়ে তাঁর পরিবারের উপর নিজের অন্যায় প্রভুত্ব জোর করে চাপিয়ে দিতে থাকে। সে একটা লগ্নি করা বইয়ে মিঃ উইকফিল্ডের জাল সই যুক্ত করে। এই মিথ্যা সই করে বইয়ে বণ্ডের টাকা মেটাবে বলে সে টাকাগুলো আত্মসাৎ করে। এর প্রমাণ আমার কাছে আছে এবং তার নকল সইয়ের আরো অনেক প্রমাণ আমার কাছে আছে।

ট্র্যাড্‌লস্‌ বলল, হ্যাঁ এটা সত্যি।

ইউরিয়ার মা আবার ইউরিয়াকে চুপ করে নত হয়ে থাকতে বলল। তাকে মিটমাট করে নিতে বলল। ইউরিয়া তার মাকে চুপ করতে বলল।

মিঃ মিকবার বললেন, এবার তৃতীয় এবং শেষ অভিযোগের কথা। আমার স্ত্রী মিসেস মিকবার তার পকেটবইটা আমাদের বাসাতে পায়। হীপরা আগেই ঐখানেই ছিল। হীপের বিরুদ্ধে তৃতীয় ও শেষ অভিযোগ হলো, সে তার অদম্য, অপরিসীম অর্থলোভকে চরিতার্থ করার জন্য শেষে মিঃ উইকফিল্ডের বাড়ির সমস্ত আসবাবপত্র সহ কারবারে তাঁর সমস্ত অংশ হীপকে ছেড়ে দেবার কথা লিখে এক দলিল তৈরি করে। তাতে হীপ তাঁকে বার্ষিক একটা বৃত্তি দেবে বলে। গত কয়েকমাস ধরে সে মিঃ উইকফিল্ডের উপর এই দলিলে স্বাক্ষর করার জন্য চাপ দিতে থাকে। অবশেষে তিনি দেউলিয়া ও নিঃস্ব অবস্থায় হীপকেই একমাত্র অবলম্বন হিসাবে জ্ঞান করেন, নিরুপায় হয়ে স্বাক্ষর করেন। আর এইভাবে হীপ শেষ কুঅভিসন্ধি পূরণ করে।

অ্যাগনিস আমার কাছে দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। আমি তাকে সান্ত্বনার কয়েকটা কথা বললাম। মিঃ মিকবার এবার চুপ করলেন।

ঘরের মধ্যে একটা সিন্দুকে চাবি লাগানো ছিল। হীপ তাড়াতাড়ি গিয়ে সেটা খুলে দেখল সেটা একেবারে শূন্য। সে তখন জিজ্ঞাসা করল, কাগজপত্র কে নিল? কে সে চোর?

মিঃ মিকবার গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি নিয়েছি। রোজই আমি এ চাবি তোমার কাছ থেকে নিই। আজ একটু আগে নিয়েছি।

ট্র্যাড্‌লস্ এবার হীপকে বলল, এখন আমার কাছে আছে। তা ছাড়া তোমার কাছে কারবারের অংশীদার সংক্রান্ত যে সব কাগজপত্র, বই, খাতা, টাকার হিসাব, লেনদেনের হিসাব, সব আমাকে এনে দাও। অবশেষে যে শেষ দলিলটা করেছ সেটাও এনে দাও।

হীপ বলল, যদি তা না দিই!

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, তাহলে সেই বোস্টোন জেলে যেতে হবে তোমায়। কপারফিল্ড একবার থানায় গিয়ে কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে এস।

ইউরিয়া তখন ভয় পেয়ে তার মাকে তার ঘরে গিয়ে দলিলটা আনতে বলল। মিঃ মিকবার মিঃ ডিককে তার সঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। আমার পিসিমা এবার বললেন, আমি মিঃ উইকফিল্ডের কাছে যে সব টাকা জমিয়ে রেখেছিলাম, ঐ শয়তান হীপটা তা এইভাবে একে একে আত্মসাৎ করেছে। ট্রট, ওর কাছে সব টাকা আদায় করে নাও।

আমি তাকে কোনরকমে শান্ত করলাম।

ইউরিয়ার মা শুধু সেই দলিলই নয়, তার সঙ্গে একটা বাক্স এনে ট্র্যাড্‌লস্-এর হাতে তুলে দিল। তার মধ্যে ছিল ব্যাঙ্কের কাগজ এবং অন্য সব দরকারী কাগজপত্র ও দলিল। এগুলো পরে আমাদের খুবই কাজে লাগবে।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, খুব ভাল হয়েছে। সব কাগজপত্রই পেয়ে গেছি।

ইউরিয়া হীপ মিঃ মিকবারকে বলল, তোমাকে দেখে নেব। এর প্রতিফল পাবে তুমি।

মিঃ মিকবার একটা বড় কাজ সম্পন্ন করার সাফল্যে গর্বিত হয়ে তার সে কথা গ্রাহ্য করলেন না। হীপ তখন সবাইকে ছেড়ে আমার উপর বিষোদ্‌গার করল। বলল, কপারফিল্ড, তুমি সব সময় আমার বিরুদ্ধে লেগে আছ। তুমিই এই সব করিয়েছ এদের দিয়ে।

আমি বললাম, তুমি নিজের লোভ দমন করতে না পেরে এক অসঙ্গত উচ্চাভিলাষে মত্ত হয়ে নিজের সর্বনাশ নিজে ডেকে এনেছ। এর জন্য কেউ দায়ী নয়। দায়ী হচ্ছ তুমি নিজে।

অ্যাগনিস তখন বাবার কাছে চলে গেল। আমি পিসিমাকে নিয়ে গেলাম। ইউরিয়া হীপ যাতে ঘর ছেড়ে কোথাও পালিয়ে যেতে না পারে ট্র্যাড্‌লস্ তার ব্যবস্থা করবে।

৩৭

কয়েকদিনের ব্যস্ততার পর আবার আমি আমার বাড়িতে ডোরার দিকে নজর দিলাম। দেখলাম ডোরা অসুস্থ হয়ে শয্যাগত হয়ে পড়েছে। কতদিন সে এইভাবে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে

তা ঠিক বলতে পারব না। তবে এখন ডোরার সব আনন্দ, চঞ্চলতা, যত প্রাণোচ্ছ্বাস স্তব্ধ হয়ে গেছে। সে এখন দিনরাত বিছানায় শুয়ে থাকে। আর সে জিপকে নিয়ে বাড়িময় ছোটাছুটি করে বেড়ায় না। কথায় কথায় তর্ক করে না বা অভিমানে ফুলে ওঠে না।

অথচ রোগটা যে কি তা আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। ডাক্তার বলল, দিনকতক পরেই সব ঠিক হয়ে যাবে। সুস্থ হয়ে উঠবে ডোরা। কিন্তু আমার কেবলি ভয় হতে লাগল, সেদিন হয়ত আর কখনই আসবে না যেদিন আমার বালিকাবধূ তার পুরনো বন্ধু জিপকে নিয়ে বাগানে গিয়ে উজ্জ্বল সূর্যালোকে ছোটাছুটি করবে।

আমার পিসিমা প্রায় সবসময়ই ডোরার কাছে থাকেন। তিনি ডোরাকে খুবই ভালবাসেন।

ডোরা স্পষ্ট একদিন বলল, তোমাদের সেবা ও আন্তরিকতার তুলনা নেই।

ডোরার অবস্থা দেখে জিপের দুঃখের অন্ত নেই। সে রোগা হয়ে গেছে। মনে হলো হঠাৎ যেন সে অকালে বুড়ো হয়ে গেছে। সব সময় ঝিমিয়ে থাকে।

একদিন সকালবেলায় আমি ডোরার খাটের পাশে একটা চেয়ারে বসেছিলাম। ডোরা আমায় বলল, দেখ, আমার কোঁচকানো চুলগুলো তেমনি লম্বা হয়ে আছে। তুমি আমাকে প্রথম দেখার পর থেকেই এই চুলের প্রশংসা করতে। আমি তাই আমার ঘরে নির্জনে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে এই চুলগুলোকে দেখতাম আর খোঁপা বাঁধার কথা ভাবতাম। কিন্তু পরে দেখলাম তুমি খোঁপা পছন্দ কর না। এই কুঞ্চিত কেশপাশ আলুলায়িত অবস্থাতেই ভালবাস।

তার চুলগুলো বালিশে ছড়ানো ছিল।

তারপর সে বলল, আমরা বিয়ের পর যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলাম, সেখানে গিয়ে বেড়াতে মন হচ্ছে।

আমি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললাম, তুমি ভাল হয়ে উঠলেই আমরা সেখানে বেড়াতে যাব।

ডোরা বলল, আমি আগের থেকে সত্যিই অনেকটা ভাল আছি, তুমি তা বুঝতে পারছ না।

কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম, ডোরার অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছে। সে আর হয়ত কোনদিনই বিছানা থেকে উঠতে পারবে না।

আর একদিন সন্ধ্যার সময় আমি তেমনি বসেছিলাম তার বিছানার পাশে। ডোরা বলল, মিঃ উইকফিল্ড কেমন আছেন? তুমি আমাকে সেদিন বলেছিলে তাঁর অবস্থা ভাল নয়। আমি অ্যাগনিসকে একবার দেখতে চাই। তাকে আসতে বলবে?

আমি বললাম, আমি চিঠি পাঠাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে সে এসে পড়বে।

এরপর ডোরা বলল, আমি সব সময় উপরতলায় শুয়ে আছি। তুমি যখন নীচের তলায় যাও তখন তোমার বড় একা একা মনে হয়, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ তোমার শূন্য চেয়ারটা তোমার কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

ডোরা বলল, তাহলে আমার মত একজন অপদার্থ মেয়ের অভাবটাও তুমি বোধ কর ডেভি?

ডোরা আমাকে আদর করে 'ডেভি', 'দুষ্টু ছেলে' বলে ডাকত। সে আমার কাছে আরও সরে এসে বলল, তুমি একবার অ্যাগনিসের কাছে গিয়ে বল, আমি তার সঙ্গে একবার দেখা করতে

চাই। আর আমি কিছুই চাই না। আমি তাকে একটা কথা বলতে চাই।

কিছুক্ষণ পর ডোরা আমাকে বলল, হে আমার প্রিয় ডেভি, আমার কেবলি মনে হয়, বধূ হিসাবে আমি সত্যিই একবারে বালিকা। একবারে অনভিজ্ঞা। এখন তুমি তা বুঝতে পারছ না, এখন তুমি আমায় ভালবাসছ। কিন্তু ভবিষ্যতে বুঝতে পারবে। তোমার স্ত্রী হিসাবে আমার অযোগ্যতাটা প্রকট হয়ে উঠবে তোমার কাছে। তখন তুমি আর ভালবাসতে পারবে না আমাকে।

আমি তাকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, একথা বলে কেন আমাকে কষ্ট দিচ্ছ প্রিয়তমা? আমি কি কোনদিন ঘুণাক্ষরেও এ নিয়ে কিছুমাত্র তিরস্কার করেছি? তোমার সব কিছুই আমার ভাল লাগে। তুমি ফুলের মতই সুন্দর, সরল ও অকপট। তোমার এই সাংসারিক অনভিজ্ঞতা ও তোমার শিশুসুলভ আচরণ—তারই যেন একটা অংশ। আমি তোমার স্বামী হিসাবে যতখানি যোগ্য, স্ত্রী হিসাবে তুমিও আমার ততখানিই যোগ্য।

আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে থাকলে ডোরা বলল, দেখ দেখ, বেচারা ছেলেটা কেমন কাঁদছে। চুপ, চুপ কর।

অ্যাগনিসকে খবর দিতেই সে এসে একটা গোটা দিন আমাদের কাছে রইল।

অ্যাগনিস যখন নীচের তলায় জিপের কাছে বসেছিল ডোরা তখন আমায় তাকে ডেকে দিতে বলল। বলল, আমি যখন তার সঙ্গে কথা বলব, তখন সেখানে আর কেউ থাকবে না। পিসিমাও না।

আমি নীচের তলায় গিয়ে বসলাম। বিয়ের পর থেকে আমি যা যা বলেছিলাম, যা যা অনুভব করেছিলাম সেই সব কথা, সব অনুভূতি একে একে মনে পড়ল আমার। স্মৃতির সমুদ্র থেকে আমার ভালবাসায় সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল ডোরার মূর্তিটা বার বার উঠে আসতে লাগল।

জিপ তার ক্ষীণ দেহটা টানতে টানতে কোনরকমে আমার কাছে এসে আমাকে উপরে ডোরার কাছে যাবার জন্য ডোরাকে ডাকার জন্য ইশারা করতে লাগল। আমার চোখ ফেটে জল এল। আমি বললাম, আর উপরে গিয়ে কোন লাভ নেই জিপ।

জিপ যেন আমার কথা বুঝতে পেরে আমার দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আমার কাছে বসে পড়ল। আমার হাত চাটতে লাগল। যে জিপ একদিন তার প্রভু ডোরার প্রেমে আমাকে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে কত ঈর্ষা, কত তর্জন-গর্জন করত, আজ সেই জিপ আমাকেই ডোরার বিকল্প বা একমাত্র প্রভু ভেবে আমাকে তার অকুণ্ঠ ভালবাসা দান করল। ডোরার জন্য সংরক্ষিত তার সব ভালবাসা আমার দিকে তাকিয়ে থাকা তার চোখের জল হয়ে যেন ঝরে পড়ত লাগল।

তারপর জিপ ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুমোতে পারল না। ডোরার কাছ ছাড়া হবার পর থেকে তার প্রভুকে হারাবার পর থেকে সে একদিনও ঘুমোতে পারেনি।

এবার শেষবারের মত এক মর্মন্তুদ চিৎকার করে চিরনিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল জিপ।

অ্যাগনিস, দেখ দেখ! এই বলে আমি ছুটে গেলাম উপরে। আমি পাগলের মত ঘরে ঢুকে দেখলাম, ওদিকেও সব শেষ। অ্যাগনিসকে তার জীবনের শেষ কথা বলতে বলতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করছে ডোরা। জিপ ও ডোরা এক মুহূর্তেই চলে গেল পৃথিবী থেকে। কি আশ্চর্য! দুটি আত্মার মধ্যে কত মিল! দুটি আত্মা দুটি ভিন্ন জাতীয় জীবদেহে বাস করেও কত কাছে থাকত

পরস্পরের। ভিন্ন হয়েও তাই অভিন্ন দুটি আত্মা এক সময়ে একই সঙ্গে দেহদুটি ত্যাগ করে স্বর্গের অভিমুখে যাত্রা করল।

আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হয় গেল। ডোরাকে হারিয়ে আমার মনে হলো আমার জীবনটা যেন মিথ্যা হয়ে গেল। বাইরে রাত্রির আকাশে তখন চাঁদ ছিল। কিন্তু চাঁদের সব আলো ম্লান হয়ে উঠল আমার কাছে। মনে হলো একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর কোথা থেকে এসে আমার ভবিষ্যতের পথটাকে রুদ্ধ করে দিল। আমি আমার সব প্রাণশক্তি, সব কর্মোদ্যোগ হারিয়ে সত্যিকারের নিঃস্ব হয়ে উঠলাম মনে প্রাণে।

৩৮

কেউ কেউ আমাকে বলল, কিছুদিনের জন্য বিদেশে বেড়িয়ে এলে মনে শান্তি ফিরে পাব আমি । এই অবস্থায় একমাত্র বিদেশ ভ্রমণই আমার শোকের উপশম ঘটাতে পারে।

কিন্তু বিদেশে যাব কি না সে সিদ্ধান্তের ভার আমি অ্যাগনিসের উপর ছেড়ে দিলাম।

স্বর্গ থেকে মৃত্যুর দূত এসে ডোরাকে যখন ছিনিয়ে নেয় পৃথিবী থেকে, তখন অ্যাগনিসের কোলে মাথা রেখে মুখে এক টুকরো ক্ষীণ হাসি নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ডোরা। ডোরা কেমন অ্যাগনিসের কোলে মাথা রেখে পরম শান্তিতে মরতে পেরেছে! ডোরা আমাকে লুকিয়ে আমাকে না জানিয়ে অ্যাগনিসের হাতেই আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেছে। আমার সব ভার সারা জীবনের মত তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে সব দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে গেছে।

এর পর অ্যাগনিস যখন আমার শূন্য বাড়িতে হাত তুলে সান্ত্বনা দিত তখন আমার মনে হত স্বর্গ থেকে যেন দেবদূত নেমে এসেছে। তার শান্ত ও পবিত্র উপস্থিতি এক পরম শান্তির প্রলেপ লাগিয়ে দিত আমার ক্ষতবিক্ষত মনে।

আমার বিদেশযাত্রার সব ঠিক হয়ে গেল। তবে একটা বিষয়ের জন্য আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। মিঃ মিকবার হীপের ব্যাপারে কি হেস্তানেস্তা করেন সেটা দেখতে হবে। তাছাড়া আমার সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও অনুরক্ত বন্ধু ট্র্যাড্‌লস্‌-এর অনুরোধে আমি আপাততঃ যাত্রা স্থগিত রাখলাম। ট্র্যাড্‌লস্‌ আমাদের ক্যান্টারবেরি যাবার জন্য একদিন অনুরোধ করে পাঠাল। আমি আমার পিসিমা ও অ্যাগনিসকে নিয়ে ক্যান্টারবেরি চলে গেলাম। আমরা গেলাম মিঃ মিকবারের বাড়িতে।

এদিকে ট্র্যাড্‌লস্‌ সেদিন থেকে আমাদের সকলের পক্ষ থেকেই মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতে বসে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরী করছিল। সব কিছুর তদন্ত করছিল আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে।

মিঃ মিকবার সেদিন সকলের সামনে ইউরিয়া হীপের সব রহস্য উদ্‌ঘাটন করার পর থেকে আবার সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের কাজে তিনি এমন ভাবে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন যে মনে হত তিনি যেন ঈশ্বরকে পাবার জন্য সংসার ত্যাগ করে ধর্মসাধনা করছেন। আত্মীয়-বন্ধু কারো সঙ্গেই কোন সম্পর্ক রাখতেন না, স্ত্রীর সঙ্গে ভাল করে কথা বলতেন না। মিসেস মিকবার আমাদের কাছে এত অভিযোগ করতেন, সেই মানুষটাই যেন কেমন হয়ে গেছেন। কিন্তু আমরা কেউই এর প্রকৃত কারণটা জানতে পারিনি।

সেদিন মিঃ মিকবারের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, মিঃ মিকবার তাঁর স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের প্রতি আচরণের দিক থেকে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠেছেন। বুঝলাম ইউরিয়া হীপের রহস্যময় ব্যাপারের গোপনীয়তা অবলম্বনের জন্যই তিনি পারিবারিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন কঠোর মনোভাব দেখিয়েছিলেন। যার জন্য আমার সঙ্গেও ভালভাবে প্রাণখুলে কথা বলতেন না আগের মত।

আমার পিসিমা তাঁদের ঘরে ঢুকেই মিঃ মিকবারকে তাঁর বিদেশে যাওয়ার পকিল্পনার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। মিঃ মিকবার আগেই আমাদের বলেছিলেন, হীপের এই ব্যাপারটা চুকে গেলেই তিনি সমুদ্রপারে কোন বিদেশে গিয়ে অনেক জমি নিয়ে চাষের কাজ আর পশুপালন করবেন।

মিঃ মিকবার বললেন, বিদেশে যাওয়ার সিদ্ধান্ত একেবারে পাকা করে ফেলেছি। এখন বাকি আছে শুধু কৃষিযোগ্য বেশ কিছু জমির জন্য টাকা এবং আমাদের পথখরচের টাকাটা যোগাড় করার ব্যবস্থা । অবশ্য তার জন্য আমার বন্ধু ও শুভার্থীরাও চেষ্টা করছেন। তবে আমি টাকা ধারের জন্য সুদখোর ইহুদীদের কাছ যেতে চাই না। এর জন্য আমি ব্যক্তিগত ভাবে জামিন দিতে রাজী।

মিসেস মিকবার আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি মনে করি আমাদের বাড়িতে আমাদের খরচ জোগাড়ের জন্য এক ভোজসভায় আমার পরিবারের লোকদের ডেকে আনা হোক। সেই ভোজসভায় মিঃ মিকবার তাঁর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার কথাটা তাদের বুঝিয়ে বলুন। আমার মনে হয় তাহলে আমার পরিবারের লোকেরা নিশ্চয়ই তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসবে। আসল কথা মিঃ মিকবার আমার পরিবারের লোকদের ঠিকমত বুঝতে পারেন না। আমার পরিবারও তাঁকে বুঝতে পারে না। এইভাবে দুপক্ষের মধ্যে গড়ে উঠেছে ভুল বোঝাবুঝির এক বিরাট ব্যবধান।

মিঃ মিকবার বললেন, তুমি যতই বল তোমার পরিবারের লোকেরা আমাকে কোনদিনই বুঝতে চাইবে না, বুঝতে পারবে না। আসল কথা আমার দারিদ্র। অভাব অনটনের জন্য আমাকে তারা দেখতে পার না, আমাকে তুচ্ছজ্ঞান করে। তবে আমি বলে দিচ্ছি, তোমার পরিবারবর্গ আমাকে সাহায্য না করলেও আমি আমার উদ্দেশ্য সাধন করব। আমার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করব।

মিসেস মিকবার বললেন, যেভাবেই হোক, আমাদের বিদেশে যাওয়া উচিত। আমি মনে করি আমার স্বামীর যে যোগ্যতা ও কার্যক্ষমতা আছে তার যথাযথ প্রকাশের জন্য এক বিস্তৃত কর্মক্ষেত্র দরকার।

যাইহোক, মিঃ ও মিসেস মিকবারের মতভেদের ব্যাপারটা শান্তিপূর্ণভাবেই মিটে গেল। মিঃ মিকবার তাঁর হাতটা তাঁর স্ত্রীর দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বললেন, আমার ছেলেমেয়েরা যাতে বিদেশে গিয়ে কৃষিকার্য ও পশুপালনে আমাকে সাহায্য করতে পারে তার জন্য এখন থেকেই তাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

আমার পিসিমা বললেন, সেতো ভাল কথা।

এই সময় ট্র্যাড্‌লস্ এসে গেল আমাদের কাছে। টেবিলের উপর রাখা অনেক খাতা ও

কাগজপত্রের স্তূপের দিকে একবার চোখ মেলে তাকিয়ে মিকবার বললেন, আমার যা করে দেবার সব করে দিয়েছি। এবার আপনারা নিজেদের আলোচনা করুন। আমরা বাইরে যাচ্ছি।

এই বলে তিনি মিসেস মিকবারকে নিয়ে বাইরে চলে গেলেন। ট্র্যাড্‌লস্ একটা চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে আমাকে বলল, দেখ কপারফিল্ড, তুমি এখন শোকগ্রস্ত হলেও আমি তোমাকে কিছু কাজের কথা বলব, কারণ আমি জানি এতে তোমার আগ্রহ আছে এবং শোকাবেগের মধ্যে কেন্দ্রীভূত তোমার মনটাও একটা অবলম্বন পাবে।

আমি বললাম, না না, আমি ঠিক আছি। বিশেষ করে আমার পিসিমার জন্যই একথাটা আলোচনা করতে হবে।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, নিশ্চয়। সেটা তো বটেই।

আমি বললাম, গত একপক্ষকাল ধরে আমার পিসিমা কি দারুণ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছেন তা বলা যায় না। পরের উপকারের জন্য তিনি সারাদিন ধরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রায় দিনই বাড়ি ফিরতে তাঁর রাত হয়।

আমার পিসিমার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিল তাঁর গালের উপর। তিনি তা মুছে আমার হাতের উপর হাত রেখে বললেন, এখন কিছু না ট্রট, কিছু না। ক্রমে ক্রমে সব জানতে পারবে।

এরপর তিনি অ্যাগনিসকে ডেকে বললেন, এস বাছা অ্যাগনিস, এবার কাজের কথাটা আলোচনা করা যাক।

ট্র্যাড্‌লস্ এবার আলোচনা শুরু করল। বলল, প্রথমেই আমি মিঃ মিকবারের প্রতি সুবিচারের খাতিরে একটা কথা বলছি। মিঃ মিকবার যদিও জীবনে নিজের জন্য কিছুই করেননি, তথাপি তিনি যখন পরের কোন কাজ করেন তখন তিনি হয়ে ওঠেন শ্রান্তিহীন, ক্লান্তিহীন। তিনি যেভাবে দিনরাত কাগজ ও বইপত্রের মধ্যে ডুবে থেকে নীরবে কাজ করে গেছেন তা সত্যিই আশ্চর্যজনক। এমন লোক আমি কোথাও দেখিনি। তাছাড়া এর মাঝে আবার কত চিঠি লিখেছেন।

ট্রাড্‌লস্ আবার বলতে লাগল, মিঃ ডিকও অনেক কাজ করেছেন। তিনি ইউরিয়া হীপের উপর নজর রাখা ছাড়াও অক্লান্ত ভাবে মিঃ উইকফিল্ডের দেখা শোনা করে গেছেন। তাঁর কাজও আশ্চর্যজনক। তিনি অনেক চিঠি ও কাগজপত্রের নকল তৈরী করে আমাদের তদন্তের কাজে সাহায্য করেছেন। মিস উইকফিল্ডের অনুপস্থিতিতে মিঃ উইকফিল্ডের অসুখ প্রায় সেরে গেছে। তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

আমার পিসিমা বললেন, আমি আগেই বলেছিলাম, আমাদের ডিক কাজের লোক। বাইরে ওকে বোকা মনে হলেও ওর যথেষ্ট জ্ঞান-বুদ্ধি আছে। ট্রট, তুমি জান আমি কি বলতাম।

আমি বললাম, আমারও তাই মনে হয়েছিল।

ট্র্যাড্‌লস্ এবার অ্যাগনিসকে বলল, আপনার অনুপস্থিতিতে আপনার বাবার শরীরের অভাবনীয়ভাবে উন্নতি হয়েছে। এতদিন ধরে ক্রমাগত তাঁর উপর যে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছিল সেই চাপ থেকে এবং যে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মধ্যে এতদিন ছিলেন সেই আতঙ্ক হতে মুক্ত হয়ে তিনি বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এখন তিনি যেন হয়ে উঠেছেন সম্পূর্ণ এক অন্য মানুষ। এখন তিনি তাঁর স্মৃতিশক্তি ও ব্যবসার কাজে মন দেওয়ার ক্ষমতা ফিরে পেয়েছেন। তদন্তের ব্যাপারে

David Copperfield, by Charles Dickens (Published 1850) Bengali Translation

কয়েকটি কঠিন বিষয় আমাদের পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

তার বাবার শারীরিক মানসিক অবস্থার উন্নতির কথা শুনে খুশি হলো অ্যাগনিস। আমরাও সকলে আশ্বস্ত হলাম। ট্র্যাড্‌লস্ আবার বলতে লাগল, হিসাবপত্র পরীক্ষা করে দেখা গেল এই অবস্থায় মিঃ উইকফিল্ড যদি তাঁর কারবার গুটিয়ে ফেলেন তাহলে ফাণ্ডে উদ্বৃত্ত যেমন বেশী নেই তেমনি ঘাটতি বা দেয় দেনাও কিছু নেই।

অ্যাগনিস স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলে উঠল, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, উদ্বৃত্ত যা আছে তা তাঁর ভরণ পোষণের পক্ষে খুবই সামান্য। অবশ্য তিনি যদি তাঁর বাড়িটা বিক্রী করেন তাহলে কয়েকশো পাউণ্ড পেতে পারেন। তাতেও কিন্তু কিছু সমস্যা সম্পূর্ণ মিটবে না। এখন মিঃ উইকফিল্ড একেবারে স্বাধীন, সমস্ত প্রভাব হতে মুক্ত। এখন তিনি ঠিক করবেন, তিনি এস্টেটের এজেন্সী রাখবেন কি না। এ বিষয়ে বন্ধুরা তাঁকে পরামর্শ দেবেন।

অ্যাগনিস আমাকে বলল, আমি এটা আগেই ভেবে দেখেছি ট্রটউড। যে যাই বলুন, এজেন্সী আর কোনমতেই নেওয়া চলবে না।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, আমি এটা এমনিই বলেছি। তিনি নিজে যা ভাল বোঝেন তাই করবেন।

অ্যাগনিস বলল, প্রিয় বন্ধু ট্র্যাড্‌লস্, প্রিয় কপারফিল্ড, আমার বাবা সম্মানের সঙ্গে ভারমুক্ত হয়েছেন, এটাই আমার কাছে যথেষ্ট, আর কি চাই? তাঁকে যতসব দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ থেকে মুক্ত করে দেহ ও মনের দিক থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ করে তুলব, তারপর, তাঁর সেবায় আমি আত্মনিয়োগ করব—এটাই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে বড় আশা। তাঁর মুক্তির পর বা আমার মুক্তির পর আমার কাজ হবে ভবিষ্যতের সব ভার আমার নিজের মাথার উপর তুলে নেওয়া। আমি চাই তিনি সমস্ত দায়দায়িত্ব থেকে মুক্ত থাকুন। তাতেই আমার সুখ। আমি তখন সংসার চালানোর জন্য শত পরিশ্রম করেও সুখ পাব।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি সব ভেবে ঠিক করে ফেলেছ অ্যাগনিস?

অ্যাগনিস বলল, হ্যাঁ ট্রটউড, আমি অনেক ভেবেছি এ বিষয়ে। আমি কোন অবস্থাতেই ভীত নই। আমি আমার কাজে একদিন সফল হবই—এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। এখানে যাঁরা আজ আছেন তাঁরা আমাকে ভালভাবেই জানেন। তাঁরা আমাকে অনুগ্রহ করে থাকেন সেটা আমি জানি। বিশ্বাস কর, আমাদের চাহিদা খুব একটা বেশী নয়। যদি আমি আমাদের প্রিয় ও পুরাতন বাড়িটা ভাড়া দিই এবং একটা স্কুল চালাই তাহলে আমরা বেশ সুখে থাকব।

অ্যাগনিসের কণ্ঠস্বর শান্ত হলেও তার মধ্যে একটা দৃঢ়তা ছিল।

ট্র্যাড্‌লস্ এবার আমার পিসিমার দিকে তাকিয়ে বলল, এরপর মিস ট্রটউড, আপনার সম্পত্তির কথা। আপনার যে সম্পত্তি মিঃ উইকফিল্ডের ফার্মে গচ্ছিত ছিল তার কথা।

পিসিমা বললেন, আমি ধরে নিয়েছি সে সব গেছে, আর আমি তা সহ্য করে নিয়েছি। তবে তার কিছু যদি পাওয়া যায় তো খুশি হব।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, আমি দেখেছি এই সম্পত্তির পরিমাণ ছিল আট হাজার পাউণ্ড। তবে হিসাব পরীক্ষা করে দেখলাম, পাঁচ হাজারের বেশী পাওয়া যাচ্ছে না।

www.banglainternet.com

পিসিমা জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বলতে চাইছ পাঁচ হাজার পাউণ্ড?

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, হ্যাঁ, পাঁচ হাজার পাউণ্ড।

আমি অবশ্য এর থেকে নিজে তিন হাজার পাউণ্ড নিয়েছিলাম। এক হাজার পাউণ্ড ট্রটের আইন পড়ার জন্য স্পেনলো-জর্কিনস এর ফার্মে জমা দিয়েছিলাম। আর বাকি দুহাজার নিজে খরচ করেছিলাম। ভেবেছিলাম বাকি যা আছে তা অসময়ের জন্য রেখে দেব। পরে যখন মিঃ উইকফিল্ড একটি চিঠি দিয়ে আমাকে জানালেন, যে সব গেছে, তখন আমি একদিন তাঁর বাড়িতে গিয়ে তাঁর চিঠিখানি নিজের হাতে পুড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনি কিছু ভাববেন না। আমি সব সহ্য করব। কারণ আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এ হীপের শয়তানি। সে সব আত্মসাৎ করেছে। আর তার হাতে উইকফিল্ড অসহায়। কিন্তু সদাশয় উইকফিল্ড সব দোষ নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়ে বললেন, তিনিই দায়ী সব কিছুর জন্য।

অ্যাগনিস লজ্জায় তার মুখটা ঢেকে রইল। ট্র্যাড্‌লস্ বলল, একটা সুখবর দিচ্ছি, বাকি সব টাকা পাওয়া গেছে।

আমার পিসিমা আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেমন করে তা উদ্ধার করলে?

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, বদমাস শয়তানটা মিঃ উইকফিল্ডকে বোঝায় যে সব টাকা কোম্পানির দায় দায়িত্ব মেটাতে সব খরচ হয়ে গেছে। সে মিথ্যা করে একটা হিসাব সাজায়। মিঃ মিকবার অনেক পরিশ্রম করে কাগজপত্র তৈরি করে সেই সব হিসাব তুলে ধরেন। তাঁর চেষ্টাতেই এসব ধরা পড়েছে। পরে হীপকে চেপে ধরায় সে আমার কাছে সব স্বীকার করে। টাকাটা সে তখনো খরচ করেনি। বলল, কপারফিল্ডের ক্ষতি করার জন্য সে তা সব খরচ করে ফেলতে পারত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা করেনি। সে সেই সব টাকা আমার কাছে জমা দিয়ে বাড়ি থেকে তার মাকে নিয়ে একটা গাড়িতে করে লণ্ডন চলে গেছে।

পিসিমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলেন, তার কাছে টাকা আছে তো?

ট্রাড্‌লস্ বলল, কিছু টাকা নিশ্চয় আছে। সে যা করে হোক আগে থেকেই সঞ্চয় করে রেখেছিল।

পিসিমা বললেন, এবার মিকবারের কথাটা ভাব। বিবেচনা করে দেখ, তাকে কি দেওয়া যায়।

অবশেষে ঠিক করা হলো, মিকবার দম্পতি অস্ট্রেলিয়া যাচ্ছে ছেলেমেয়েদের নিয়ে। তাঁদের জাহাজভাড়া দেওয়া হবে। তাছাড়া তাঁদের আরও একশো পাউণ্ড দেওয়া হবে।

আমি বললাম, অষ্ট্রেলিয়ায় মিঃ পেগটি আছেন। মিঃ মিকবারকে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন। আমি মিঃ পেগটিকে লিখে দেব যে মিঃ মিকবারকে একশো পাউণ্ড দেবে, সেখানে কাজকর্ম শুরু করার জন্য। তাছাড়া তাঁরা মিলেমিশে থাকলে মিঃ পেগটি তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতে পারবে।

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, তবে একটা আশঙ্কার কথা আছে। হীপ বলেছে মিঃ মিকবারের উপর সে প্রতিশোধ নেবে। ও হয়ত পাওনা টাকার জন্য মামলা করবে তাঁর বিরুদ্ধে। তাঁকে জেলে নিয়ে যেতে পারে।

আমার পিসিমা বললেন, তার জন্য যা টাকা লাগবে তা আমার টাকা থেকে খরচ করবে।

David Copperfield, by Charles Dickens (Published 1850) Bengali Translation

তাকে ধরা হলেই ছাড়িয়ে আনবে।

ট্র্যাড্‌লস্ এরপর পিসিমাকে বলল, হীপ আপনার স্বামীকেও আপনার পিছনে টাকার জন্য লেলিয়ে দেবে।

পিসিমা বললেন, হ্যাঁ তা দিতে পারে। সেটা আমি দেখব।

এরপর ঠিক হলো, আজকের দিনটা আমরা মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতেই থাকব। পরদিন লণ্ডনে গিয়ে সব ব্যবস্থা করব।

হীপরা বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় সেদিনটা আমরা শান্তিতেই কাটালাম। আমি ছাত্র অবস্থায় যে ঘরে থাকতাম সেই ঘরেই রাত্রিতে শুলাম। পিসিমা অ্যাগনিসের কাছে রইলেন।

পরদিন অ্যাগনিসও আমাদের সঙ্গে লণ্ডনে গেল। আমরা সোজা পিসিমার বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। এর পর পিসিমা আমাকে গাড়িতে করে সোজা একটা হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে আমরা জানলাম, পিসিমার স্বামী মারা গেছে।

সেখান থেকে আমরা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করতে গেলাম। মৃত স্বামীর কফিনটা দেখে পিসিমার চোখে জল এল। তিনি বললেন,আজ থেকে ছত্রিশ বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। ওর চেহারা তখন বেশ সুন্দর ছিল। লোকটার স্বভাবও ভাল ছিল। পরে ও মদ খেতে শুরু করে। স্বভাবটাও খারাপ হয়ে যায়। আমি রাগ করে ওকে ছেড়ে চলে যাই। ও তখন বেপরোয়া হয়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ও আমার কাছে টাকা চাইতে যেত। আমি বিরক্তির সঙ্গে কিছু কিছু টাকা দিতাম। শেষবার যখন ও আমার কাছে যায় তখন কিছু ওকে দিয়ে বলি, আর তুমি এস না। আমার অবস্থা এখন খারাপ হয়ে গেছে। কিছুদিন ধরেই ও ভুগছিল। এবার সব শেষ। ও আর কোনদিন আমায় জ্বালাতন করতে আসবে না।

হীপ সত্যিই মিঃ মিকবারকে দুটি ঋণের মামলায় জড়িয়ে ফেলে। দুটি মামলাতেই তাঁর জেল হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাড্‌লস্ ঋণের টাকা মিটিয়ে দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনে। অবশেষে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত হন মিঃ মিকবার।

পিসিমা একবার ট্র্যাড্‌লস্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন, হীপ এখন কি করবে মনে হয়?

ট্র্যাড্‌লস্ বলল, ও যেখানেই থাক, যেভাবেই জীবিকার্জন করুক, ও শঠতা ও প্রবঞ্চনা করবেই। ওর স্বভাবটাই এমন। ও বড় কুটিল এবং শয়তান প্রকৃতির। ও কাউকেই বিশ্বাস করে না। বড় স্বার্থপর আর সন্দেহপ্রবণ। যাকে ও একদিন বন্ধু ভাবে গ্রহণ করবে, পরে নিজের স্বার্থের বশে তাকে ফাঁদে ফেলে তার সঙ্গেই শয়তানি করবে।

৩৯

আমি এবার বিদেশে যাওয়ার সব ঠিক করে ফেললাম। ঠিক হলো মিঃ মিকবারেরা যেদিন যাত্রা করবেন সেইদিন আমিও অন্য জাহাজে করে বিদেশ যাব। মিঃ পেগটি এমিলিকে নিয়ে তখন লণ্ডনে এসেছিল। তারাও একই দিনে অস্ট্রেলিয়া যাবে মিকবারদের সঙ্গে।

আমাদের বিদায় দেবার জন্য আমার ধাত্রী পেগটি লণ্ডনে এসেছিল ইয়ারমাউথ থেকে।

www.banglainternet.com

আমি বিদেশ যাব বলে লণ্ডনে আমার ও পিসিমার ভাড়া করা বাড়ি দুটি ছেড়ে দিয়েছি। আমরা তখন দিনকতকের জন্য কোভেণ্ট গার্ডেনে একটা অস্থায়ী বাড়ি ভাড়া করে আছি। আমি বিদেশ চলে গেলে পিসিমা তাঁর ডোভারের বাড়িতে চলে যাবেন। এবং সেখানেই থাকবেন। সেদিন সন্ধ্যাবেলায় আমি পেগটি ও তার ভাই মিঃ পেগটির সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেখানে এমিলি ছিল না। পেগটি কথাপ্রসঙ্গে হ্যামের কথা তুলল। সে বলল, হ্যাম এখন তাকে ছেড়ে একা একাই থাকে। নীরবে তার কাজ করে যায়। সে এখন এমিলিকে না পাওয়ার দুঃখটা অনেকখানি সহ্য করে নিয়েছে।

আলোচনার পর আমি বাসায় ফেরার সময় হ্যামকে আমি আগে যে কথা দিয়েছিলাম সেকথাটা মনে পড়ল। আমি ঠিক করলাম আমি হ্যামের কথা জানিয়ে একটা চিঠি লিখব। মিঃ পেগটিদের জাহাজ ছাড়ার সময় সেই চিঠিটা আমি মিঃ পেগটির হাতে দেব। তাহলে এমিলি নিশ্চয় আমার কাছে তার উত্তর পাঠিয়ে তার কথা জানিয়ে দেবে। তার প্রত্যাখ্যাত প্রেমিক হ্যাম আমার মাধ্যমে সেকথা জানতে পারবে।

কিন্তু পরে ভাবলাম চিঠিটা আজ রাত্রে লিখে কাল সকালেই এমিলির কাকার হাতে দেব। তাহলে এমিলি তার উত্তর বিদেশযাত্রার আগেই দিতে পারবে।

এই ভেবে আমি সেদিন রাত্রিতে শোয়ার আগেই চিঠিটা লিখলাম। হ্যাম যা যা বলেছিল তার কিছুই না বাড়িয়ে যথাযথভাবে এমিলিকে লিখলাম। তারপর চিঠিটা সেই রাতেই পাঠিয়ে দিলাম। সারারাত আমার ঘুম হলো না। আমি ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম। তাই উঠতে অনেক বেলা হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আমি যখন বিছানায় শুয়েছিলাম তখন আমার পিসিমা আমার বিছানার পাশে এসে ডাকলেন। আমি চোখ মেলে তাকালাম। তিনি বললেন, ট্রট, আমি তোমার ঘুম ভাঙ্গাতে চাইনি। কিন্তু মিঃ পেগটি এসে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। তাকে কি আসতে বলব?

আমি বললাম, হ্যাঁ, তাকে আসতে বল।

মিঃ পেগটি তৎক্ষণাৎ আমার ঘরে এসে বসল। বলল, মাস্টার ডেভি, আমি এমিলিকে চিঠিটা দিয়েছিলাম। সে তার উত্তরে এই চিঠিটা লিখে আমার হাতে দিয়েছে। এটা পড়ে দেখ।

আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি পড়েছ?

সে দুঃখের সঙ্গে বলল, না।

আমি এমিলির চিঠিখানা পড়লাম। সে লিখেছে, আমি তোমার চিঠি পেয়েছি। আমার প্রতি তোমার দয়ার জন্য ধন্যবাদ।

আমি তোমার কথাগুলো অন্তর দিয়ে গ্রহণ করেছি। যতদিন বাঁচব কথাগুলো আমার বুকের মধ্যে রেখে দেব। কথাগুলো যদিও কাঁটার মত আমার বুকে বিঁধবে তবু তা আমার বুকে সান্ত্বনার এক অফুরন্ত উৎস হয়ে থাকবে। হে আমার প্রিয় বন্ধু, চিরদিনের জন্য বিদায়। এ জগতে আর আমাদের দেখা হবে না। মৃত্যুর পর পরলোকে গিয়ে যেন আমি ক্ষমা পাই। পরজন্মে আমি যেন তোমার কাছে ফিরে আসতে পারি। বিদায়, চিরদিনের জন্য বিদায়।

মিঃ পেগটি আমাকে বলল, এই চিঠিটা হ্যামের কাছে তোমাকেই পাঠিয়ে দিতে হবে

মাস্টার ডেভি।

আমি বললাম, এখনো সময় আছে, আমি নিজে ইয়ারমাউথে গিয়ে হ্যামকে নিয়ে আসব।

মিঃ পেগটি বলল, সেটা কি সম্ভব হবে?

আমি বললাম, আমি আজ রাতেই চলে যাব। কাল ফিরে আসব।

পেগটি তখন তাতে খুশি হয়ে সম্মতি দিল। সে কোচ অফিসে গিয়ে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করে এল।

আমি সেদিন বিকেলেই সেই গাড়িতে করে রওনা হয়ে পড়লাম। আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ ছিল। গাড়িচালক বলল, আজ ঝড় হবে। আকাশের অবস্থা খারাপ। এখন কিছু বুঝতে পারবেন না।

ঠিক তাই হলো। সন্ধ্যার সময় গোটা আকাশটা কালো মেঘে ঢেকে গেল। ঝড় উঠল। ক্রমশ সে ঝড় বাড়তে লাগল। ঝড়ের বেগ এত বেশী যে গাড়ি এগোতেই পারছিল না।

যাই হোক, সন্ধ্যার পর কোনরকমে আমি ইয়ারমাউথে পৌছালাম। তখন ঝড়ের সঙ্গে জোর বৃষ্টি শুরু হয়েছে। এসময় হ্যামের কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। আমি বাজারের কাছে একটা হোটেলের একটা ঘরে থাকার ব্যবস্থা করলাম। ঝড় জলে রাস্তায় কোন লোক নেই। হোটেলে খেতে গিয়ে কিছু খেতে পারলাম না। শুধু এক গ্লাস মদ পান করলাম। ঝড় বৃষ্টি যতই বাড়তে লাগল ততই আমার উদ্বেগও বাড়তে লাগল। হ্যামের কাছে চিঠিটা দেবার জন্য মনটা আমার ছটফট করছিল। শুতে গিয়েও ঘুমোতে পারলাম না। কেমন মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোর আসছিল।

ভোরের দিকে হোটেলের একজন ভৃত্য আমায় জাগিয়ে খবর দিল সমুদ্রে একটা জাহাজ ভেঙ্গে গেছে। জাহাজটা ভেঙ্গে কূলের কাছে এসে পড়েছে। যাত্রীরা আর্তনাদ করছে। অনেকে উদ্ধার করতে ছুটে যাচ্ছে। আমি সঙ্গে সঙ্গে হোটেল থেকে বেরিয়ে ছুটতে লাগলাম। তখন ঝড়ের বেগটা একটু কমলেও থামেনি। আমি গিয়ে দেখলাম ছত্রিশ জন যাত্রী জলে ডুবে মারা গেছে। কিছু যাত্রীকে উদ্ধার করে তুলে আনা হয়েছে। তাদের অনেকেই আহত ও অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছে। অনেক যুবক উদ্ধারকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্র থেকে পাহাড় প্রমাণ ঢেউগুলো মাঝে মাঝে কূলে এসে আছাড় খেয়ে পড়ছিল।

সহসা এক জায়গায় চোখ পড়তেই দেখলাম উদ্ধারকারীদের মধ্যে হ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমি তার কাছে ভীড় ঠেলে যাবার আগেই একটা ঢেউ এসে তাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল। পাহাড়ের মত ঢেউটার মাথায় উঠে গেল হ্যাম। পরক্ষণেই আবার নীচে পড়ে গেল। তারপর ঢেউটা তার অসাড় দেহটাকে আছড়ে কূলের উপর ফেলে দিয়ে গেল। আমি এগিয়ে গিয়ে দেখলাম জোর আঘাতে তার মুখ ফেটে গেছে। তার মুখ থেকে রক্ত ঝরছে। তার দেহ একেবারে নিষ্পন্দ। ব্যথাহত প্রেমিকের সব ব্যথা বেদনা সঙ্গে নিয়ে তার প্রাণ বেরিয়ে গেছে চিরদিনের মত, তার নিঃসাড় দেহটাকে ফেলে রেখে। আমি এক নিবিড় হতাশায় ভেঙ্গে পড়লাম। মৃত্যুর আগে আমি যদি হ্যামকে এমিলির কথাগুলো শোনাতে পারতাম তাহলে অন্ততঃ সে তার এতদিনের ব্যথা বেদনা সব ঝেড়ে ফেলে শান্তিতে মরতে পারত। হয়ত সে এমন করে নিজেকে

একরকম ইচ্ছা করেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিত না।

হতাশা আর ব্যর্থতায় অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম আমি। হ্যামের অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর আঘাতটা সামলে ওঠার আগে একটা লোক আমায় এক জায়গায় ডেকে নিয়ে গেল। লোকটা আমাকে চিনত।

আমি কূলের উপর এক জায়গায় গিয়ে দেখলাম স্টীয়ারফোর্থ উপুড় হয়ে হাতদুটো মুড়ে শুয়ে আছে। অতীতে স্কুলবোর্ডিং-এ আমার ঘরে ও যেমন করে শুত—ঠিক সেইভাবে। লোকটি বলল, জাহাজগুলির মধ্যে ও হয়ত ছিল অথবা কোন নৌকায় ছিল তা ঠিক বলা যায় না। তবে ঢেউ ওর লাশটাকে তুলে ফেলে দিয়ে গেছে।

স্টীয়ারফোর্থের মৃত্যুতে আরও জোর আঘাত পেলাম আমি। ইদানীং তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক না থাকলেও আমার স্কুলজীবন থেকে তাকে আমি ভালবাসতাম। সে ভালবাসার কথা আমি কোনদিন ভুলতে পারব না।

আবার এক নতুন দায়িত্বভার আমার কাঁধের উপর আপনা থেকে এসে চেপে বসল। আমি তখনি হাইগেটে তার মাকে খবর দিতে গেলাম। আমি বাড়িতে গিয়ে কড়া নাড়তেই বাড়ির ঝি এসে আমার সামনে দাঁড়াতেই আমি স্টীয়ারফোর্থের মাকে পাঠিয়ে দিতে বললাম। ঝি চলে গেল। কিছুক্ষণ পর এসে জানাল, তিনি খুবই অসুস্থ, দিনরাত ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকেন, নীচে নামতে পারবেন না। আপনাকে তাঁর কাছে যেতে বললেন।

আমি উপরতলায় বসার ঘরে গিয়ে বসতেই মিস রোজা ডার্টল মিসেস স্টীয়ারফোর্থকে ধরে ধরে নিয়ে এল সে ঘরে। আমি স্টীয়ারফোর্থের মৃত্যুর খবরটা দিয়ে বললাম, গতকাল রাত্রে আমি ইয়ারমাউথ গিয়েছিলাম। ভোরে জাহাজডুবির খবর পেয়ে কূলে গিয়ে ওর মৃতদেহটা দেখতে পাই। ও সেই ভাঙ্গা জাহাজে ছিল না কি কোন নৌকায় ছিল তা জানি না। গতকাল রাতে যে ভীষণ ঝড় হয় তার ফলেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

মৃত্যুসংবাদটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রোজা ডার্টল কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে তার বুকে করাঘাত করতে লাগল। সে বারবার মিসেস স্টিয়ারফোর্থের উপর দোষারোপ করে বলতে লাগল, তোমার জন্য এমন হলো। তোমার অহঙ্কার, তোমার আভিজাত্যই তাকে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে।

মিসেস স্টীয়ারফোর্থ শুধু শোকে অস্ফুট আর্তনাদ করতে লাগলেন। কোন কথা বললেন না।

রোজা ডার্টল বলল, সে তোমার ছেলে হলেও আমি তোমার থেকে তাকে আরও অনেক বেশী ভালবাসতাম। তার সমস্ত ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আমি তাকে বিয়ে করতে পারতাম। আমাদের বিয়ে হলে তাকে নিয়ে আমি সুখী হতে পারতাম। তাকে ঠিক ভাল করে সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারতাম।

আমি তখন রোজাকে বললাম, এই বৃদ্ধাকে সান্ত্বনা না দিয়ে বারবার আঘাত দিচ্ছেন কেন? মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দেওয়ার কোন অর্থ হয়? স্টীয়ারফোর্থ আমার বন্ধু ছিল। সে ছিল বেপরোয়া, দুঃসাহসী। তাকে আমি ফেরাবার অনেক চেষ্টা করেছি। সে কোন কথাই শুনত না।

আপন খেয়াল খুশির স্রোতে ভেসে চলত। সে নিজের অকালমৃত্যু নিজে ডেকে এনেছে। এর জন্য তার মা বা অন্য কেউ দায়ী নয়।

রোজা ডার্টল আমাকে বলল, তুমি হচ্ছ দুঃসংবাদের এক দূত। এই সব কিছুর মূলে আছ তুমি। তোমার থেকেই সূত্রপাত। তুমি যাও।

আমি তখনি আবার ইয়ারমাউথে গিয়ে স্টীয়ারফোর্থের লাশটাকে তাদের বাড়িতে তার মার কাছে রেখে আবার লণ্ডনে ফিরে গেলাম। তখন দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

৪০

আমি লণ্ডনে ফিরে এসে দেখলাম ওদের বিদেশযাত্রার সব প্রস্তুতিপর্ব সমাপ্ত। সেদিন আমার পিসিমাকে নিয়ে মিঃ মিকবারদের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম, সেখানে আমার ধাত্রী পেগটি তার ভাই মিঃ পেগটি, ট্র্যাড্‌লস্ সকলেই আছে। মিঃ মিকবারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সবই কেনা হয়েছে। আগামীকাল সকাল সাতটায় ওরা জাহাজে চাপবেন। ওদের যাত্রার একদিন দুদিন পর আমি বিদেশযাত্রা করব।

আমি মিঃ মিকবারকে একান্তে ডেকে হ্যামের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদটা জানিয়ে মিঃ পেগটিকে কিভাবে বলা যায় তা নিয়ে যুক্তি করলাম। পরে ঠিক হলো ওরা জাহাজে উঠলে বিদায় নেবার সময় কথাটা বলা হবে।

সেদিন মিসেস মিকবার খুব আশা করেছিলেন, ওঁর বাপের বাড়ির কোন লোক হয়ত বিদেশ যাত্রার আগে দেখা করতে আসবে অথবা তাদের পাওনা টাকার জন্য মিঃ মিকবারকে তাগাদা করতে আসবে। কিন্তু এল না। এক সময় হীপ টাকার জন্য মিকবারের বিরুদ্ধে আবার একটা মামলা করায় কোর্ট থেকে লোক এসে মিঃ মিকবারকে গ্রেপ্তার করতে এল। মিঃ মিকবার হতাশায় ভেঙ্গে পড়লেন একেবারে। বললেন, অন্য কোন আশা নেই, আমার সব আশা সব স্বপ্ন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে গেল। এ জীবন আর আমি রাখব না।

আমি সঙ্গে সঙ্গে পাওনা টাকা মিটিয়ে দিয়ে মিঃ মিকবারকে মুক্ত করলাম। মিঃ মিকবার খুশি হয়ে তাঁর নোটবুকে টাকার অঙ্কটা লিখে রাখলেন।

পরদিন আমি যথাসময়ে আমার পিসিমা ও ধাত্রী পেগটিকে নিয়ে মিঃ মিকবার ও মিঃ পেগটিকে বিদায় দেবার জন্য জাহাজে গেলাম। গিয়ে দেখলাম মিকবার দম্পতি তাঁদের ছেলেমেয়েদের নিয়ে জাহাজে উঠেছেন। মিঃ পেগটির সঙ্গে আছে মিসেস গামিজ ও এমিলি। মিসেস গামিজ মালপত্র গুছিয়ে রাখছে। এমিলি চুপ করে বসে আছে। দেখলাম মার্থাকেও সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে মিঃ পেগটি। আমি খুশি হয়ে বললাম, খুব ভাল করছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।

মার্থা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। এমিলির ব্যাপারে সত্যিই খুব উপকার করেছে। ওর বুদ্ধি ও চেষ্টাতেই এমিলিকে জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

জাহাজ ছাড়তে আর বেশী সময় বাকি নেই। মিঃ পেগটি আমাকে বলল, আর কোন খবর নেই তো মাস্টার ডেভি?

আমি বললাম, একটা কথা !

এই বলে আমি আর দেরি না করে সেই কঠিন কথাটা বলে ফেললাম। হ্যামের এই আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত মৃত্যুসংবাদে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মিঃ পেগটি। সে হ্যামকে ছোট থেকে মানুষ করেছে। তাকে এতটা বড় করে তুলেছে। সেই হ্যাম অকালে তাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেল। সংযমের সব বাঁধ ভেঙ্গে বুকের ভিতর থেকে একটা অবুঝ কান্নার উদার ঢেউ তার দুটো চোখের উপর এসে ফেটে পড়ল। তার কণ্ঠকে অবরুদ্ধ করে ফেলল একেবারে। কোন কথা বলতে পারল না পেগটি।

কথাটা শুনে হ্যামের পিসী পেগটিও কাঁদতে লাগল। এমিলি সেখানেই নিথর নিশ্চুপ হয়ে বসে বসে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগল। তার শেষ কথাটা আমি হ্যামকে জানাতে পারলাম না।

আমি নীরবে করমর্দন করলাম মিঃ পেগটির সঙ্গে। এই সরল প্রকৃতির মহানুভব মানুষটিকে আমি জগতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সম্মান করি। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা-সহানুভূতির অন্ত নেই। আমি মুখে কোন সান্ত্বনার কথা না বলতে পারলেও আমার সব সান্ত্বনা ও সমবেদনার নীরব নিরুচ্চার ভাষাগুলি যেন করমর্দনের সঙ্গে আমার হাতের স্পর্শের মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম।

অবশেষে জাহাজ ছেড়ে দিল।

আমি পেগটি ও পিসিমাকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

৪১

আমার জীবনের প্রথম প্রেমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং আমার বালিকাবধূ ডোরার মৃত্যু আমাকে যে আঘাত দিয়েছে, আমার অন্তরে যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে, তার গুরুত্বটা আমি এতদিন ঠিক বুঝতে পারিনি। অত্যধিক কর্মব্যস্ততার আলোড়নে সব যেন উল্টে পাল্টে গেছে। নির্জনে বসে তার কথা ভাবব, তার শোকটা ভাবব এবং অনুভব করব তারও সময় পাইনি। শুধু সেই শোকের আবেগটা আমার সব কাজের ব্যস্ততার মধ্যে এক ঘন কালো মেঘচ্ছায়ার মত আমার মনটাকে ঢেকে রেখেছে। আমার জীবনের সব আনন্দ ও উচ্ছ্বাসকে স্তব্ধ করে দিয়েছে।

ডোরার শোকের আঘাতটা মিলিয়ে যেতে না যেতেই আবার হ্যামের মৃত্যু। মৃত্যু নয়, এক আশ্লাহত প্রেমাহত প্রেমিকের যেন আত্মহনন। হ্যামকে আমি ভালবাসতাম সুদূর শৈশব থেকে। সে আমায় শ্রদ্ধা করত। আমি আমার শৈশবে পেগটির সঙ্গে যেদিন তাদের ইয়ারমাউথের বোট হাউসে যাই সেদিন থেকে তার সঙ্গে আমার পরিচয় আর ভালবাসা। কাজেই হ্যামের মৃত্যুর আঘাতটাও কিছু কম নয় আমার জীবনে। এর উপর স্টীয়ারফোর্থের মৃত্যুর আঘাত। বর্তমানে কোন সম্পর্ক না থাকলেও স্কুল জীবন থেকে তার প্রতি দীর্ঘদিনের ভালবাসা আমি ভুলতে পারিনি। সুতরাং তার মৃত্যুতেও আমি কম মর্মাহত হইনি। এই তিনটি মানসিক আঘাতের গুরুত্ব আমি ঠিকমত উপলব্ধি করতে পারলাম আমার সমুদ্রযাত্রার সময়। বিদেশযাত্রার জন্য আমি জাহাজে উঠে এবং জাহাজ সমুদ্রের উপর চলতে শুরু করলে আমি আমার অন্তহীন নিঃসঙ্গ

অবকাশে এই দুটো মৃত্যুজনিত আঘাতের ভয়ঙ্কর চেহারাদুটো খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। এক এক সময় মনে হতে লাগল আমার জীবনে আর কোন প্রয়োজন নেই। দেশে ফিরে কোন লাভ নেই।

আমি প্রথমে ইটালিতে গিয়ে উঠলাম। আমি আল্পস পর্বত দেখলাম। আমি পথপ্রদর্শকের সাহায্য নিয়ে কত গিরিপথ ও উপত্যকায় ঘুরে বেড়ালাম।

ইটালি থেকে এখন সুইজারল্যাণ্ডে। পাহাড় ও সমুদ্রের মাঝখানে কত রমণীয় প্রাকৃতির দৃশ্য দেখলাম। কিন্তু সে সৌন্দর্য থেকে কোন অনাবিল আনন্দ লাভ করতে পারলাম না। আমি যেখানেই যেতে লাগলাম এক বিষাদের দুরন্ত মেঘচ্ছায়া আমাকে যেন তাড়া করে বেড়াতে লাগল। শূন্য থেকে এক দৃষ্টিতে যেন আমার গতিপথ লক্ষ্য করতে লাগল!

আমি সুইজারল্যাণ্ডে থাকাকালে অ্যাগনিসের একখানা চিঠি পেলাম। সঙ্গে সঙ্গে খামটা খুলে পড়তে লাগলাম। চিঠি পড়ে দেখলাম অ্যাগনিস এখন ভালই আছে। সুখে আছে। উন্নতি করার চেষ্টা করছে।

অ্যাগনিস তার চিঠিতে আমাকে শুধু শোকের সান্ত্বনা দেয়। সে আমাকে প্রচুর আত্মশক্তি দান করেছে। সে লিখেছে তুমি এরই মধ্যে যে নামযশ করেছ তাতে আমি গর্বিত। আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। আমি চাই তোমার শোকের মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকবে না। থাকবে শক্তি। শোক-দুঃখের কাছে নতি স্বীকার না করে তুমি আরও পরিশ্রম করবে। তোমাকে আরও বড় হতে হবে। একবার ভেবে দেখ তো তোমার সুদূর শৈশবে কত শোক, কত দুঃখ, কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে। তোমার সেই অসাধারণ সহিষ্ণুতা আজ কোথায়? তোমাকে সব সহ্য করে উঠে দাঁড়াতে হবে। এগিয়ে চলতে হবে। আরও ভাল করে লিখত হবে। সারা দেশের মধ্যে এক বিখ্যাত লেখক হতে হবে তোমায়।

চিঠিটা একবার পড়ে মন ভরল না আমার। আমি বার বার সেটা পড়লাম।

তখন শেষ বিকালের সোনার আলো ছড়িয়ে পড়েছিল উপত্যকার সাদা বরফরাশির উপর। একটু পরেই সেই সোনার মতন আলোর পরে হিমেল রাত্রির কালো ছায়া নেমে আসবে সারা উপত্যকাভূমির উপর।

চিঠিটা যতক্ষণ আমি পড়ছিলাম ততক্ষণ মনে হচ্ছিল অ্যাগনিস যেন আমার কাছে ছিল। তার কণ্ঠস্বর যেন আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু চিঠিটা পড়া শেষ হতেই আবার কেমন যেন অসহায় বোধ করছিলাম আমি। আবার সেই নিঃসঙ্গতার বেদনা। তখন আমি বুঝতে পারলাম এখন বিদেশে থেকে কিছু লাভ হবে না। প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করেও আমার ঠিক মত শান্তি হবে না। এখন আমার অ্যাগনিসের সাহায্য দরকার। একমাত্র সে-ই পারে সব শোকদুঃখ আমার মন থেকে মুছে দিয়ে আমাকে আবার আত্মশক্তির শক্ত জমির উপর দাঁড় করাতে।

তবু অ্যাগনিসের কথামত আবার আমি কাজে মন দিলাম।

আমি আমার হোটেলের ঘরে সকালে এবং সন্ধ্যা থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত লেখার কাজ করতে লাগলাম। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করে একটা গল্প লিখলাম। গল্পটা

লিখেই ট্র্যাড্‌লস্-এর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ট্র্যাড্‌লস্ প্রকাশের ব্যবস্থা করল। তাতে আমার নামযশ বেড়ে গেল।

সুইজারল্যাণ্ডে আমার তিনমাস কেটে গেল। আমি আরও কিছুদিন সেখানে কাটাতে চাইলাম। শীতকালটা জেনেভায় কাটিয়ে বসন্তে আবার সেই উপত্যকায় ফিরে এলাম। সেখানে কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছিল। তারা অবশ্য ইংরাজি ভাষায় কথা বলত না।

ইংল্যাণ্ড থেকে মাঝে মাঝে যে সব ভ্রমণকারী সুইজারল্যাণ্ডে আসত তাদের সঙ্গে আমার দৈবাৎ দেখা হলে তাদের মুখে আমার নামযশের কথা শুনতে পেতাম। আমি তখন উৎসাহিত হয়ে আমার তৃতীয় উপন্যাস রচনার কাজে মন দিলাম।

এখানে আসার আগে ইংল্যাণ্ডে থাকা কালে নানা কাজকর্ম, পড়াশুনো, লেখালেখি এবং কতকগুলি অস্বস্তিকর ও শোকাবহ ঘটনায় আমার শরীর ভেঙ্গে গিয়েছিল।

সুইজারল্যাণ্ডে আসার পর থেকে আমার স্বাস্থ্যের উন্নতি হতে থাকে। পরে কয়েকটি জায়গা ঘুরে আমার জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাও বাড়ে।

কিন্তু কাজের ফাঁকে ফাঁকে অ্যাগনিসের কথাটা মনে পড়ত আমার। অ্যাগনিসের ভগিনীসুলভ ভালবাসা, পরামর্শ ও অনুপ্রেরণার অভাব আমি অনুভব করতাম।

এই সময় কেবলি আমার মনে হত অ্যাগনিস কি আমায় ভালবাসে? তাহলে সে কিভাবে আমাকে ভালবাসে এবং সে ভালবাসার প্রকৃতিটি কি? বাল্যকালে ও কৈশোরে আমি তার সঙ্গে এক বাড়িতে থাকলেও আমি তখন এই ভালবাসার কথা ভাবিনি। সে স্নেহ করেছে, আমি তাকে শ্রদ্ধা করেছি। সব বিষয়ে তার পরামর্শ গ্রহণ করেছি। কিন্তু তাকে ভালবাসা বা বিয়ে করার কথা ভাবিনি। কারণ আমি জানতাম আমাদের স্বভাব সম্পূর্ণ আলাদা। আমার কল্পনাপ্রবণ, আবেগপ্রবণ উদ্দাম মন অ্যাগনিসের সতত আত্মস্থ, ধীরস্থির ও বুদ্ধিদীপ্ত মনের উন্নতস্তরে কোনদিন উঠতে পারবে না। আমার ধূলিমলিন মর্ত্যজীবনের যে কোন সমস্যার অন্ধকারে তাকে এক উজ্জ্বল দেবদূতের মত মনে হত। মনে হত সে তার দুটি দিব্য পাখার ঝাপটা দিয়ে এক স্নিগ্ধ শীতল সুবাস ছড়িয়ে আমার মনের সব জ্বালা জুড়িয়ে দিচ্ছে।

অ্যাগনিস সম্বন্ধে আর একটা কথা মনে হত আমার। অ্যাগনিসকে আমি শ্রদ্ধার চোখে দেখতাম এবং তার প্রতি আমার এই শ্রদ্ধার উপর তার গভীর আস্থা ছিল। তাকে ভালবাসা বা বিয়ের কথা বলতে গেলে হয়ত আমার উপর তার সে আস্থা ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে। আমি হয়ত ছোট হয়ে যাব তার কাছে।

যাই হোক, আমি এবার দেশে ফেরার মনস্থ করলাম।

দীর্ঘ তিন বছর পর আমি দেশে ফিরছি। একসঙ্গে সময়টা দীর্ঘ মনে হচ্ছে, কিন্তু এ সময় যখন খণ্ড খণ্ডভাবে কেটে যায় তখন বুঝতেই পারিনি। সারা জগতের মধ্যে এখন আমার বাড়ি আর অ্যাগনিস দুটোই প্রিয় আমার কাছে।—যদিও অ্যাগনিস আমার নয়, কোনদিন হয়ত তা হওয়া সম্ভব হবে না। হয়ত সে আমার হতে পারত, কিন্তু সে সব অতীতের কথা। অতীতে আমি সে বিষয় কোন চেষ্টাই করিনি। আমি আমার মনের মধ্যে নিজের হাতেই এক অনন্ত ব্যবধান সৃষ্টি করে তাকে দেবদূত বানিয়ে অনেক উর্ধ্বে তুলে রেখেছি।

৪২

হেমন্তের এক হিমেল সন্ধ্যায় আমি লণ্ডনে এসে নামলাম। আমি আমার নির্ধারিত সময়ের আগেই চলে এসেছি। তাই কেউ স্টেশনে আসেনি। আমি একাই একটা গাড়িতে চড়ে প্রথম গ্রেজ ইন হোটেলে গিয়ে থাকার ব্যবস্থা করলাম। ভাবলাম, দুদিন এখানে বিশ্রাম করে ডোভারে পিসিমার কাছে যাব। এখন প্রথমেই আমার অন্তরঙ্গ একমাত্র বন্ধু ট্র্যাড্‌লস্‌-এর সঙ্গে দেখা করতে হবে।

হোটেলে মালপত্র রেখেই আমি ট্র্যাড্‌লস্‌ এর খোঁজে বেরিয়ে পড়লাম। তার বাসাটা খুঁজে বার করে দরজায় কড়া নাড়তে একটি বালকভৃত্য এসে দরজা খুলে দিল। আমি ট্র্যাড্‌লস্‌ ভিতরে আছে কিনা জিজ্ঞাসা করতে সে বলল, আছে। কিন্তু এখন ব্যস্ত। তবু আমি আমার নাম বলতে সে গিয়ে খবর দিয়ে আমাকে বসার ঘরে নিয়ে গেল। ট্র্যাড্‌লস্‌ তার ঘরে থেকে এসে আমাকে দেখেই অবাক হয়ে করমর্দন করল। সে উল্লাসে ফেটে পড়ল। আমিও আনন্দের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

ভিতরের ঘরে তার স্ত্রী সোফি তার বোনদের সঙ্গে গল্প করছিল। ট্র্যাড্‌লস্‌ বলল, আমার শেষ চিঠিটা পাওনি?

আমি বললাম, কই না তো।

ট্র্যাড্‌লস্‌ বলল, সেই চিঠিতেই আমার বিয়ের অনুষ্ঠানের কথাটা লেখা ছিল। সোফির সঙ্গে আমার বিয়েটা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়।

এরপর ট্র্যাড্‌লস্‌ ঘরের ভিতর গিয়ে সোফিকে নিয়ে এল। সোফির সঙ্গেও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বললাম।

আমি ট্র্যাড্‌লস্‌ এর আইন ব্যবসা সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন ছিলাম। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার কাজকর্ম কিরকম চলছে?

ট্র্যাড্‌লস্‌ বলল, মোটামুটি চলছে। তোমার তো এখন লেখক হিসাবে বেশ নামডাক হয়েছে। দিনে দিনে তোমার প্রতিষ্ঠা বেড়ে যাচ্ছে। আমরা এজন্য খুবই গর্বিত।

আমি বললাম, এখনো পর্যন্ত তেমন কিছুই করে উঠতে পারিনি ভাই। এখন আমাকে প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে।

ট্র্যাড্‌লস্‌ আমাকে তার বাসাতেই সেই রাতটার মত থেকে যেতে বলল। কিন্তু আমি তাকে বললাম, তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না ট্রাড্‌লস্‌। আমি গ্রেজইন হোটেলে ঘর নিয়েছি। সেখানেই উঠেছি।

আমি একে একে সকলের খবর নিলাম ট্র্যাড্‌লস্‌ এর কাছ থেকে। সে যা যা জানত তা সব জানাল।

অবশেষে তার কাছে বিদায় নিয়ে আমি হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন সকালে কফি হাউসে ব্লান্ডারস্টোনের ডাক্তার চিলিপের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার

জন্মের সময় উনিই আমার মার চিকিৎসা করেছিলেন। তাঁকে দেখে আমার সুদূর শৈশবের কথা মনে পড়ে গেল। আমার মার প্রসবের কথা শুনে আমার পিসিমা মিস বেটসি ট্রটউড আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন কন্যা সন্তান আশা করে। কিন্তু ডাক্তার চিলিপ যখন বলেন পুত্রসন্তান হয়েছে তখন পিসিমা রাগ করে তৎক্ষণাৎ আমাদের বাড়ি ছেড়ে চলে যান। সে বাড়িতে আর কখনো আসেননি। এই সব কত কথা মনে পড়ল।

অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ না হওয়ায় উনি আমার নামটা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই আমার নাম জিজ্ঞাসা করতে আমি যখন তা বললাম তখন উনি খুব খুশি হয়ে আমার করমর্দন করলেন।

মিঃ চিলিপ তারপর বললেন উনি এখন বেরি সেন্ট এডমণ্ড অঞ্চলে বাস করছেন। তিনি তাঁর স্ত্রীর পক্ষ থেকে কিছু সম্পত্তি পেয়েছেন সেখানে। তাঁর শ্বশুর তাঁর মেয়েকে উইল করে দিয়ে গেছেন। চিলিপের মেয়ে এখন বেশ লম্বা হয়ে উঠেছে।

এর পর আমি একসময় মার্ডস্টোনদের কথা জিজ্ঞাসা করলাম মিঃ চিলিপের কাছ থেকে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, মিঃ মার্ডস্টোন এখন কি করছেন? তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ সুখের হয়েছে?

ডাঃ চিলিপ বললেন, দেখ বাপু আমি একজন চিকিৎসক হিসাবে সব সময় নিজের কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকি। তবু কিছু কিছু খবর রাখি সব বিষয়ে। আমি যতদূর জানি মার্ডস্টোনরা আগের মতই নিষ্ঠুর প্রকৃতির আছে। তাদের স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। মার্ডস্টোন ব্যবসা করে। আমার স্ত্রী ওদের বাড়ি মাঝে মাঝে যায় বা খবরাখবর রাখে। তার অভিমত হলো মিঃ মার্ডস্টোনের দ্বিতীয়পক্ষের স্ত্রী খুব ভাল মহিলা, দেখতে শুনতে ভাল। মিষ্টি ব্যবহার। বেশ প্রাণচঞ্চল মহিলা, কিন্তু বিয়ের পর থেকে কেমন যেন বিমর্ষ হয়ে গেছে।

মিঃ চিলিপ আরও মিসেস চিলিপের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বলতে লাগলেন, প্রথম প্রথম স্বামীস্ত্রীতে খুব ঝগড়া হত। কিন্তু যখন বোন মিস মার্ডস্টোন সংসারের কাজকর্মে সাহায্য করতে এল ভাইকে, তখন থেকেই ভাইবোন একজোট হয়ে বধূকে কোনঠাসা করল। বধূ নিস্তেজ হয়ে হার মানল। ওরা দুজনে ওদের মনোভাবের ছাঁচে ফেলে বধূকে নতুন করে গড়তে চাইল। বধূ তখন অসহায়ভাবে হাল ছেড়ে দিল। সংসারে সব কর্তৃত্ব হারিয়ে দাসীতে পরিণত হয়ে রইল।

এই এক সপ্তাহ আগেও আমার স্ত্রী গিয়ে ওদের সংসারের অবস্থা দেখে এসেছে। এ সব ব্যাপারে মেয়েদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেক বেশী। ঠিক তোমার মায়ের ক্ষেত্রে যা ঘটেছিল এখানেও তাই ঘটছে।

আমি বললাম, মিসেস চিলিপ যা দেখেছেন তা তাহলে সত্য। মিঃ চিলিপ বললেন, আমরা দেখেছি বিয়ের আগে তোমার মা কত প্রাণচঞ্চল ও আনন্দোচ্ছল মহিলা ছিলেন। কিন্তু বিয়ের পর থেকে গোমরামুখো নিষ্ঠুর প্রকৃতির ঐ ভাই-বোনের কঠোর বিধিনিষেধ ও শাসনের অত্যাচারে ম্রিয়মান হয়ে উঠলেন তিনি। এক বিষাদের ঘন ছায়া নিয়ে গেল তাঁর জীবনের সব আনন্দ। সব সময় উদ্বেগ ও আশঙ্কায় তটস্থ হয়ে থাকতেন। নিজের ছেলের সঙ্গেও কথা বলতে বা তাকে আদর করতে পারতেন না। আমরা সব জানি। তাঁর নিজের বাড়িতে নিজের সংসারে তাঁর কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তবু তিনি এমন শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির মহিলা ছিলেন যে এত কিছু সত্ত্বেও কারো কাছে কোন অভিযোগ করতেন না।

আমি বললাম, আপনি যা বললেন, আমি তা শৈশবে কতদিন হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছিলাম। আমার প্রতি ও আমার মার প্রতি ওদের নিষ্ঠুরতার কথা, দুর্ব্যবহারের কথা কোনদিন ভুলব না আমি। তার কোন ক্ষমা নেই।

মার্ডস্টোনদের পটভূমিকায় আমার মার কথা শুনতে শুনতে আমি অন্তরে বেদনাবোধ করলেও তা শুনতে আমার ভাল লাগছিল।

যাই হোক, ডাঃ চিলিপের সঙ্গে বিশেষ আন্তরিকতার সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলাম তাঁর কাছে। সেদিনকার রাতটাও আমি হোটেলেই কাটালাম। পরদিন ভোরবেলায় আমি ডোভারে আমার পিসীর বাড়ি যাবার জন্য ডোভারগামী একটা গাড়িতে উঠে বসলাম।

পরদিন সকালে আমি যখন ডোভারে আমার পিসিমার পুরনো বাড়ির বসার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হলাম তখন সবেমাত্র ওদের চায়ের আসর বসেছিল। সেখানে ছিলেন আমার পিসিমা। আমার পুরনো বন্ধু মিঃ ডিক আর আমার ধাত্রী মমতাময়ী পেগটি। দেখলাম আমার পিসিমা চোখে এখন চশমা ব্যবহার করছেন। পেগটি এখন পিসিমার কাছেই থাকে এবং সব কিছু দেখাশোনা করে।

আমাকে দেখে খুবই খুশি হলেন পিসিমা। আনন্দে জল এল পেগটির চোখে। সমস্ত পরিবেশটা ছিল এক অকৃত্রিম আত্মীয়তার মাধুর্যে নিবিড়। আমার মনে হলো আমি যেন সত্যিকারের আমার বাড়িতে ফিরে এসেছি যেখানে আর আমার মা না থাকলেও পিসিমা আর পেগটির স্নেহের আঁচল আমার জন্য কত যত্নে বিছিয়ে রাখা হয়েছে। আমি পিসিমা ও পেগটিকে ডাঃ চিলিপের মুখ থেকে মার্ডস্টোনদের বর্তমান জীবনের কথা বললাম, পেগটি পিসিমাকে পুরনো দিনের কথা শোনাতে লাগল। আমার কথাও বলল।

পিসিমা বললেন, ওরা নরহত্যাকারীরও অধম।

৪৩

সেদিন আমি পিসিমার সঙ্গে এক জায়গায় বসে নানা বিষয়ে কথা বলছিলাম। সেখানে অন্য কেউ ছিল না। একে একে সকলের কথাই বললেন। মিঃ ডিক এখন লেখা নকল করে কিছু টাকা রোজগার করছেন। অতীতে যে জেনেট তাঁর বাগানের গাধা তাড়াত সম্প্রতি তার বিয়ে হয়েছে। সেই লোকটি কোন এক হোটেলে কাজ করে। মিঃ পেগটিরা অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছবার পর কোন চিঠি দেয়নি। তবে মিঃ মিকবার তার কথামত তার ঋণের টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। মিঃ উইকফিল্ড এখন ভালই আছেন। অ্যাগনিস বাড়িতে স্কুল করেছে। সে ছেলেমেয়েদের পড়ায়।

সবশেষে পিসিমা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি ক্যান্টারবেরি কবে যাচ্ছ?

আমি বললাম, মনে হয় সকালেই যাব।

পিসিমা বললেন, অ্যাগনিসের মত রূপগুণসম্পন্না মেয়ে আর হয় না। আমার মতে ওর কোন তুলনা হয় না। ও নিজের কাজ নিয়ে কেমন সুখেই আছে।

আমার মুখ থেকে হঠাৎ একটা কথা বেরিয়ে এল, আচ্ছা অ্যাগনিসের কি কোন প্রেমিক আছে?

পিসিমা বললেন, ও যদি চাইত তবে বহু প্রেমিক এসে ভীড় করত ওর কাছে। ও মনে করলে কুড়িবার বিয়ে করতে পারত। কিন্তু সেদিকে ওর কোন খেয়াল নেই। সব সময় নিজের কাজ নিয়ে ঘরে থাকে।

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম; তার কি এমন কোন প্রেমিক আছে যে তার যোগ্য?

পিসিমা বলল, তেমন তো দেখিনি, তা তো মনে হয় না। তবে আমার মনে হয় কোথাও কারো প্রতি ওর একটা অব্যক্ত গোপন আসক্তি আছে, যেকথা আজ পর্যন্ত ও ব্যক্ত করেনি কারোর কাছে। সেটা খুবই গোপন কথা এবং ও আমাদের কাছে কোনদিন প্রকাশ করেনি।

আমি বললাম, ওর সেই আসক্তির লোকটি খুবই ভাগ্যবান।

পিসিমা তখন আমার মুখপানে বেশ অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন। আমি বুঝতে পারলাম না উনি কি বলতে চাইছেন।

নিজেকে আমার অপরাধীর মত মনে হলো। অ্যাগনিসের মত রূপে গুণে ধন্যা, অনন্যা নারীরত্ন থাকতে তার কাছ থেকে নিজেকে কত দূরে দূরে রেখেছি। তাকে ছেড়ে কত দূরে চলে গিয়েছিলাম।

পরদিন সকালেই আমি একটা গাড়ি ভাড়া করে সোজা ক্যান্টারবেরি চলে গেলাম। মিঃ উইকফিল্ডের বাড়ির সামনে নামলাম। একজন নতুন ঝি এসে দরজা খুলে দিলে আমি তাকে বললাম, মিস উইকফিল্ডকেবলতো,তার এক বন্ধু বিদেশ থেকে ফিরে দেখা করতে এসেছে তার সঙ্গে।

ঝি এসে আমাকে সঙ্গে করে উপরতলায় বসার ঘরে নিয়ে গেল। আমি সেখানে বসলাম। আমি সেই ঘরের তাকে সাজানো সেই বইগুলো দেখতে লাগলাম যেগুলো আমরা দুজনে ছাত্রজীবনে পড়তাম। তখন আমি কত সুখে ছিলাম এই বাড়িতে।

হঠাৎ ঘরের দরজা ঠেলে অ্যাগনিস আমার সামনে এসে দাঁড়াতেই আমি উঠে গিয়ে তাকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, হে আমার প্রিয় অ্যাগনিস, আমি নির্ধারিত সময়ের আগে বিদেশ থেকে চলে এসেছি।

অ্যাগনিস আমার বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বলল, না না, ওকথা বলো না। আমি তোমাকে দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি।

আমরা সোফাতে দুজনে পাশাপাশি বসলাম। আমি অনুভব করলাম আমার প্রতি তার স্নিগ্ধ প্রভাব আজও অক্ষুন্ন রয়ে গেছে। সে আগের মতই সুন্দর, সহানুভূতিশীল ও বিশ্বস্ত রয়ে গেছে আমার প্রতি। আকাশে পূর্ণচন্দ্রদর্শনে সমুদ্রের স্ফীত জলরাশির মত আমার দেবদূত অ্যাগনিসকে কাছে পেয়ে তার প্রতি আমার ভালবাসা আর আনন্দ উত্তাল হয়ে উঠল হৃদয়ে। কিন্তু সে ভালবাসা, সে আনন্দ এমনই অব্যক্ত যে আমি তা মুখে প্রকাশ করতে পারলাম না। আমি বোবার মত বসে রইলাম নীরবে।

অ্যাগনিস স্বভাবসিদ্ধ কাঙ্খিক প্রশান্তির দ্বারা আমার অন্তরের সমস্ত আলোড়ন স্তব্ধ করে দিল। তারপর সহজভাবে এমিলির কথা, ডোরার সমাধির কথা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলতে লাগল।

আমি তখন তাকে বললাম, অ্যাগনিস, আর অপরের কথা নয়, তুমি এবার নিজের জীবনের কথা বল। তুমি এতদিনের মধ্যে নিজের কথা একবারও বলনি।

অ্যাগনিস বলল, নিজের কথা কি আর বলব। বাবা এখন ভালই আছে। আমরা আমাদের বাড়ির অধিকার ফিরে পেয়েছি। আমরা সেখানে নিরুদ্বেগে বাস করছি। আমি কতকগুলি ছেলেমেয়েকে পড়াই। অর্থাৎ আমার স্কুল।

আমি বললাম, এই কি সব? এত তোমার বহির্জীবনের কথা, তোমার অন্তরঙ্গ জীবনের কথা নয়।

আমি আমার পিসিমার কাছ থেকে তার মনের যে গোপন আসক্তির কথাটা শুনেছিলাম সেকথাটা বার বার জানতে চাইলাম তার মুখ থেকে।

কিন্তু অ্যাগনিস তা বলল না। তার কোন আভাসও দিল না।

অ্যাগনিস আমায় বলল, আজ আমাদের বাড়িতেই থেকে যাও। বাবা এখন বাড়িতে নেই। বাগানে কাজ করতে গেছেন। আমাদের একটা বাগান আছে শহরের বাইরে। সেখানেই তিনি নানা রকমের গাছপালা নিয়ে কাজ করেন। মনের আনন্দে থাকেন। বাবার আসতে প্রায় সন্ধ্যে হয়ে যাবে। তুমি রাত্রিতে আগে যে ঘরে থাকতে তোমার সেই ঘরেই শোবে।

আমি বললাম, সারাদিন আমি আছি, সন্ধের পর আমি ডোভারে পিসিমার কাছেই ফিরে যাব।

মিঃ উইকফিল্ড বিকেলের দিকে ফিরে এলে আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। আগের চেয়ে তাঁকে অনেক ভাল দেখলাম।

মিঃ উইকফিল্ড আমার সঙ্গে সোফায় বসে তাঁর অতীতের কথা স্মরণ করলেন। তিনি বললেন, অ্যাগনিসের মা তার বাবার অমতে আমাকে বিয়ে করেছিল। তার জন্য তার বাবা তাকে ত্যাগ করে। বিয়ের পর সে কয়েকবার তার বাবার কাছে ক্ষমা চায়। কিন্তু তার বাবা কোনদিন তাকে ক্ষমা করেননি। শেষবার সে তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে গেলে তার বাবা যখন তাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন তখন সে কত ব্যথা পায় মনে। সে আর কোনদিন দেখা করতে যায়নি তার বাবার সঙ্গে। দুঃখে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল সে।

মিঃ উইকফিল্ডের কথা শুনতে আমার বড় ভাল লাগছিল। অ্যাগনিসও তার বাবার সঙ্গে বসে তার মার কথা শুনছিল। মনে হচ্ছিল তারও বড় ভাল লাগছে।

মিঃ উইকফিল্ড আবার বলতে লাগলেন, আমার স্ত্রী বড় ভাল মেয়ে ছিল। দেখতেও যেমন ছিল খুবই সুন্দরী, (তার ফটোটা দেখলেই বুঝতে পারবে) তেমনি গুণেরও সীমা ছিল না। আমাকে সে বড় ভালবাসত আর সেই ভালবাসার খাতিরে সে তার বাবাকে ত্যাগ করেছিল। তার বাবা আমার জন্যই তার প্রতি একেবারে বিরূপ হয়ে গেলেও আমার প্রতি তার ভালবাসা একটু কমেনি। সে আমার কষ্টের লাঘব করবার জন্য নিজে নানা কাজ করতে থাকে ঘরে বসেই। তাতে তার শরীর ভেঙ্গে যায়। তার বাবার প্রতি রাগে ও দুঃখে মনটা তার আগেই ভেঙ্গে যায়। অ্যাগনিস হয়েছে সব দিক দিয়ে মার মত। দেখতে যেমন তার মত, গুণেও তেমনি তার মত। অবশেষে আমার স্ত্রী অসুস্থ অবস্থাতেই অ্যাগনিসকে প্রসব করে। তারপর অ্যাগনিসের বয়স যখন মাত্র ছ সপ্তাহ তখন সে আমাকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলে যায়। আমার প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা,

আমার জন্য তার ত্যাগ স্বীকারের কথা ভেবে আমার স্ত্রীর প্রতি আমার সমস্ত অন্তরাত্মা জুড়ে গড়ে উঠেছিল এক শ্রদ্ধামিশ্রিত ভালবাসা। সেই ভালবাসার খাতিরে আমিও জীবনে এক চরম ত্যাগ স্বীকার করলাম। আমি আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করলাম না। অ্যাগনিসকে পরম যত্নে লালন পালন করতে লাগলাম। তার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও ভবিষ্যতের কথা ভাবতে ভাবতে আমি অতিমাত্রায় ব্যাকুল হয়ে উঠলাম।

আমি আমার অতীত জীবনের এতসব কথা বললাম এই জন্য যে, এতে আমার জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে তোমাদের একটা স্বচ্ছ ধারণা হবে।

অ্যাগনিস তার বাবার কাছে বসে তাঁর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিল। মিঃ উইকফিল্ডের কাহিনী শেষ হলে আমি তাঁকে বললাম, আমিও একথা ভেবেছি, অ্যাগনিস হয়েছে সব দিক থেকে তার মার মত।

আমরা একসঙ্গে ডিনার খাওয়ার পর সেদিন সন্ধ্যার পর তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ার গাড়িতে করে ডোভারে রওনা হয়ে পড়লাম।

পথে আমি আক্ষেপের সঙ্গে ভাবতে লাগলাম, অ্যাগনিসকে আমার আসল কথাটা বলা হলো না। আমিও তার মনের আসল কথাটা জানতে পারলাম না। আমি অ্যাগনিসের মনের কথা না জেনে তাকে আরও উপরে তুলেছিলাম। আমি তাকে কথায় কথায় বলেছিলাম, সে আমার অনেক উপর থেকে দেবদূতের মত এক স্নিগ্ধ ও দিব্য আলো বিকীরণ করে আমার মনের সব অন্ধকার অস্বস্তি দূর করবে, আমাকে পথ দেখাবে। আমাকে সঠিক পথে চালনা করবে। কিন্তু আসল কথাটা আমি তাকে স্পষ্ট করে বলতে পারিনি। বলতে পারিনি আমাকে বিয়ে করার পথে তার সত্যিকারের কোন বাধা আছে কিনা।

সেই না-বলা কথার এক ব্যর্থ হাহাকার বুকে নিয়ে ফিরে আসতে হলো আমায়।

বাড়ি ফিরে আমি পিসিমাকে সেটাই জানালাম। তাঁকে জানিয়ে দিলাম, তিনি বলেছিলেন, অ্যাগনিসের মনের মধ্যে হয়ত কারো প্রতি একটা গোপন আসক্তি আছে যার জন্য সে জীবনে নিঃসঙ্গতাটাকেই বেছে নিয়েছে, যার জন্য কাউকেই সে বিয়ে করতে পারছে না। কিন্তু সে আসক্তিটা কার প্রতি তা আমি জানতে পারিনি।

সেই না-বলা কথার হাহাকার আলোড়িত ও মথিত করছিল আমার অন্তরটাকে—ঠিক যেমন ঝড়ের প্রহারে আলোড়িত ও মথিত হয় সমুদ্রবক্ষ। সেই আলোড়ন বুকে জোর করে চেপে রেখে শুয়ে পড়লাম আমি।

৪৪

পরদিন আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ট্র্যাড্‌লস্ এর বাড়িতে চলে গেলাম। আমার সব চিঠিপত্র লণ্ডনে ট্র্যাড্‌লস্-এর বাড়ির ঠিকানায় আসত। তার বাড়ির দরজায় আমার নাম লেখা একটা চিঠির বাক্স রেখে দিয়েছিল ট্র্যাড্‌লস্। পিওন আমার নামের সব চিঠি সেই বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়ে যেত। আমি প্রায়ই গিয়ে সেই সব চিঠি পড়ে দেখতাম এবং প্রয়োজন বুঝলে উত্তর দিতাম।

সেদিন ট্র্যাড্‌লস্ আমাকে বলল, তোমার এখন নামযশ অনেক বেড়েগেছে লেখক হিসাবে। তোমার গুণমুগ্ধ পাঠকদের কাছ থেকে প্রতিদিন কত যে চিঠি আসে, তার ঠিক নেই।

সেদিন সেই চিঠিগুলো দেখতে দেখতে হঠাৎ মিঃ ক্রীকল্-এর একটা চিঠি পেয়ে গেলাম। আমি আমার ছেলেবেলায় যে স্কুলে প্রথম ভর্তি হয়েছিলাম, মিঃ ক্রিকল্ ছিলেন তার হেডমাস্টার। তিনি শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে এখন বিচার বিভাগীয় এক ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে সরকারী চাকরি করছেন। তিনি আমার লেখা বই পড়ে খুশি হয়ে আমাকে একখানি চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, আমি যদি চাই তিনি আমাকে জেলখানায় নিয়ে গিয়ে একটি নির্জন সেলে রাখা কয়েদীদের জবানবন্দী শোনাবেন।

আমি এ প্রস্তাবে খুবই উৎসাহিত হয়ে ট্র্যাড্‌লস্‌কে চিঠিটা পড়তে দিলাম। ট্র্যাড্‌লস্ আমাকে যেতে বলল।

আমি একটি দিন ঠিক করে মিঃ ক্রীকল্‌কে জানিয়ে দিলাম। তারপর নির্দিষ্ট দিনে আমি ট্র্যাড্‌লস্‌কে নিয়ে জেলখানায় গিয়ে হাজির হলাম। তিনি আমাদের দেখে খুশি হয়ে জেলখানার ভিতরে নিয়ে গিয়ে একটি নির্জন সেলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর সঙ্গে একজন প্রশ্নকর্তা ছিল। তিনি এক একটি সেলে গিয়ে এক একজন কয়েদীদের নম্বর ধরে ডাকতে লাগলেন। জেলের ভিতর সব সময় কয়েদীদের নাম নয়, নম্বর ধরে ডাকা হয়। কৃত কুকর্মের জন্য যাতে তাদের মধ্যে অনুতাপ জাগে নির্জন চিন্তার মধ্য দিয়ে, তার জন্যই অশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত কয়েদীদের নির্জন সেলে রাখা হয়।

মিঃ ক্রীকল্-এর সঙ্গে চশমাপরা যে প্রশ্নকর্তা ছিলেন তিনি প্রতিটি নির্জন সেলের কয়েদীদের নম্বর ধরে ডেকে তাদের বর্তমান মনের অবস্থার কথা জানতে চাইলেন।

তাদের কথা থেকে বোঝা গেল তাদের অনেকেরই এখনো তাদের অপরাধের জন্য অনুতপ্ত হয়নি। তবে তাদের মধ্যে ২৭ ও ২৮ নম্বরের দুজন কয়েদী স্পষ্টভাবে তাদের অনুশোচনা প্রকাশ করল। তারা দুজনেই আমার পরিচিত। তাদের একজন হলো স্টীয়ারফোর্থের পুরাতন ভৃত্য মিটিমার আর অন্যজন হলো ইউরিয়া হীপ।

এরপর ২৭ নম্বর কয়েদী। মিটিমার আমাকে দেখিয়ে বলল, ইনি আমার পরিচিত। ইনি আমার জীবনের অনেক কথা জানেন।

প্রথমে মিটিমার বলল, আমার অপরাধকর্মের জন্য দায়ী আমার যুবক মনিব বন্ধু। আমার যা কিছু অপরাধ আমার মনিবকে সাহায্য করার জন্য করতে হয়েছে আমাকে। আমি তাঁকে কত নিষেধ করেছি, তাঁকে শোধরাবার জন্য কত চেষ্টা করেছি কিন্তু তিনি তখন শোনেননি আমার কথা। তাঁকে বাধা দেওয়ার ক্ষমতা আমার ছিল না। তারই জন্য এই কারাদণ্ড ভোগ করতে হচ্ছে আমাকে।

তারপরই ২৮ নম্বর কয়েদী ইউরিয়া হীপকে ডাকা হলো। আমি তাকে দেখে খুবই অস্বস্তি বোধ করছিলাম। ইউরিয়া হীপের কণ্ঠে একই সঙ্গে অনুতাপ আর ক্ষোভের প্রকাশ দেখতে পেলাম।

ইউরিয়া হীপ বলল, আমি নির্বোধের মত কাজ করেছি। তখন তা বুঝতে পারিনি। কিন্তু

সেই অপরাধের কথা আমি এখন ভাবতে থাকি। আমি এ বিষয়ে পূর্ণমাত্রায় সচেতন। আমি এখন আমার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ ভোগ করছি।

এখন আমার ইচ্ছা আমার মা এসে এই জেলে বাস করুক।

এরপর আমার দিকে তাকিয়ে ইউরিয়া বলল, আমার পূর্ব জীবনে এই ভদ্রলোক আমার পরিচিত। কি মিঃ কপারফিল্ড, আপনার মনে আছে আপনি একবার আমাকে একটা চড় মেরেছিলেন?

আমি নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম। হীপ বলল, অবশ্য আমি আপনার অপরাধ ক্ষমা করেছি। আমি চাই আপনিও এখানে এই কারাদণ্ড ভোগ করুন। আমার পরিচিত সবাই যেমন মিঃ উইকফিল্ড, মিস উইকফিল্ড, প্রভৃতি সবাই এসে এই ঘরে বাস করুক। ওরা সবাই দায়ী।

এই বলে ইউরিয়া হীপ মুখ ফিরিয়ে তার সেলের মধ্যে ঢুকে গেল।

৪৫

আমি একা একা থাকলেও অ্যাগনিসের কথা আমার প্রায়ই মনে পড়ত। মনে হত যে অ্যাগনিস নীরবে নিঃস্বার্থভাবে এত ভালবাসে সে অ্যাগনিসের প্রতি আমি ঠিকমত আমার কর্তব্য পালন করিনি। আমি স্বার্থপরের মত ব্যবহার করেছি তার সঙ্গে। তার প্রেমের যোগ্য প্রতিদান দিইনি।

আমি ডোভারে পিসিমার বাড়িতেই থাকতাম। মাঝে মাঝে লণ্ডনে যেতাম।

একদিন সকালে একটি ঘোড়ায় চড়ে আমি ক্যান্টারবেরি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। পিসিমাকে বললাম, আজকের দিনটা বেশ উজ্জ্বল। ঘোড়ায় চড়ার পক্ষে বেশ ভাল। আমি ক্যান্টারবেরি যাচ্ছি এই ঘোড়াটায় চড়ে।

পিসিমা বললেন, ঘোড়াটা যেন তার প্রভুর মঙ্গল করে।

এরপর তিনি বললেন, আমার মনে হয় অ্যাগনিস এবার বিয়ে করতে চলেছে।

আমি হাসিমুখে বললাম, ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন।

পিসিমা বললেন, ঈশ্বর তার ও তার স্বামীর মঙ্গল করুন।

যাইহোক, আমি পিসিমার কাছে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম।

মিঃ উইকফিল্ডের বাড়িতে গিয়ে দেখলাম অ্যাগনিস একা আছে তার ঘরে। তার ছাত্রীরা পড়া শেষ করে চলে গেছে। আমি জানালার ধারে তার পাশে বসলাম। আমি এই কয়েকদিনের মধ্যে কি কি করেছি, কতটা আমার কাজ এগিয়েছে তা সব বললাম।

অ্যাগনিসের মনটা তখন বেশ প্রফুল্ল ছিল। সে হাসিমুখে ভবিষ্যদ্বাণী করল, আমি কিছুদিনের মধ্যে বিখ্যাত হয়ে উঠবো এবং তখন আমার কথা অনেকে আলোচনা করবে। সে বলল, তাই তো, তুমি খুব বড় হয়ে ওঠার আগেই আমি সময় পেলে তোমার সঙ্গে বসে কথা বলি। পরে হয়ত সুযোগ পাব না।

আমি তার সুন্দর মুখপানে তাকিয়ে রইলাম। সে বলল, আজ তোমাকে চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে।

আমি এবার সোজাসুজি বললাম, তোমার মনের মধ্যে একটা গোপন কথা লুকিয়ে আছে। সেটা তুমি আমার কাছে বল অ্যাগনিস। আমি বিদেশ থেকে ফিরে তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে এ কথা জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও তা পারিনি।

অ্যাগনিস বলল, হ্যাঁ, আমি সেটা লক্ষ্য করেছিলাম।

এই বলে সে তার মুখটা নামিয়ে নিল। সে যেন শরাহত হরিনীর মত কাঁপতে লাগল। আমি তাকে আবার বললাম, তোমার সারাজীবনের প্রেমরূপ রত্ন কার উপর ঢেলে দেবে, কে যে ভাগ্যবান একথা আমি আজও জানতে পারলাম না অ্যাগনিস। এটা আমার কতবড় দুঃখ তা তুমি বুঝবে না। তুমি আমাকে তোমার বন্ধু ও ভাই হিসাবে বিশ্বাস করতে পার।

সহসা সে উঠে দাঁড়িয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

তার কান্না দেখে আমি অন্তরে বড় ব্যথা পেলাম। আমি ব্যস্ত হয়ে উঠে তার কাছে গেলাম। বললাম, হে আমার বোন, হে আমার প্রিয়তমা, বল আমি এমন কি করেছি? আমি তো কোন খারাপ কথা বলিনি।

অ্যাগনিস বলল, আজ আমাকে যেতে দাও ট্রটউড। পরে তোমাকে তা জানাব। আমি তোমাকে চিঠি লিখে জানাব।

আমি বললাম, যে আমার জীবনে সবার চেয়ে, সব কিছুর চেয়ে প্রিয় তার এই দুঃখ আমি দেখতে পারছি না। এ দুঃখের কারণ আমায় জানতেই হবে। আমি আর সহ্য করতে পারছি না অ্যাগনিস। আজ আমি সব কিছু দিয়ে তোমার মনের গোপন সব কথা জানতে চাই। যদি তোমার জন্য না হয়, তবে আমি কার জন্য বেঁচে আছি অ্যাগনিস?

অ্যাগনিস জলভরা চোখে আমার কাঁধে তার হাতদুটো রেখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, আজ নিজেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদধন্যা বলে মনে হচ্ছে। আনন্দে আমার অন্তর উপচে উঠছে। আজ আমি সে কথা বলে হালকা হব, মুক্ত হব।

আমি বললাম, হ্যাঁ প্রিয়তমা বল সে কথা।

অ্যাগনিস বলল, তোমার বালিকাবধূ আমাকে একটা কাজের ভার দিয়ে গেছে। এক বিরাট দায়িত্বভার। আমাকে তার শূন্য আসনে বসতে হবে কারণ সে আমাকে সবচেয়ে বেশী বিশ্বাস করত।

এই বলে অ্যাগনিস আমার বুকে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমিও তার সঙ্গে কাঁদতে লাগলাম। কিন্তু সে কান্নার মধ্যেই যেন এক স্বর্গসুখ অনুভব করলাম আমি। আমাদের সে আনন্দ-বেদনার দ্বৈত লীলা দেখে সেদিনের শীতের সন্ধ্যার কুয়াশা যেন শিউরে উঠল।

পরদিন আমি ও অ্যাগনিস দুজনে মিলে ডোভারে পিসিমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। সেখানে আমার ধাত্রী পেগটিও ছিল। ওঁরা আমাদের একসঙ্গে আসতে দেখে খুশি হলেন।

পিসিমা অ্যাগনিসকে আমার ঘরে বসালেন।

পিসিমা আমাকে মধুরভাবে বকলেন, ট্রট তুমি অ্যাগনিসের প্রতি অবিচার করেছ। তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ।

আমি মৃদু হেসে বললাম, তুমি হয়ত শুনে খুশি হবে পিসিমা যে, এখন আর অ্যাগনিসের

কোন দুঃখ নেই। কোন কষ্ট নেই। বেশ কিছু দিন দেরী হলেও আমাদের সিদ্ধান্ত সুখময় হয়েছে।

অবশেষে সকলের সব জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে অ্যাগনিসের সঙ্গে আমার বিয়েটা হয়ে গেল। পিসিমা আমাদের আশীর্বাদ করে আমাকে বললেন, এটা আরো আগে হওয়া উচিত ছিল। অকারণে বড দেরী করে ফেললে। ডোরা মৃত্যুকালে তোমার ভার অ্যাগনিসের উপরেই দিয়ে গেছে। তার শেষ ইচ্ছা পূরণ হলো এত দিনে!

৪৬

আমার কাহিনী এবার শেষ। আমি এখন অ্যাগনিসকে নিয়ে আমার লণ্ডনের বাড়িতে থাকি। আমার ছেলেমেয়ের সংখ্যা মোট তিনটি। তারা বাড়ির বাগানে খেলা করে বেড়ায়। আমি একের পর এক বই লিখে চলেছি। অ্যাগনিস ঘর-সংসারের কাজ করে, ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা দেখে। আমার পিসিমা ডোভারের বাড়িতেই থাকেন। তাঁর বয়স প্রায় আশী হলেও এখনো বেশ শক্ত আছেন। পেগটি তাঁর কাছে আছে। পিসিমা আমার দুটি মেয়ের নাম রেখেছেন বেটসি ট্রটউড আর ডোরা। পেগটি আমার শৈশবের সেই কুমীরের বইটা যত্ন করে রেখে দিয়েছে এখনো। মিঃ ডিক নিশ্চিন্ত মনে ঘুড়ি ওড়ান আকাশের দিকে তাকিয়ে। মিঃ পেগটি একদিন অস্ট্রেলিয়া থেকে এসে আমার সঙ্গে দেখা করল। ওরা ওখানে বেশ ভালই আছে। চাষবাস এবং পশুপালন করে ওদের অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। এমিলি ভালই আছে। সে প্রায়ই আমার নাম করে। মিসেস গামিজের পরিবর্তন হয়েছে। সে এখন স্বাভাবিক মহিলার মতই ঘর-সংসারের কাজ করে।

আমার বন্ধু ট্র্যাড্‌লস্‌ও ওকালতিতে বেশ নাম করেছে। ভবিষ্যতে সে জজ হতে পারে সে সোফিকে নিয়ে তার লণ্ডনের বাড়িতে বেশ সুখেই আছে।

আমি একদিন মিঃ মিকবারের একটি চিঠি পেলাম। তিনি অস্ট্রেলিয়াতে ম্যাজিস্ট্রেটের কাজ পেয়েছেন। তিনিও সপরিবারে বেশ সুখেই আছেন। তিনি লিখেছেন, সুদূর অস্ট্রেলিয়াতেও লেখক হিসাবে আমার বেশ পরিচিতি আছে। তিনি সেখানে আমার নাম যশের কথা শুনেছেন। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগময় ভাষায় লিখেছেন, আমি যেন নিষ্ঠার সঙ্গে আমার লেখার কাজ করে যাই। আমি যেন ক্রমাগত অক্লান্তভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে থাকি।